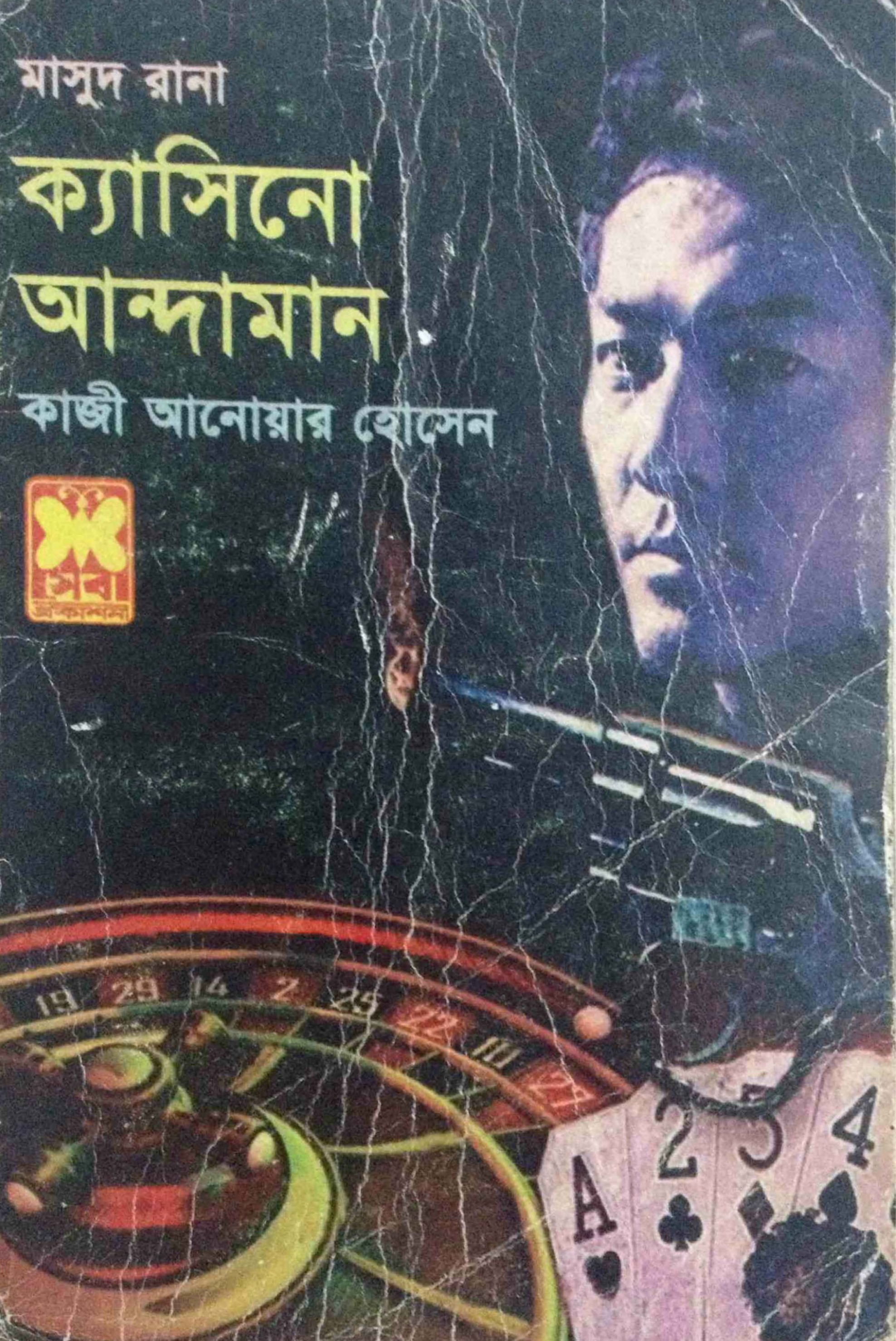
মাসুদ রানা

ক্যাসিনো আন্দামান

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী



মাসুদ রানা

ক্যাসিনো আন্দামান

কাজী আনোয়ার হোসেন

আন্দামান সাগরে ফুঁসে ওঠা প্রলয়ঙ্করী সুনামি
বঙ্গোপসাগর হয়ে ধেয়ে আসছে বাংলাদেশের দোরগোড়ায়।
ওটা যদি সাবমেরিন কমান্ডার সন্দীপন ব্যানার্জির
সর্বনাশ ডেকে আনে, তা হলে নির্ঘাত তাইওয়ানিজ
জলদস্যু তুং শান আর বাংলাদেশী জঙ্গি লিডার
সালাউদ্দিন শাহ কুতুবের কপাল খুলে যাবে।
পরমাসুন্দরী এক রমণীকে অনুসরণ করে
জায়গামতই পৌঁছাল মাসুদ রানা, তা হলে সমুদ্রমন্থন
করেও খালি হাতে ফিরতে হবে কেন ওকে?
মাত্র দশ হাজার কোটি টাকা দিয়ে চোদ্দো কোটি বাঙালীর
নিয়তি বেঁধে দিতে চাইছে জঙ্গিরা,
কাজেই এখন তো বেপরোয়া না হয়ে উপায় নেই রানার!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

এক

এ যেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই চিরসত্য উচ্চারণ —তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা। একজনের শুরু হবে, আরেকজনের হবে সারা। এই নিয়ম। আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে চলতি ভয়েজ শেষ হওয়ার পর প্রমোশন পেয়ে ক্যাপটেন হতে যাচ্ছে কমান্ডার সন্দীপন ব্যানার্জি। সেই সঙ্গে অবসরে চলে যাবেন প্রবীণ ক্যাপটেন শিবনাথ নাইডু।

গুরু-শিষ্য দুজনের মুখেই প্রসন্ন হাসি। শিবনাথ নাইডুর বিষণ্ন চোখের দৃষ্টিতে স্নেহ ঝরে পড়ছে; তরুণ সন্দীপনের উজ্জ্বল, সুশ্রী চেহারায় ফুটে উঠেছে সমীহ।

চার হপ্তা পাঁচদিন হলো পানির নীচে রয়েছে ওরা, এই কদিন ফুসফুসে তাজা বাতাস ভরা হয়নি, দেখার সুযোগ মেলেনি আকাশ কিংবা ডাঙা। পোর্টহোলে চোখ রাখলে সার্চলাইটের কল্যাণে নীলচে-সবুজাভ গভীরতায় ঝাঁক ঝাঁক সামুদ্রিক মাছ দেখা যায়, নীচে তাকালে কখনও হয়তো বা ডুবো পাহাড়ের চূড়া; দৃষ্টিবিভ্রমের কারণে মনে হয় পিছিয়ে যাচ্ছে ওদের কাছ থেকে।

আপাতদৃষ্টিতে একঘেয়ে আর বৈচিত্র্যহীন মনে হলেও, কমান্ডার সন্দীপনের জন্য সময়টা ভারি আনন্দ আর উত্তেজনার মধ্যে কাটছে। বাংলার ছেলে হয়ে ত্রিশ না পেরুতেই এতটা উপরে উঠে আসা, প্রায় অসাধ্যসাধনই বলা যায়। সন্দেহ নেই কঠোর পরিশ্রম আর অবিচল নিষ্ঠার সুফল পাচ্ছে ও এতদিনে।

ক্যাপটেন হিসাবে প্রমোশন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের স্কপার-এর দায়িত্বটাও তুলে দেওয়া হবে ওর হাতে, কথাটা মনে হলেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে সন্দীপনের সমগ্র অস্তিত্ব।

শুধু কর্মজীবনে নয়, সাংসারিক জীবনেও অত্যন্ত সুখী একজন মানুষ সন্দীপন। প্রেম করে বিয়ে; এবং ওদের দুজনের ধারণা ঈশ্বর ওদেরকে একান্তই পরস্পরের জন্য তৈরি করেছেন; ওদের মিলন হয়েছে তাঁর বিশেষ ইচ্ছেতে। তিনি ওদেরকে গত মাসে ফুটফুটে একটা পুত্রসন্তানও উপহার দিয়েছেন, ঠিক যেদিন রুটিন অপারেশনাল সিক্রেট ভয়েজে রওনা হলো অর্জুন।

আন্দামান সাগর। মধ্যরাত।

পানির সারফেস থেকে পাঁচশ' ফুট নীচ দিয়ে ছুটে চলেছে অর্জুন। অর্জুন ভারতীয় নৌ-বাহিনীর গর্ব, ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন। পাঁচ হপ্তা হতে চলল ভারতের দক্ষিণ-পুব উপকূল, অন্ধ্র প্রদেশের ভিশাখাপতনম ঘাঁটি থেকে রওনা হয়েছে ওরা।

ভিশাখাপতনম থেকে বেরিয়ে প্রথমে পশ্চিমে গেছে অর্জুন, আরব সাগরের বিরাট এলাকায় টহল শেষ করে আবার ফিরে এসেছে পুবে। বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে আন্দামান-নিকোবরকে ঘিরে একটা চক্কর দিয়েছে, আন্দামান সাগর হয়ে এখন আবার ফিরছে বঙ্গোপসাগরে। আরও দুদিন টহল দিয়ে, অবশেষে পঁয়ত্রিশ দিনের মাথায় ফিরে যাবে নিজ ঘাঁটি ভিশাখাপতনমে।

সাগরের গভীরতায় প্রায় অটুট নীরবতা বজায় রেখে এবং সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে অর্জুন। দেখতে না পাওয়ায় এ-ধরনের সাব সম্ভাব্য শত্রুর জন্য সারাক্ষণ একটা হুমকি বটে।

দুশ' আশি ফুট লম্বা অর্জুন। একশ' বিশজন ক্রু তিন শিফটে পালা করে ডিউটি দেয়। প্রতিবার একটানা সত্তরদিন পানির উপর না উঠে সবগুলো মহাসাগর চষে বেড়াতে পারে ওরা। রিফুয়েলিং ছাড়াই পেরুতে পারে ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার

কিলোমিটার ডুবো-পথ।

অর্জুন পারমাণবিক শক্তিতে চলে। খোলের ভিতর অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছে ছোট একটা নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর। নৌ-বাহিনীর সবার ধারণা, ওই রিয়্যাক্টরের ডিজাইন তৈরি করেছেন ভারতের পরমাণু বিশেষজ্ঞ প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট স্বয়ং।

সেটার ডিজাইন খুবই জটিল। আর কাজ হলো, কোনও প্রেশার ভেসেল-এর ভিতর নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে বিপুল পরিমাণে হিট এনার্জি উৎপাদন করা।

এই হিট এনার্জি একটা পাইপিং সিস্টেমে চলে যাচ্ছে। ওখানে গিয়ে আরেক প্রস্থ পাইপিং সিস্টেমের পানিকে গরম করতে সময় নিচ্ছে মাত্র এক সেকেন্ড। উত্তপ্ত পানি পরিণত হচ্ছে বাষ্পে, সেই বাষ্প একটা টারবাইনের মধ্য দিয়ে গিয়ে শক্তি যোগাচ্ছে অর্জুনের প্রপালশন ড্রাইভকে।

সাবমেরিনের প্রেশার খোল ঘিরে, ক্রুরা যেখাসে বাস করে, এক সারি ব্যালাস্ট ট্যাংক বসানো আছে। ডাইভ দেওয়ার সময় বয়্যান্সি কমানোর দরকার পড়ে, তখন সাগরের পানি ভরা হয় ট্যাংকগুলোয়। আর সারফেসে ওঠার সময় বয়্যান্সি বাড়াবার জন্য ট্যাংকের ভিতর ঢোকানো হয় কমপ্রেসড্ এয়ার। পানির কত নীচ দিয়ে সাবমেরিন চলবে সেটা নির্ভর করবে কটা ট্যাংকে কী পরিমাণে পানি ভরা হয়েছে তার উপর।

অর্জুনে একটাই কন্ট্রোল রুম, সেটাকে ব্রিজও বলা হয়। ব্রিজটা পিছনদিকে, প্রপেলারের কাছাকাছি। হালটা ব্রিজে: ডান ও বাম দিকের মুভমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে।

পানির তলায় নিজের অস্তিত্ব গোপন রাখবার একটাই উপায় সাবমেরিনের, মৌনব্রত অবলম্বন করা। অর্জুনের গায়ে আছে রাবারের তৈরি বিশেষ ধরনের আচ্ছাদন, শত্রুর সোনার সিগনাল হজম করে নেয়, প্রতিধ্বনিত হতে দেয় না।

উপস্থিতি গোপন করবার আরও একটা উপায় হলো

আশপাশের চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা পানিতে সরে যাওয়া, তাতে একটা অ্যাকুসটিক আবরণ তৈরি হয়, যে আবরণকে সোনার ওয়েভ ভেদ করতে পারে না।

আধুনিক নিউক্লিয়ার সাবমেরিন পনেরো শো ফুট নীচে পর্যন্ত নামতে পারে বলে শোনা যায়। তবে সঠিক তথ্যটা আসলে ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশন, কখনোওই প্রকাশ করা হয় না।

শক্তিশালী ডিজিটাল কমপিউটার আর সফিসটিকেটেড জাইরোকমপাস-এর সাহায্যে পানির নীচ দিয়ে অনায়াসে চলাচল করে অর্জুন, এমনকী গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা সাগরের তলাও কোনও সমস্যা নয়। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম স্যাটেলাইট নেটওঅর্কও ব্যবহার করছে ওরা, ফলে বিশাল মহাসাগরের ঠিক কোথায় কখন আছে বুঝে নিতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি সময় লাগে না ক্যাপটেন শিবনাথ নাইডুর; ভুলের মার্জিন বড়জোর কয়েক মিটার।

বিশেষ ধরনের অ্যান্টেনার সাহায্য নিয়ে রেডিও মেসেজ রিসিভ ও ট্র্যান্সমিট করা হয়।

প্রায় প্রতিটি মিশনেই ইলেকট্রনিক সাইলেন্স বজায় রাখার নিয়ম, ফলে নিজেদের স্যাটেলাইট থেকে ব্রডকাস্ট করা ইনকামিং মেসেজ কপি করা ছাড়া রেডিও অপারেটর অরোরা চৌহান-এর আর কোনও কাজ নেই।

কোড করা এই মেসেজের মাধ্যমেই নৌ-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার থেকে যখন যেমন প্রয়োজন নির্দেশ পায় ওরা। তবে পানির নীচে থাকা অবস্থায়ও লো ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও ওয়েভ পিক করতে পারবে চৌহান, ট্রেইলিং ওয়্যায়্যার অ্যান্টেনার সাহায্য নিয়ে।

পাঁচ হপ্তার রুটিন অপারেশনাল সিক্রেট ভয়েজ-এর উদ্দেশ্য হলো সুবিশাল ভারত মহাসাগর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন, যুদ্ধ ছাড়াও এই অভিজ্ঞতাকে আরও অনেক কাজে লাগানো যাবে।

অর্জুন যেহেতু ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন, মারণাস্ত্র হিসাবে সঙ্গে আছে টিউবে ভরা আটটা ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল, প্রতিটিতে একটা করে প্রচণ্ড শক্তিশালী নিউক্লিয়ার ওঅরহেড ফিট করা। এক-দেড় কোটি মানুষ বাস করে এরকম একটা বড় শহরকে চোখের নিমেষে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে প্রতিটি নিউক্লিয়ার ওঅরহেড।

এই মুহূর্তে কমান্ডার ও ক্যাপটেন, দুজনেই ব্রিজে; শিষ্যকে আশীর্বাদ করছেন গুরু।

রাত ঠিক বারোটায় অর্জুনের দায়িত্ব কমান্ডার সন্দীপনের হাতে তুলে দিয়ে ব্রিজ থেকে বিদায় নিলেন শিবনাথ নাইডু। করিডর ধরে অফিসার্স কোয়ার্টারের দিকে ফিরছেন তিনি।

অফিসার্স কোয়ার্টারের কাছাকাছি পৌঁছে প্রবীণ ক্যাপটেন ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আর মাত্র দুদিন পর অবসর নিতে যাচ্ছেন, অথচ এখনও পরিষ্কার নয় জীবনের বাকি দিনগুলো কীভাবে কাটবে তাঁর।

একটাই মাত্র ছেলে, বউ-বাচ্চা নিয়ে ইউরোপে থাকে; সেখান থেকে তাগাদা দিয়ে বলা হয়নি, তুমি চলে এসো আমাদের কাছে। মেয়েও একটা, স্বামীর সঙ্গে একই ভার্সিটিতে শিক্ষকতা করে, থাকে দুই কামরার একটা ফ্ল্যাটে; ওরা চাইলেও ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে নেই ওঁর।

বাকি থাকল নিজ গ্রাম। উষর মরুতে সেটা, রাজস্থানের প্রত্যন্ত এলাকায়। আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়ে টলে উঠলেন ক্যাপটেন নাইডু। হুম, ভাবলেন তিনি, প্রেশারটা আবার বাড়ায় মাথা ঘুরছে।

একটু পরেই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন ক্যাপটেন নাইডু। করিডর ঢালু হয়ে গেছে একদিকে। হোঁচট খেলেন তিনি, বুঝতে পারলেন সামনের দিকেও ঝুঁকে আছে অর্জুন। ওহ্, ভগবান! সন্দীপন ডাইভ দিচ্ছে! কেন?

সাবধানে ঘুরলেন ক্যাপটেন, করিডরের দেয়ালে ফিট করা লম্বা সাপোর্ট বার আঁকড়ে ধরে ধীরে ধীরে ব্রিজের দিকে ফিরছেন।

কিন্তু ওঁর আর ফেরা হলো না।

ব্রিজ। হঠাৎ কমপিউটার স্ক্রিনে চোখ পড়তে বিচিত্র একটা দৃশ্য দেখতে পেল সন্দীপন। প্রথমে বড়সড় এক ঝাঁক হাঙর, তারপর প্রকাণ্ড আকারের কয়েকটা স্কুইড তির্যক একটা পথ ধরে দিশেহারা ভঙ্গিতে সাগরের গভীর থেকে উঠে এল, যেন কারও ধাওয়া খেয়ে পালাচ্ছে।

ওগুলোর পিছু নিয়ে উঠে এল কয়েকটা নীল তিমি। মনে হলো কোনও কারণে সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়েছে ওগুলো, এতই বিচলিত, যে প্রায় তিনশ' ফুট লম্বা অর্জুন কিংবা ওটার তিন পাশে ফিট করা চোখ-ধাঁধানো সার্চলাইট যেন দেখতেই পেল না। একেবারে শেষ মুহূর্তে কয়েকটা কোনও রকমে এড়িয়ে যেতে পারল সাবমেরিনটাকে, দুটো সোজা এসে গোত্তা খেল ইস্পাতের চেয়েও শক্ত টাইটেনিয়ামের গায়ে।

প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল সাবমেরিন। ডেকের সঙ্গে বোল্ট দিয়ে আটকানো নয় এমন প্রতিটি জিনিস ছিটকে পড়ল মেঝেতে। ঝনঝন শব্দে ভাঙল কাঁচের কাপ-পিরিচ-বাসন।

নিজেকে সামলে নেওয়ার পর চার-পাঁচটা স্ক্রিনে পালা করে তাকাচ্ছে সন্দীপন। অর্জুনের চারপাশে একই দৃশ্য—ঝাঁক ঝাঁক উদভ্রান্ত মাছ যে যেদিকে পারে ছুটে পালাচ্ছে। সচল ও নিশ্ছিদ্র রুপালি মেঘের মত লাগছে ওগুলোকে। ব্যাপারটা কী!

সন্দীপন ভাবল, দেখা দরকার কী ব্যাপার। ডাইভ দেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের সুইচ টিপল কয়েকটা। তারপর মেসেজ পাঠাল ইঞ্জিন আর রেডিও রুমে—আমরা ডাইভ দিচ্ছি।

একশ' বিশজন ক্রুর মধ্যে এই মুহূর্তে চল্লিশজন বিভিন্ন পোস্টে ডিউটি দিচ্ছে, ডাইভ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের সবার নিয়তির চাকা বিশেষ একদিকে ঘুরিয়ে দিল সন্দীপন। ওর নিজেরটাও।

অর্জুনের স্পিড এই মুহূর্তে প্রতি ঘণ্টায় বিশ নটিকাল মাইল।

গোত্তা খেয়ে নীচে নামছে অর্জুন। সার্চলাইটের উজ্জ্বল আলোয় এখন শুধু মাছ নয়, সন্দীপনের চোখে নীল শ্যাওলাও ধরা পড়ছে। দেখতে দেখতে শ্যাওলাই বেশি হয়ে উঠল, মাছগুলো তার ভিতরে হারিয়ে যাচ্ছে। কী ঘটছে ধারণা করতে পেরে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল সন্দীপন, কিন্তু খেয়ালি প্রকৃতি ওকে সময় দিল না।

অকস্মাৎ একযোগে যান্ত্রিক চিৎকার জুড়ে দিল কয়েক ধরনের অ্যালার্ম সিস্টেম।

ঝট করে সোনার ডিসপ্লের দিকে তাকাতেই অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠল সন্দীপনের। সাগরের নীচের দিক থেকে অর্জুনকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে নিরেট অথচ অচেনা আকৃতি। একটা নয়, অসংখ্য।

আরেকটা ডিসপ্লে অ্যালার্ম বাজিয়ে জানান দিচ্ছে সাগরের তলায় ভূমিকম্প শুরু হয়েছে, এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি মাত্রায় ধরা পড়ছে আন্দামান সাগরের তলায়।

ঘড়ির ডায়ালে চোখ বুলাল সন্দীপন। বিচিত্র দৃশ্যটা প্রথম দেখবার পর থেকে মাত্র পঁচিশ সেকেন্ড পার হয়েছে। কন্ট্রোল প্যানেলের উপর ঝুঁকে বিদ্যুৎবেগে কয়েকটা সুইচ টিপল ও।

যত দ্রুত ডাইভ দিয়েছিল, তার দ্বিগুণ গতিতে উপরে উঠছে অর্জুন। আরও দশ সেকেন্ড পর, কমপিউটার স্ক্রিনে তাকিয়ে আছে সন্দীপন, অকস্মাৎ সার্চলাইটের উজ্জ্বল আলো ম্লান হয়ে গেল। তার বদলে আন্দামান সাগরের গভীর অতলে টকটকে

লাল আগুন দেখতে পেল ও। তবে সেটা মাত্র দুই কি তিন সেকেন্ডের জন্য।

ওদের সবার দুর্ভাগ্য যে এই মুহূর্তে অর্জুনের একটু সামনে, মাত্র একশ' বিশ ফুট নীচে, একটা ডুবো আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে।

চোখের পলকে টকটকে লাল জ্বালামুখটা এত বড় হয়ে উঠল, ওটা ছাড়া স্ক্রিনে আর কিছু থাকল না।

ঠিক এই মুহূর্তে ওর মনে পড়ল, ছেলেটার নাম রাখা হয়নি। ওহ্ ভগবান, ভাবল ও, ছেলেটাকে আমার দেখাই হলো না!

পরবর্তী কয়েকটা সেকেন্ড যেন স্লো মোশন সিনেমা হয়ে উঠল। উত্তপ্ত লাভার বিস্ফোরণ ধাওয়া করল ছুটন্ত অর্জুনকে। গতি আরও বাড়াতে সন্দীপন যেন অসহ্য রকম দেরি করছে, আসলে সুইচগুলো টিপতে আধ সেকেন্ডের বেশি লাগেনি ওর। তরল লাভার সঙ্গে উঠে আসছে নিরেট পাথর, সেগুলোও লাল আগুন হয়ে আছে।

লাভার উদ্গিরণ এক পলকে সাবমেরিনটাকে ঢেকে দিল। টাইটেনিয়ামে তৈরি শরীর, সহজে গলবে না বা পুড়ে ছাই হবে না, তবে নিশ্চয়ই ক্ষতবিক্ষত হবে।

নিভে গেল সার্চলাইট, কাজেই অর্জুনের বাইরে কী হচ্ছে দেখবার সুযোগ থাকল না। সেই সঙ্গে অচল হয়ে পড়ল ক্যামেরা, বিভিন্ন ধরনের সেনসর আর ডিটেকটিং ইকুইমেন্ট।

এক মুহূর্ত পরে হামলা করল পাথরগুলো। পাথর নয়, যেন একেকটা প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরক, ছিটকে এসে টর্পেডোর মত আঘাত করছে।

প্রচণ্ড ঝাঁকি খাচ্ছে সাবমেরিন। তুবড়ে যাচ্ছে টাইটেনিয়াম খোল। ভিতরের ইকুইপমেন্ট আর টিউবিং দুমড়ে-মুচড়ে, চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছে। থামাথামি নেই, একের পর এক পাথরের আঘাতে সাবমেরিনের ভিতর দিকের গায়ে আটকানো মোটা তারগুলো

ছিঁড়ে যাচ্ছে। ফেটে যাচ্ছে বিভিন্ন আকারের টিউব।

বিদ্যুৎ চলে গেল। অর্জুনের ভিতরে নেমে এল গাঢ় অন্ধকার।

সঙ্গে সঙ্গে নয়, এক মিনিট পর জ্বলল ইমার্জেন্সি লাইট।

প্রথমেই ইন্টারকমে মিসাইল সেকশনের সঙ্গে যোগাযোগ করল সন্দীপন: 'কমান্ডার বলছি। লেফটেন্যান্ট মাধব লাল, রিপোর্ট!'

'সার,' রিপোর্ট করছে লেফটেন্যান্ট, চারজন টেকনিশিয়ান আর পাঁচজন জোয়ানকে নিয়ে মিসাইল সেকশন পাহারা দিচ্ছে ও। 'এখানে আমরা প্রতিটি কফিন সিল করা দেখতে পাচ্ছি, একটারও কোনও ক্ষতি হয়নি।' মিসাইল রাখার টিউবগুলোকে কফিন বলে ওরা। 'তবে মিসাইল সেকশনের আউটার ওয়াল বেশ খানিকটা তুবড়ে গেছে।'

সন্দীপনের হার্টবিট আরও একটু বাড়ল। 'সিরিয়াস? ফাটল ধরার মত?'

ইতস্তত করে জবাব দিল মাধব লাল। 'না, সার, ঠিক অতটা সিরিয়াস নয়।'

'তুমি আমাকে খানিক পরপর রিপোর্ট করবে,' নির্দেশ দিয়ে লাইন কেটে দিল সন্দীপন, তারপর যোগাযোগ করল রেডিও রুমের সঙ্গে। 'কমান্ডার। চৌহান, রিপোর্ট!'

রেডিও রুম থেকে অপারেটর অরোরা চৌহান রিপোর্ট করল, 'কমান্ডার, সার, রেডিও কাজ করছে না। স্যাটেলাইট কানেকশনও হারিয়ে ফেলেছি।'

'টেকনিশিয়ানদের দেখতে বলো কোথায় কী হয়েছে,' তাগাদার সুরে নির্দেশ দিল সন্দীপন। 'রেডিও কিংবা স্যাটেলাইট কানেকশন, দুটোর যে-কোনও একটা চালু করতে বলো।'

'ইয়েস, সার,' বলল অপারেটর চৌহান। 'ওরা এরইমধ্যে কাজ শুরু করেছে।'

সে থামতেই ইন্টারকমে নেভিগেশনাল অফিসার রাকেশ মেহতার হাহাকার শুনতে পেল সন্দীপন। 'ডেড! ডেড! সব ডেড হয়ে গেছে...ডিরেকশন ফাইন্ডার, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম, সোনার, পেরিস্কোপ ফ্যাসিলিটি...অল আর ডেড!'

তাকে শান্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে আবার রেডিও অপারেটর অরোরা চৌহানের সঙ্গে যোগাযোগ করল সন্দীপন। 'রেডিও রুম, কমান্ডার সন্দীপন।'

'ইয়েস, সার!'

'অপারেটর চোপরা, প্রথম সুযোগেই বেসকে আমাদের পজিশন জানাবে তোমরা, আই রিপিট, প্রথম সুযোগেই বেসকে আমাদের পজিশন জানাবে তোমরা।'

'ইয়েস, সার!'

প্রতি সেকেন্ডে আগ্নেয়গিরির কাছ থেকে দূরে সরে আসছে অর্জুন, তা সত্ত্বেও পাথরের হামলা মুহূর্তের জন্যও থামেনি। যেন জ্যান্ত প্রাণীর প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে সাবমেরিনকে ধাওয়া করছে ওগুলো, ক্ষতবিক্ষত খোলের গায়ে লেগে বোমার মত বিস্ফোরিত হচ্ছে, যতটা পারা যায় তুবড়ে দিচ্ছে ওটাকে।

স্যাটেলাইট কানেকশন আবার পাওয়া মাত্র ভিশাখাপতনম ঘাঁটির উদ্দেশে কোড করা মেসেজ পাঠাল রেডিও রুমের টেকনিশিয়ানরা। কিন্তু মেসেজটা জায়গামত পৌঁছাল কি না বোঝার আগেই আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ।

প্রথমবার চিফ ইঞ্জিনিয়ার কুলদীপ সাকসেনা-র সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে সন্দীপন, জরুরি কাজে ইঞ্জিন রুমে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। আবার যোগাযোগ করতে অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে ভদ্রলোকের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিন, কমান্ডার। রিয়্যাক্টরের কোনও ক্ষতি হয়নি, কিংবা কোথাও কোনও লিকও দেখতে পাচ্ছি না। তবে টিউবিং-এর মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে।'

সন্দীপন নির্দেশ দিল, 'ব্যাখ্যা করুন, প্লিজ, মিস্টার সাকসেনা।'

'রিয়্যাক্টর থেকে হিট এনার্জি পেয়েও তো কোনও লাভ নেই,' বললেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার, 'সেটার তৈরি বাষ্প পাইপিং সিস্টেমে পেতে হবে আমাদের। কিছু কিছু পাইপ আর টিউব এমন চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, ওখান দিয়ে কিছুই পাস করছে না। সব এখনও দেখা হয়নি, আমার ধারণা প্রচুর পাইপ আর তার ছিঁড়েও গেছে...'

মনে মনে প্রমাদ গুণল সন্দীপন। 'তার মানে যে-কোনও মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে ইঞ্জিন।'

একটা ঢোক গিললেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাকসেনা। 'সেই ভয়েই তো কলজে শুকিয়ে যাচ্ছে, কমান্ডার।'

সন্দীপন বলল, 'আলো যদি না থাকে বা ফিরতে দেরি হয়, মেরামতের কাজ বন্ধ করা চলবে না। সবার ছুটি বাতিল করা হচ্ছে, যে-কজন মেকানিক লাগে ডেকে নিন। আমি চাই অর্জুনের প্রতিটি ইঞ্চি সার্চ করে দেখুক তারা কোথায় কী হয়েছে।'

'ইয়েস, সার!'

এক মুহূর্ত পর সহকারী লেফটেন্যান্ট মুরালিমোহনকে ইন্টারকমে নির্দেশ দিল সন্দীপন। 'সবাইকে ডিউটিতে আসতে বলো। প্রত্যেককে নিজের সঙ্গে টর্চ রাখতে হবে। এবং...'

'সার?'

'সবাইকে প্রার্থনা করতে বলো,' বুকে আবেগ উথলে উঠলেও, কথাটা বলবার সময় একটুও কাঁপল না সন্দীপনের কণ্ঠস্বর। তবে তাড়াতাড়ি যোগাযোগ কেটে দিল ও।

একটু পরেই ইমার্জেন্সি লাইট নিভে গেল। সেই সঙ্গে এবার বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিনও।

ইঞ্জিন বন্ধ হলেও, সাবমেরিন থামল না। সমস্ত যন্ত্রপাতি

অচল হয়ে পড়ায় প্রথমে সন্দীপন ধরতে পারল না কেন কী ঘটছে।

প্রথমে ধরা পড়ল কাঁপুনি, তারপর চরকির মত ঘোরা।

অবিরাম থরথর করে কাঁপছে অর্জুন। এরকম কাঁপুনি শুধু ফুল স্পিডে ছোটার সময় অনুভব করে ওরা। ইঞ্জিন বন্ধ, কোনও যন্ত্রপাতিই কাজ করছে না, তবু তুমুল গতিতে চলছে সাবমেরিন।

সেই সঙ্গে ঘন ঘন পাক খাচ্ছে আর ডিগবাজি দিচ্ছে অর্জুন। কখনও একটা ছন্দ ধরে, আবার কখনও কোনও ছন্দ ছাড়াই কাত হয়ে যাচ্ছে ক্রুরা, দ্রুত কিংবা মন্থর গতিতে। মাঝে মধ্যে অকস্মাৎ ছিটকে পড়ছে বাল্কহেডের উপর।

ধীরে ধীরে বুঝতে পারল সন্দীপন কী ঘটছে। শুধু একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি অকস্মাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠে উদ্গিরণই শুরু করেনি; আন্দামান সাগরের তলায় বিশাল এলাকা জুড়ে ঘটে গেছে প্রচণ্ড ভূমিকম্প। সেই ভূমিকম্পের ফলে তৈরি পানির তোড় খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে দুশ' আশি ফুট লম্বা অর্জুনকে। কোনও প্রতিরোধ-শক্তি নেই, কেউ ওটাকে নিয়ন্ত্রণও করছে না, ফলে বিপুল জলরাশির তীব্র আলোড়নের মধ্যে পড়ে পাক খাচ্ছে অনবরত—কখনও লাটিম, কখনও চরকির মত।

রোমহর্ষক দুঃস্বপ্নের ভিতর সময় কাটছে একশ' বিশজন মানুষের। কাঁপুনি আর ঘোরাটা অনুভব করবার পর প্রথম এক মিনিটের মধ্যে সবাই ওরা শক্ত কিছু ধরে ফেলেছে। প্রত্যেকে জানে কী ঘটছে। জানে যে-কোনও মুহূর্তে একটা ডুবো-পাহাড়ের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে পারে, আর সেরকম কিছু হলে সবার ভাগ্যে একই সঙ্গে সলিল সমাধি নিশ্চিত।

কেউ বলতে পারবে না কীভাবে কেটে গেল কয়েকটা মিনিট। নিজেদের কোয়ার্টার থেকে সাহসী কয়েকজন ক্রু রওনা হলো ব্রিজের দিকে, ক্যাপটেন আর কমান্ডার কেমন আছেন

জানবার জন্য। তারাই প্রথমে ক্যাপটেন শিবনাথ নাইডুর রক্তাক্ত লাশটা করিডরে পড়ে থাকতে দেখল।

শক্ত দেয়ালের সঙ্গে মাথা ঠুকে যাওয়ায় খুলি ফেটে মারা গেছেন ক্যাপটেন। লাশটা সিক বে-তে নিয়ে গিয়ে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিল তারা। সবাই শোকার্ত, তবে ব্যাপারটা নিয়ে কারও মধ্যে কোনও রকম হা-হুতাশ নেই। কারণটা বোধহয় এই যে সবাই জানে ওদের পরিণতিও ক্যাপটেন নাইডুর মতই হতে যাচ্ছে।

আরেকটা গ্রুপ আগেই পৌঁছে গেছে ইঞ্জিন রুমে। ব্রিজের দায়িত্ব লেফটেন্যান্টের উপর ছেড়ে দিয়ে কমান্ডার সন্দীপনও পৌঁছাল সেখানে মেরামতির কাজ কী রকম এগোচ্ছে দেখবার জন্য।

মাথার উপর ভারী খড়গ ঝুলে থাকলেও, যে-কোনও বিপদকে ভুলে থাকবার ট্রেনিং নেওয়া আছে ওদের, অফিসার আর ক্রুরা প্রত্যেকে কোনও না কোনও কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ফলে কেউ বলতে পারবে না কীভাবে কেটে গেল প্রথম এক ঘণ্টা।

তবে কখন কী সমস্যা দেখা দিতে পারে তা মনে রেখে আগেভাগেই তার সমাধান বের করে ফেলছে ওরা। যেমন ইমার্জেন্সি লাইট নিভে যাওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে অক্সিজেনের অভাবে সবাই যখন হাঁপাতে শুরু করল, তার আগেই ব্যাটারি চালিত পোর্টেবল মোটরের সাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া হ্যাইড্রলাইসিস চালু করা হয়ে গেছে, সাগরের পানি থেকে ওরা যাতে আগের মতই অক্সিজেন সাপ্লাই পেতে পারে।

তবে কেউ একজন মনে করিয়ে দিল, ব্যাটারির সাপ্লাই অফুরন্ত নয়। ওগুলো শেষ হয়ে গেলে অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে।

বিকল্প কী তা-ও সবার জানা আছে। টিউবিং সিস্টেম

মেরামত করে রিয়্যাক্টর থেকে পাওয়ার সাপ্লাই পেতে হবে। তা না হলে অক্সিজেনের অভাবে মারা যাবে সবাই।

ব্রিজে ফিরে এসে অফিসারদের সঙ্গে জরুরি মিটিঙে বসল কমান্ডার সন্দীপন। কয়েকটা বিষয়ে একমত হলো ওরা।

বিস্ফোরিত আগ্নেয়গিরির লাভা আর পাথর সরাসরি আঘাত করেছে সাবমেরিনের গায়ে, তা সত্ত্বেও ওরা বেঁচে আছে ভাগ্যগুণে নয়, অর্জুন টাইটেনিয়ামের তৈরি বলে। প্রচণ্ড একটা সুনামির মধ্যে পড়েছে ওরা। কম্পনের মাত্রা আন্দাজ করে বোঝা যাচ্ছে স্রোতের গতি কমা তো দূরের কথা, এখনও বেড়েই চলেছে। আর সব কিছুর মত পেরিস্কোপও কাজ করছে না, ফলে জানার কোনও উপায় নেই পানির সারফেস থেকে কতটা গভীরে রয়েছে ওরা; এ-ও বোঝা যাচ্ছে না এক ঘণ্টা তীব্র স্রোতের টানে কোথায় চলে এসেছে অর্জুন, কিংবা ডাঙা থেকে কতটা দূরে রয়েছে ওরা।

এরপর চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাফ জানিয়ে দিলেন, টিউবিং সিস্টেমে এত বেশি ক্ষতি হয়েছে, ইঞ্জিন আদৌ চালু করা সম্ভব কি না বলা যাচ্ছে না।

অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ ইঞ্জিনিয়ার জানাল, ইঞ্জিন মেরামতের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, ইঞ্জিন রুমের আশপাশের খোল মেরামত। মূল আচ্ছাদন টাইটেনিয়াম হলে কি হবে, পঞ্চাশটা অংশে ফাটল তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় তোবড়ানোর মাত্রা এতই ভয়াবহ যে মেরামতে হাত দেওয়া বা ফেলে রাখা, দুটোই সমান বিপজ্জনক।

কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ইঞ্জিন আর খোলের তোবড়ানো অংশ মেরামত, দুটো কাজ সমান তালে চলবে। যে-কোনও মূল্যে, দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, নিউক্লিয়ার ওঅরহেডসহ আটটা মিসাইলকে রক্ষা করতে হবে।

এক ঘণ্টা পর আবার বসবে ওরা, এ-কথা বলে শেষ করা

হলো মিটিং।

এক এক করে আরও চারবার বসল ওরা। একবারও রিপোর্ট করবার মত তেমন কিছু পাওয়া গেল না, শুধু শেষ মিটিঙে ধারণা করা হলো যে সুনামির গতি কমে আসায় সাবমেরিনের কাঁপুনিও কমে এসেছে। তা ছাড়া, বেশ কিছুক্ষণ হলো, অর্জুন আর পাক খাচ্ছে না। জানা গেল ব্যাটারির সাপ্লাই প্রায় শেষ, আর ঘণ্টা দুয়েক চলতে পারে।

ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে সাফল্য পেল ইঞ্জিনিয়াররা। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ইঞ্জিনে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া সম্ভব হলো। এবং চালু হলো ইঞ্জিন।

আনন্দ আর উল্লাস ধরে রাখতে না পেরে পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি করছে ক্রুরা। ইঞ্জিনে যখন পাওয়ার আসছে, বাকি সব ইকুইপমেন্টেও তা দেওয়া যাবে—একটু হয়তো সময় লাগবে, এই যা।

গতি আগেই মন্থর হয়ে এসেছে, সহনীয় স্রোতের টানে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ভেসে চলেছে ওরা। ভারতীয় নৌ-বাহিনীর গৌরব অর্জুনের আংশিক নিয়ন্ত্রণ আবার ফিরে পেয়ে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে সন্দীপন।

একমাস বয়েসী ছেলেটার কথা আবার মনে পড়ে গেল ওর, সেই সঙ্গে ডালপালা ছড়াতে শুরু করল রঙিন স্বপ্নগুলো। এখনও পেরিস্কোপ কাজ করছে না; কাজ করছে না সোনার বা রেইডার; অচল হয়ে আছে রেডিও; স্যাটেলাইট কানেকশনও বিচ্ছিন্ন। ইঞ্জিনিয়াররা জানিয়েছে, সব আবার ঠিকঠাক করতে আরও ঘণ্টা দুয়েক লাগবে ওদের।

তবে সবার আগে ব্রিজ আর কন্ট্রোল প্যানেলে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার সন্দীপনকে অনেক আগেই বলেছেন, ব্যালাস্ট ট্যাংকগুলোর কোনও ক্ষতি হয়নি। কথাটা মনে ছিল,

তাই কন্ট্রোল প্যানেল চালু হতেই দ্রুত সুইচ টিপে ভরাট কয়েকটা ট্যাংক খালি করে ফেলল সন্দীপন। সঙ্গে সঙ্গে বয়্যান্সি ফিরে পেয়ে সাগরের সারফেসে ভেসে উঠল সাবমেরিনটা।

কনিং টাওয়ারে উঠে এসে উথালপাথাল ঢেউ আর জোরাল স্রোত ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না সন্দীপন। চারপাশে যতদূর দৃষ্টি যায়, না আছে কোনও ডাঙা, না কোনও জলযান, দুর্যোগের কারণে উত্তাল সাগর ফাঁকা পড়ে আছে। সাগরের পানি কালচে নীল।

চোখে বিনকিউলার তুলে দূরে তাকাল সন্দীপন। নাহ্, কোনওদিকেই কিছু দেখা যাচ্ছে না। ওর পাশ থেকে নেভিগেশনাল অফিসার রাকেশ মেহতা বলল, 'পাঁচ ঘণ্টা একটানা ভেসে আসায় আমরা বোধহয় মায়ানমার উপকূলে পৌঁছে গেছি, সার। প্রথমদিকে স্পিড খুব বেশি ছিল, বলা যায় না দিগন্তের ওপারেই হয়তো বাংলাদেশ।'

আমার দাদু আর বাবার জন্মভূমি, ভাবল সন্দীপন। নেহাতই অপ্রাসঙ্গিক ভাবনা। তারপর, যেন কোনও প্রসঙ্গেরই আর কোনও গুরুত্ব নেই এটা বোঝাবার জন্য আবার বন্ধ হয়ে গেল পাওয়ার সাপ্লাই।

পায়ের নীচে মৃদু কাঁপুনি থেমে যেতেই সন্দীপন বুঝতে পারল, ইঞ্জিন চলছে না। কনিং টাওয়ার থেকে ধাপ বেয়ে নীচে নেমে আসছে, এই সময় ক্রুদের আর্তনাদ ওর কানে এসে আঘাত করল।

'পানি ঢুকছে! পানি ঢুকছে! লিক হয়ে গেছে খোল! হে ভগবান...'

কী হয়েছে বলে দেওয়ার দরকার নেই, নিজেই বুঝতে পারল সন্দীপন। সবচেয়ে মারাত্মক আশঙ্কাটাই সত্যি হয়েছে, তোবড়ানো খোল অবশেষে ফেটে গেছে।

বিস্ফোরিত খোল ভিতরে ডেকে নিল সাগরকে। কয়েক শো

টন ওজন নিয়ে বিশাল কয়েকটা বুদ্বুদ তৈরি করে তলিয়ে গেল ভারতীয় নৌ-বাহিনীর গর্ব ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন অর্জুন। মা-বাপকে ডাকারও ফুরসত পাওয়া গেল না, একশ' উনিশজন ক্রু আর অফিসারকে নিয়ে ডুবে গেল কমান্ডার সন্দীপন ব্যানার্জি।

গোটা আকাশ ঢাকা পড়ে আছে ঘন কালো মেঘে।

দুই

চার মাস পর।

কুয়ালালামপুর। হোটেল হিলটন ইন্টারন্যাশনালের ছয়তলা। শীতের শুরু, মনোরম সন্ধ্যা, মালয়েশিয়ার রাজধানীতে জমে উঠেছে বছরের প্রথম ফ্যাশন শো।

সাধারণত যা হয়, দেশি-বিদেশি বাছাই করা এক ঝাঁক সুন্দরী মডেল মনকাড়া সব ডিজাইনের ড্রেস পরে ক্যাটওয়াকে আসা-যাওয়া করছে। খাতা-কলম হাতে দর্শকদের সারিতে বসে আছেন ইউরোপ-আমেরিকা আর সিঙ্গাপুর-হংকং থেকে আসা চেইন শপের মিলিওনেয়ার মালিকরা, কোনও ড্রেস পছন্দ হলে নম্বরটা টুকে রাখছেন।

দুনিয়ার সেরা ফ্যাশন হাউসগুলো নিজেদের ডিজাইন নিয়ে হাজির হয়েছে এখানে, তাদের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিচ্ছে কয়েকটা মালয়েশিয়ান কোম্পানি।

মাত্র দু'ঘণ্টার শো, তাতেই কয়েক মিলিয়ন মার্কিন ডলারের

অর্ডার পেয়ে বরাবরের মত আবারও বেচা-বিক্রির তালিকার শীর্ষে উঠে এল কুয়ালালামপুরের বিখ্যাত হটস্পট ফ্যাশন হাউস।

অ্যাড্রেস সিস্টেমে তথ্যটা জানাবার পর শো পরবর্তী বুফেতে জড়ো হওয়া আয়োজক আর ক্রেতাদের মধ্যে এটাই আলোচনার মূল বিষয় হয়ে উঠল। এক্সপার্টদের ধারণা, ডিজাইনার হিসাবে সুরাইয়া জেবিন নিঃসন্দেহে জিনিয়াস; ওর নিত্যনতুন উদ্ভাবনই ওকে সব সময় জিতিয়ে দিচ্ছে।

দুনিয়ার সেরা সব মডেল ভিড় করেছে এখানে। সবাই যেন ডানাকাটা পরী, কেউ কারও চেয়ে কম যায় না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, বুফে কাউন্টারে উপস্থিত হয়ে ওদের সবাইকেও যেন ম্লান করে দিল মালয়েশিয়ান ওই সুন্দরী ডিজাইনার সুরাইয়া জেবিন।

কমলা রঙের হাত-কাটা ব্লাউজ আর আঁটসাঁট করে পরা ওই একই রঙের জর্জেটের শাড়ি আগুনের শিখা বানিয়ে দিয়েছে ওকে।

নাম শুনলেও, গল্পটা জানলেও, সবাই সুরাইয়া জেবিনকে চেনে না; বিশেষ কোনও অনুষ্ঠান ছাড়া খুব কমই বাইরে বের হয় ও। যে একবার তাকাল, তার পক্ষে আর চোখ ফেরানো সম্ভব হলো না।

আঞ্চলিক এক রাজপরিবারের মেয়ে সুরাইয়া, লেখাপড়া শিখে বড় হয়েছে ইংল্যান্ডে। ওখানেই অল্প-বয়েসে বিয়ে হয়েছিল কোনও এক মালয়েশিয়ান রাজপুত্রের সঙ্গে। গভীর জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে বন্য হাতির আক্রমণে মারা যায় ওর স্বামী।

স্বামী মারা যাওয়ার পর ফ্যাশন ডিজাইনিং-এ মাস্টার্সটা শেষ করেছে সুরাইয়া, তারপর স্বাধীন পেশা হিসাবে একটা ফ্যাশন হাউস খুলে বসেছে। দিন দিন আরও ভাল হচ্ছে ওর ব্যবসা।

সুরাইয়ার চোখ-ধাঁধানো রূপ আর বাঁধভাঙা যৌবন অনেককেই মুগ্ধ করছে, সেটাই স্বাভাবিক; তবে আজ একজনকে যেন একেবারে পাগল বানিয়ে দিল।

তরুণ এক তাইওয়ানিজ পর্যটক সে, নিজের পরিচয় দিচ্ছে তুং শান বলে।

পর্যটক হলেও, ফ্যাশন শো দেখতে এসে হটস্পট-এর বেশ কিছু ডিজাইন তার পছন্দ হয়ে যাওয়ায় প্রায় নব্বুই হাজার ডলারের অর্ডার দিয়েছে তুং শান। কাউন্টারে গিয়ে অ্যাডভান্স করবার সময় হটস্পটের সেলসগার্লকে সহাস্যে জানিয়েছে, 'এ-সব ড্রেস বিক্রি করার জন্যে কিনছি না। আমার তো কোনও দোকানই নেই।'

'তা হলে?' সেলসগার্ল বিস্মিত।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চিনা পর্যটক তুং শান জবাব দিয়েছে, 'বান্ধবীদের প্রেজেন্ট করব। বুঝতেই পারছ, সংখ্যায় তারা কম নয়।'

এই মুহূর্তে হলঘরে, বুফে কাউন্টারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে তুং শান; সুরাইয়ার বিপজ্জনক রূপ ধীরে ধীরে উন্মাদ করে তুলছে তাকে।

বুফে কাউন্টার থেকে নিজের প্লেটে শ্রিম্প আর কেভিয়ার ছাড়া আর কিছু নিল না সুরাইয়া, হাতে আগে থেকেই আছে শ্যাম্পেনভর্তি সরু গ্লাস; তারপর ধীর, প্রায় অলস পায়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে খোলা একটা টেরেসে চলে এল। এখানে একটা টেবিল ও দুটো চেয়ার ছাড়া আর কিছু নেই।

নিরিবিলিতে বসে খাওয়ার ফাঁকে রাস্তার ওপারে সুদৃশ্য পার্কের উপর চোখ বুলাচ্ছে সুরাইয়া। ভাল অর্ডার পাওয়ায় মনটা খুশিই, তবে ওর প্রত্যাশা ছিল আরও কিছুটা বেশি।

হঠাৎ খুক করে কেশে উঠে কে যেন ওর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে কাঁচের পার্টিশনের দিকে

তাকাল সুরাইয়া।

দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘদেহী একজন চিনা। সুদর্শন ও সুপুরুষ। চোখাচোখি হতে ছোট্ট করে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল তরুণ।

সুরাইয়াও একটু মাথা ঝাঁকাল।

'আপনি যদি অনুমতি দেন,' শুদ্ধ উচ্চারণে সবিনয়ে বলল চিনা তরুণ, হাবভাবে আভিজাত্য প্রকাশ পাচ্ছে। 'ভেতরে ঢুকে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই, প্লিজ।'

ইতস্তত করছে সুরাইয়া। অচেনা একজন বিদেশি ওর প্রাইভেসি নষ্ট করতে চাইছে। এরকম পরিস্থিতিতে সাধারণত অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করে ও, সেটা গোপনও করে না; কিন্তু এই ব্যক্তিটির মধ্যে আশ্চর্য সরল এমন একটা আকুলতা আছে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ও। ভাবছে, আমার ভুলও তো হতে পারে।

'প্লিজ, আমাকে একটা সুযোগ দিন,' আবার বলল তরুণ। 'দু'মিনিটও লাগবে না, জরুরি কথাটা বলে চলে যাব।'

এবার ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সুরাইয়া।

কাঁচ লাগানো দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে ভিতরে ঢুকল সুদর্শন তরুণ। খালি চেয়ারটা একটু পিছিয়ে নিয়ে বসল তাতে।

'আমি তুং শান। ছোটখাট কয়েকটা ব্যবসা আছে আমার,' এভাবে শুরু করল রহস্যময় চিনা তরুণ। 'তার মধ্যে একটা হলো শান ট্রেড লিঙ্ক। প্রতিদিন, এই ধরুন দশ মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করি আমরা।' হাসছে না সে, যেন বোঝাতে চাইছে—আমাকে তুচ্ছ মনে কোরো না।

শুধু সুদর্শন আর মার্জিত বলে নয়, সবিনয় আচরণে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা নেই বলেই ওর উপর বিরক্ত হতে পারছে না সুরাইয়া। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমার সাথে আপনার কী এমন জরুরি কথা থাকতে পারে,' বলল ও।

'ছোট্ট একটা প্রার্থনা,' কেতাদুরস্ত ভদ্রতার সঙ্গে বলল তুং শান। 'দয়া করে আপনি যদি আজ রাতে আপনার পছন্দমত অভিজাত কোনও হোটেলে আমার সঙ্গে ডিনার খান, আমি কৃতার্থ বোধ করব। প্লিজ!'

হতবাক হয়ে গেল সুরাইয়া। কে এই চিনা পর্যটক? এত স্পর্ধা সে পেল কোত্থেকে? অচেনা, বিদেশি মানুষ, হুট করে কোন্ আক্কেলে ডিনারের দাওয়াত দিয়ে বসে অচেনা মহিলাকে!

'দুঃখিত, প্রশ্নই ওঠে না,' বলল সুরাইয়া।

'আমি আপনার একজন অন্ধ ভক্ত,' আবেগের লাগাম টেনে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল চিনা পর্যটক। 'আপনাকে দেখার পর থেকে আমার শুধু পাগল হওয়া বাকি...'

'আপনি চান,' তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল সুরাইয়া, 'গার্ডদের ডাকি আমি?'

নার্ভাস হয়ে পড়েছে চিনা তরুণ, ঘামতে শুরু করেছে, হাঁপাচ্ছে একটু। 'শুনুন, প্লিজ! আগে কখনও এ-ধরনের পরিস্থিতিতে পড়িনি আমি—সেজন্যেই সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে আমার...'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না,' বলল সুরাইয়া। 'ঝুঝতে চাইও না। আপনি দয়া করে বিদায় নেবেন, না আমি উঠে চলে যাব?'

সীমা ছাড়িয়ে গেছে বুঝতে পেরে হতচকিত হয়ে পড়ল চিনা পর্যটক। 'প্লিজ, বিশ্বাস করুন, আপনাকে বিব্রত করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। দয়া করে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' সবিনয় ভদ্রতার সঙ্গে ছোট্ট করে মাথা নোয়াল ও, আর একটাও কথা না বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে বেরিয়ে গেল টেরেস থেকে।

চিনা উপদ্রব বিদায় হওয়ার পর সুরাইয়া ভাবল, লোকটার সঙ্গে কি খুব রূঢ় আচরণ করা হয়ে গেল? নাহ্, যা করেছে ঠিকই করেছে ও। লোকটা অসম্ভব বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল সুরাইয়া, খাওয়ার প্লেট সরিয়ে রেখে চুমুক দিল গ্লাসে, তাকিয়ে আছে নীচের পার্কের দিকে।

একটু পর নীচের রাস্তায় নড়াচড়া ধরা পড়ল চোখের কোণে। সেদিকে তাকাতেই চিনা পর্যটক তুং শানকে দেখতে পেল সুরাইয়া।

হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে তুং শান। তার সঙ্গে চারজন দানব আকৃতির লোক রয়েছে, দেখে মনে হলো সশস্ত্র দেহরক্ষী।

রাস্তা পার হয়ে পার্কিং লটে ঢুকল তারা। সোনালি একটা রোলস রয়েসে উঠল তুং শান। সঙ্গীরা উঠল দুটো মার্সিডিজে।

তুং শানকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল রোলস রয়েস। ওটার সামনে পিছনে একটা করে মার্সিডিজ। ঘন ঘন হর্ন বাজিয়ে তীর বেগে চলে গেল গাড়ি তিনটে।

কেন যেন সুরাইয়ার মনে হলো, ঝামেলাটা এখানেই শেষ হবে না।

সত্যি হলো না। পরদিন রাতে ওর ফ্যাশন হাউস হটস্পটে আবার এসে হাজির হলো তুং শান। আজও নার্ভাস সে, তবে নিজস্ব স্টাইল আর রুচি অনুসারে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে।

চিনা পর্যটকের মধ্যে আজও এমন কিছু দেখল সুরাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে ওকে বিদায় করে দিতে পারল না। শুধু নার্ভাস নয়, আজ ওকে অত্যন্ত ম্লান আর অসহায়ও লাগছে।

'আপনি আমাকে এভাবে বিরক্ত করছেন কেন?' নিজের খাস কামরায় বসাবার পর একটু নরম সুরেই জানতে চাইল সুরাইয়া।

হাতে করে একশ' সাদা গোলাপের একটা তোড়া নিয়ে এসেছে চিনা পর্যটক তুং শান। জ্যাকেটের পকেট থেকে অলঙ্কারের ছোট একটা বাক্স বের করল ও, সেটাও ডেস্কের উপর রাখল।

'চিনি না, জানি না, হঠাৎ এক ভদ্রমহিলাকে ডিনার খাওয়ার

আমন্ত্রণ দিয়ে বসলাম, কাজটা সত্যি ভাল করিনি আমি,' বলল ও। 'সেজন্য আবার আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই।'

কথা না বলে অপেক্ষা করছে সুরাইয়া।

'আসল কথাটা বলার আগে নিজের সম্পর্কে আপনাকে একটা ধারণা দিতে চাই আমি,' বেশ গুছিয়েই শুরু করল তুং শান। 'সবাই নিজের প্রশংসা করে, তারা ভালমানুষ; আমার আসলে এমন কোনও ভাল গুণ নেই যেটার কথা কাউকে বলা যায়। মাথা হেঁট করে আপনার কাছে স্বীকার করছি, আমি মানুষটা সত্যি ভাল নই। আমি মিলিওনিয়ার নই, বিলিওনিয়ার: কিন্তু একটা টাকাও সৎভাবে উপার্জন করিনি। হেন কোনও দুষ্কর্ম নেই যা করিনি আমি, বা যা আমার দ্বারা সম্ভব নয়...'

সুরাইয়া কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিল তুং শান, তারপর বলে চলল, '...কিন্তু আমি ভাল হয়ে যাব। এই দুনিয়ায় মাত্র একজনই আছেন, আমার শুধু ওঁর একটু দয়া দরকার—ব্যস, তুং শান নিষ্কলুষ হয়ে উঠবে, হয়ে উঠবে দুনিয়ার সেরা ভালমানুষদের একজন। তিনি যদি চান, আমার সমস্ত টাকা কালই আমি গরিব মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দেব।'

'এ-সব কথা আপনি আমাকে কেন শোনাচ্ছেন?' সুরাইয়া শুধু বিরক্ত নয়, খানিকটা বিব্রতও বোধ করছে। 'আপনার তো দেখছি মাথার ঠিক নেই...'

'সত্যি নেই,' ব্যাকুল সুরে বলল তুং শান। 'কারণ সারা দুনিয়ার সেরা সুন্দরীকে দেখামাত্র আমি ওঁর প্রেমে পাগল হয়ে গেছি। বিশ্বাস করুন, অপরাধজগৎ ছেড়ে দিয়ে সুস্থ জীবনে ফেরার কথা কখনওই আমি ভাবিনি, কিন্তু ওঁকে দেখামাত্র কোত্থেকে প্রবল একটা অনুপ্রেরণা পাচ্ছি। সব ত্যাগ করে শুধু ওঁকে নিয়ে কুটিরে বাস করতেও আমার আপত্তি নেই। আমার জীবনটা এখন ওঁর হাতে। একমাত্র তিনিই আমাকে ফেরাতে পারেন...'

রোলেক্স হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল সুরাইয়া। 'এবার আপনাকে এ-সব বন্ধ করতে হবে, মিস্টার তুং শান।'

তবু বলেই চলেছে চিনা তরুণ, যেন সুরাইয়ার কথা শুনতে পায়নি। 'আপনিই আমার সেই প্রেরণা, আমার জিয়নকাঠি, দা মোস্ট বিউটিফুল, অ্যান্ড দ্য মোস্ট চার্মিং গার্ল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড...

'তা-ই?' বলল সুরাইয়া।

'আপনি আমাকে অনুমতি দিন, প্লিজ,' মিনতি জানাল তুং শান। 'আপনাকে আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ের প্রস্তাব দিতে চাই। পাঁচ হাজার লোককে দাওয়াত দেব আমরা। সোনা নয়, আমি আমার প্রিয়তমাকে হীরে দিয়ে ঢেকে দেব।' ডেস্ক থেকে অলঙ্কারের বাক্সটা হাতে নিল সে। 'প্রতিটি সাগরে একটা করে দ্বীপ থাকবে আপনার, থাকবে ব্যক্তিগত জেট প্লেন, ইয়ট, ডজন ডজন রোলস রয়েস আর লিমাযিন। আপনার সেবা করবে পাঁচশো চাকর, আপনি হবেন...'

'স্টপ ইট!' বলল সুরাইয়া, 'প্লিজ।'

'আসার পথে এই আঙটিটা পঞ্চাশ হাজার ইউএস ডলারে কিনলাম।' অলঙ্কারের বাক্সটা খুলে সেটা বের করল তুং শান, তাতে বসানো বিরাট হীরেটা সগৌরবে চারদিকে উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়াচ্ছে। 'এখন দয়া করে আপনি যদি এই অভাগার প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তা হলে আপনার আঙুলে এটা আমি পরিয়ে দিতে পারি।'

অচেনা এই চিনা পর্যটক তুং শানকে যত দেখছে ততই বিস্মিত হচ্ছে সুরাইয়া। একটু যে ভয় পাচ্ছে না, তা-ও নয়। তবে খুব ভালভাবে জানা আছে ওর কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হয়। যতটা সম্ভব ভদ্র ভাষায় তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল ও। 'দুঃখিত, মিস্টার শান, স্বামী মারা যাওয়ার পর আমি আর বিয়ে করব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনার প্রস্তাবের

জন্যে ধন্যবাদ; এখন আমাকে একটা মিটিং অ্যাটেন্ড করতে হবে।'

মাথা নিচু করে ঝাড়া দশ সেকেন্ড বসে থাকল, তারপর বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে উঠে চলে গেল তাইওয়ানিজ পর্যটক। ফুলের তোড়াটা রেখে গেলেও, হীরের আংটিটা নিয়ে গেছে সে।

পরদিন আবার এল লোকটা। কিন্তু সুরাইয়া নির্দেশ দিয়ে রাখায় তাকে ভিতরে ঢুকতে দিল না গার্ডরা। সঙ্গের লোকগুলো জোর খাটাতে চাইল, খানিক ধস্তাধস্তিও হলো—কিন্তু সুরাইয়ার তিন বডিবিল্ডার গার্ড দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকল অটল পাহাড়ের মত। নিচুগলায় অত্যন্ত ভদ্র ভাবে গার্ডদের কাছে জানতে চাইল তুং শান, কে বারণ করেছে তাকে ঢুকতে দিতে। মালিকের হুকুম শুনে আর একটি কথা না বলে ফিরে গেল সে রোলস রয়েসে, ধীর গতিতে চলে গেল সোনালি গাড়িটা। সুরাইয়া লক্ষ করল, এবার রোলস রয়েসের সঙ্গে ফিরে গেল মাত্র একটা মার্সিডিজ।

মনিবের গাড়িটা চোখের আড়ালে চলে যেতেই অপর মার্সিডিজ থেকে একে একে নেমে এল বিশালাকৃতি চারজন সশস্ত্র তাইওয়ানিজ বডিগার্ড। ফ্যাশন হাউস হটস্পটের গার্ডদের প্রচণ্ড মারধর করে ভিতরে ঢুকল তারা। কাঁচের পার্টিশন, ফার্নিচার, পাতাবাহারের টব—সামনে যা পেল সব চুরমার করে ফেলল। ভাংচুরের আওয়াজ পেয়ে নিজের অফিস কামরায় তালা মেরে দিয়ে থানায় ফোন করবে বলে টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলল সুরাইয়া। কিন্তু সময় পাওয়া গেল না। লাথি মেরে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকল ওরা চারজন।

তাদের লিডার শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে সুরাইয়াকে বলল, 'আমার নাম ব্যাং চি। জরুরি কাজে আজই আমার বসকে মায়ানমারে ফিরতে হচ্ছে, তা না হলে তিনিই আপনাকে সঙ্গে

করে নিয়ে যেতেন। সে যাক, আগামীতে কী হবে বলে দিচ্ছি। সাতদিনের মধ্যে আপনি স্বেচ্ছায় তাঁর কাছে যাচ্ছেন, তা না হলে আমরা আপনাকে তুলে নিয়ে যাব।'

'কী, এত বড় স্পর্ধা! এটা কি মগের মুল্লুক, দেশে আইন নেই, পুলিশ নেই?' ভাঙা দরজা দিয়ে অফিসের তচনছ অবস্থা দেখে আগুন ধরে গেল সুরাইয়ার গায়ে। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপছে শরীরটা।

টেবিল থেকে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল ব্যাং চি। বলল, 'নিন, পুলিশ ডাকুন, বলুন আমরা তুং শান-এর লোক। দেখুন কতখানি সাহায্যে আসে তারা।'

'এ-সব নাটক আমার অনেক দেখা আছে,' বলে ছোঁ দিয়ে রিসিভারটা নিয়ে পরিচিত এক পুলিশ অফিসারকে ফোন করল সুরাইয়া।

কিন্তু তুং শানের নাম শুনে উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়ল। অজুহাত দেখিয়ে বলল, অত্যন্ত ব্যস্ত আছে এই মুহূর্তে, জরুরি কাজটা সেরেই আসতে চেষ্টা করবে।

সুরাইয়ার হতাশ ও বিহ্বল চেহারা দেখে মুচকি হেসে চলে গেল চার বডিবিল্ডার। যাবার সময় বলে যেতে ভুলল না, 'ঠিক সাতদিন পর। আপনাকে আমরা নিতে আসছি।'

সদর্পে চলে গেল মার্সিডিজ।

ভয় পেল সুরাইয়া। এক মিনিট গভীর চিন্তায় ডুবে থাকল ও। তারপর তালাভাঙা অফিস রুমের দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে রানা এজেন্সির কুয়ালালামপুর শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করল।

রানা এজেন্সির কুয়ালালামপুর শাখার প্রধান তারানা তাহসিন ধৈর্য ধরে শুনল সব। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের সিকিউরিটি ক্যামেরায় এই তুং শানের ফটো ওঠেনি?'

খোঁজ নিয়ে সুরাইয়া জানাল, 'উঠেছে।'

'তার এক কপি ফটো কাউকে দিয়ে আমাদের অফিসে পাঠিয়ে দিন।'

দশ মিনিটের মধ্যে ফটো পাঠাবার ব্যবস্থা করল সুরাইয়া।

আরও প্রায় এক ঘণ্টা পর ফোন করল তারানা। বলল, 'ওই লোক ভাল নয়। আপনার তো না গিয়ে উপায় নেই।'

'না গিয়ে উপায় নেই মানে? জোর করেই নিয়ে যাবে নাকি?' ক্ষোভ প্রকাশ পেল সুরাইয়ার কণ্ঠে।

'ব্যাপারটা অনেকটা সেরকমই,' ম্লান সুরে বলল তারানা। 'কারণ শুনতে পাচ্ছি এই তুং শান যেখানে যায় প্রথমেই সেখানকার পুলিশের বড় কয়েকজন কর্মকর্তাকে নানা কৌশলে হাত করে ফেলে।'

'সেক্ষেত্রে বলে দিন এখন কী করব আমি,' বলল সুরাইয়া। 'আর তা না হলে প্রোটেকশন দিন আমাকে।'

'হাতে তো সময় আছে, ধৈর্য ধরুন,' ওকে বলল তারানা। 'আমরা আরও খোঁজ-খবর নিয়ে দেখি। আমাদের চিফ মাসুদ রানার সঙ্গেও যোগাযোগ করছি।'

তিন

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টার, ঢাকা। মেজর জেনারেল রাহাত খানের চেম্বার।

বস্-এর জরুরি ডাক পেয়ে দুরু দুরু বুকে এই মাত্র ভিতরে ঢুকেছে বিসিআই-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্ট মাসুদ রানা।

আবার হয়তো নতুন একটা অ্যাসাইনমেন্ট পাবে, এই আশায় উন্মুখ হয়ে আছে মনটা।

পাইপে আগুন ধরাচ্ছেন বিসিআই চিফ, চোখমুখ কেমন যেন থমথম করছে। চোরা চোখে সেদিকে একবার তাকাল রানা, অনুভব করল ওর হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে।

'দেখো তো মনে আছে কি না। মাস চারেক আগের একটা ব্যাপার। বঙ্গোপসাগরকে নিয়ে?' প্রশ্ন করলেন রাহাত খান, প্রিয় এজেন্টের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

এরকম একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না রানা; ভাবল, বস্ কি আমাকে বঙ্গোপসাগরে ডুব দিতে পাঠাবেন? বলল, 'জী, সার। বঙ্গোপসাগরে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর তৎপরতা নিয়ে প্রতিদিনই কিছু না কিছু লেখা হচ্ছিল তখন।' কী লেখা হচ্ছে স্মরণ করবার চেষ্টা করল ও।

বাংলাদেশ ও মায়ানমারের জলসীমা সহ গোটা বঙ্গোপসাগরে ডজন ডজন ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ টহল দিচ্ছে। আকাশে অনবরত চক্কর দিচ্ছে জেট ফাইটারের ঝাঁক। সেই সঙ্গে চলছে ডিপ সি ডাইভিং-এর আয়োজন।

তারপর জানা গেল প্রচণ্ড সুনামির কবলে পড়ে একটা ভারতীয় সাবমেরিন নিখোঁজ হয়ে গেছে। ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ধারণা, সাবমেরিনটা বাংলাদেশ কিংবা মায়ানমার উপকূল রেখার খুব কাছাকাছি কোথাও ডুবেছে।

দিন কয়েক দেরিতে হলেও অবশেষে ভারত স্বীকার করল, ওটা একটা ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন, নাম অর্জুন, এবং তাতে আটটা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র আছে, প্রতিটিতে একটা করে পারমাণবিক বোমা ফিট করা।

খবরটা শুধু উপমহাদেশে নয়, গোটা দুনিয়ায় হইচই ফেলে দিল। সবাই জানে নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সহ দূর-পাল্লার মিসাইল সাংঘাতিক ব্যাপার। পৃথিবীর কোনও দেশই তার

আওতার বাইরে নয়। কাজেই নড়েচড়ে বসল সব কটা সুপারপাওয়ার।

তারপর যেন কী হলো? ও, হ্যাঁ, মনে পড়ছে।

একটা ভারতীয় সাবমেরিন কী কারণে প্রতিবেশী বাংলাদেশ বা মায়ানমারের জলসীমায় বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়ল, ঘটনার তিন-চারদিন পর তারও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এবং সেই সঙ্গে দেশ দুটোর উপকূলে তল্লাশি চালাবার অনুমতি প্রার্থনা করেছে।

অর্জুনের রেডিও রুম থেকে কোড করা সর্বশেষ স্যাটেলাইট মেসেজটা ভিশাখাপতনম বেসে ঠিকই পৌঁছেছিল। অর্জুন নিখোঁজ হওয়ার পর সেই মেসেজ আর রিখটার স্কেলের রিডিং সামনে নিয়ে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর বিশেষজ্ঞরা হিসাব কষতে বসেছেন।

জানা গেছে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল থেকে যথেষ্ট দূরে থাকলেও, মেসেজটা পাঠানোর সময় নাড়াচাড়া খেয়ে হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে ওঠা একটা আগ্নেয়গিরির ঠিক মাথার উপর ছিল অর্জুন।

ভূমিকম্পের ফলে তৈরি সুনামির গতিপথ অনুসরণ করেছে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর তদন্ত টিম। ইমার্জেন্সি মেসেজ পাঠানোর সময় ও স্থান মাথায় রেখে হিসাব কষে বের করা হয়েছে মায়ানমার ও বাংলাদেশ উপকূল রেখার পঞ্চাশ কিলোমিটারের মধ্যে কোথাও আসবার পর ডুবে গেছে ওদের সাবমেরিন। ক্রু আর অফিসার মিলিয়ে একশ' বিশজন ছিল ওটায়। ওদেরকে জীবিত উদ্ধার করবার জন্য মরিয়া হয়ে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে তারা।

সৎ-প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব দেখিয়ে বাংলাদেশ ও মায়ানমার ভারতীয় নৌ-বাহিনীকে তল্লাশি চালাবার অনুমতি তো দিয়েছেই, সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করবার প্রস্তাবও করেছে।

তবে সবার আগে মার্কিন সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে

দেওয়ায় সেটাই গ্রহণ করেছে ইন্ডিয়ান নেভি, কারণ ওদের কাছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আছে, আছে এ-ধরনের অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজের অভিজ্ঞতা।

ভারত-মার্কিন যৌথ তদন্ত টিম বঙ্গোপসাগরের এমন কোনও এলাকা নেই যেখানে সার্চ করেনি। কিন্তু বৃথাই—কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি অর্জুনকে। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম ব্যর্থ হওয়ার পর মার্কিন উদ্ধারকারী দলের হতাশ লিডার বলল, 'আমাদের সন্দেহ হচ্ছে এদিকে আদৌ কোনও নিউক্লিয়ার সাবমেরিন নিখোঁজ হয়েছিল কি না।'

সাবমেরিন অর্জুনকে তো পাওয়া গেলই না, মিসাইলগুলোর ওঅরহেড থেকে যে রেডিয়েশন বিকিরণের কথা তারও কোনও লক্ষণ দেখা গেল না কোথাও।

দু'মাস পর তদন্ত ও তল্লাশি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সাগরের আরও একটা অমীমাংসিত রহস্য হিসাবে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে নিয়েছে ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন অর্জুন ও তার দুর্ভাগা যাত্রীরা।

'সার, আমার যতদূর মনে পড়ছে,' সবশেষে বলল রানা, 'তদন্ত বন্ধ হয়েছে, তা-ও তো দু'মাস পার হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, তোমার হিসেব ঠিক আছে,' বললেন বিসিআই চিফ, কাঁচা-পাকা ঘন ভ্রূ জোড়া কুঁচকে আছে। 'মাঝখানের এই সময়টায় বেশ কিছু অস্বাভাবিক তথ্য জানতে পেরেছি আমরা।'

নড়েচড়ে বসল রানা, ব্রিফিং জমে উঠছে।

পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দিলেন রাহাত খান।

আশ্চর্য খবরটা হলো, বাংলাদেশের সন্দেহভাজন কট্টর, জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠনগুলোর মধ্যে ব্যাপক ব্যস্ততা ও কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। চুপিচুপি দেশ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। চারদিকে লোক পাঠানো হলো, দেখো তো কোথায় যায়।

জানা গেল, কিছুদিন এদিক-ওদিক ঘুরে লোকের চোখে

ধুলো দেয়ার চেষ্টা করে প্রথম সুযোগেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র মায়ানমারের আরাকান এলাকায় চলে যাচ্ছে তারা।

তারপর খবর এল: না, সবাই আরাকানে যাচ্ছে না; যাচ্ছে কেবল নেতৃস্থানীয় জঙ্গিরা। অন্যান্য সাধারণ জঙ্গিরা তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে ঢাকা শহর ছেড়ে নিজ নিজ গ্রামের দিকে সরে যাচ্ছে।

অথচ কারও কোনও ধারণা নেই কী কারণে এভাবে তারা দেশ বা শহর ত্যাগ করছে।

আরও একটা ব্যাপার হলো, তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে না ভয় পেয়ে পালাচ্ছে, বরং যে-কোনও কারণেই হোক খুবই চঞ্চল ও উৎফুল্ল তারা, যেন এতদিনে তাদের কী একটা গোপন আশা পূরণ হতে চলেছে!

এই সময় রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে আত্মঘাতী জঙ্গিদের একটা তথ্য লিক হয়ে গেল। মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশের শাসক জিহাদের নামে ইসলামী জঙ্গিবাদকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য গোপনে ফান্ড সরবরাহ করে, এটা একটা ওপেন সিক্রেট। তারা নাকি আল-কায়দার মাধ্যমে সম্প্রতি আরাকানে জমা হওয়া বাংলাদেশী জঙ্গিদেরকে বিপুল পরিমাণ মার্কিন ডলার দিচ্ছে। সন্দেহ নেই, এই টাকা দিয়ে জঙ্গিরা ওখানে বসে শুধু বাংলাদেশই নয়, গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে মারাত্মক কিছু একটা করতে চলেছে।

তথ্যটা যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণও পাওয়া গেল।

কৌতূহলী হলো রানা: কী প্রমাণ, স্যর?

রাহাত খান ব্যাখ্যা করলেন। মাছ ধরতে গিয়ে মাঝসাগরে উভয়সংকটে পড়ে গেছে বাংলাদেশ আর মায়ানমারের জেলেরা। কারণ ওদিকে মাছ ধরতে গেলেই ধাওয়া করে ভাগিয়ে দেয়া হচ্ছে ওদেরকে। ভাগিয়ে দিচ্ছে দু'দিক থেকে দু'দল মানুষ।

বাংলাদেশ ও মায়ানমার উপকূলের কাছাকাছি খোলা

সাগরে, মধ্যপ্রাচ্যের একটা দেশের জাহাজ অনুমতি ছাড়াই নোঙর ফেলেছে। সেই জাহাজ থেকে ডলার ভর্তি বস্তা নামানো হচ্ছে ট্রলারে। কয়েকটা বস্তার মুখ খুলে যাওয়ায় জেলেরা পরিষ্কার দেখেছে ওগুলোয় রাশি রাশি ডলারের বান্ডিল আছে। ওই একবারই জাহাজটার কাছাকাছি যেতে পেরেছিল ওরা। তারপর দেখা মাত্র ধাওয়া করছে ডলারবাহী ট্রলারের লোকজন, ফাঁকা গুলি করে ভয় দেখাচ্ছে।

ধাওয়া খেয়ে আরাকান উপকূলের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে জেলেরা, কিন্তু সেখানে আবার আরেক বিপদ। খুব নাকি কুখ্যাত একজন তাইওয়ানিজ জলদস্যু আস্তানা গেড়েছে ওদিকে কোথাও, ওর লোকজন মাছ ধরার ট্রলার দেখলেই মারমুখো হয়ে তেড়ে আসছে। বিশেষ করে ক্যাকটাস দ্বীপের ধারেকাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না কাউকে। অসহায় জেলেরা জানতে চাইছে, আমরা তা হলে এখন কোথায় মাছ ধরব?

আরাকানের জঙ্গলঢাকা পাহাড়ি এলাকায় চলছে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ। সেখানকার অস্থায়ী ক্যাম্পগুলোয় সপরিবারে বসবাস করছে বাংলাদেশ থেকে আসা ওদের লিডাররাও। আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনদের গ্রামের বাড়িতে রেখে প্রায় প্রতিদিনই দু-একশ' করে জঙ্গি জড়ো হচ্ছে ওখানে।

রানা জানতে চাইল, 'এদের পরিচয় কী, সার? জেএমবি?'

মাথা নাড়লেন বিসিআই চিফ, তারপর ব্যাখ্যা করলেন। আমাদের আরাকানী কন্টাক্টদের পাঠানো খবরে জানা গেছে, জেএমবি ছাড়াও এদেশের সাতটা জঙ্গি সংগঠন এক হয়েছে ওখানে। নেতৃত্ব দিচ্ছে সালাউদ্দিন শাহ কুতুব নামে ধুরন্ধর এক প্রভাবশালী জঙ্গি মাওলানা।

'আমার কাজটা কী হবে, সার?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কোত্থেকে শুরু করব আমি?'

'ধর্মান্ধ জঙ্গিরা দুনিয়ার নিকৃষ্টতম ক্রিমিনাল। দেশের যথেষ্ট

ক্ষতি করেছে ওরা; আরও ক্ষতি করার আগেই তাদেরকে আমরা বাধা দেব,' বললেন রাহাত খান। 'শুধু আরাকানে কেন, প্রয়োজন হলে নরকে গিয়েও ওদেরকে শায়েস্তা করে আসতে হবে।'

বসের এই কথা থেকেই যা বোঝার বুঝে নিল রানা। 'কোনও ক্লু আছে, সার?' জানতে চাইল ও।

একদৃষ্টে তিন সেকেন্ড তাকিয়ে থাকবার পর বিসিআই চিফ তাঁর প্রিয় এজেন্টকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন। 'সুরাইয়া জেবিন নামটা আগে শুনেছ কখনও?'

মাথা নাড়ল রানা। 'জী-না, সার।'

'সুরাইয়া মালয়েশিয়ান মেয়ে,' বললেন বিসিআই চিফ, ফোল্ডার থেকে সুরাইয়া আর তুং শানের ফটো বের করে ঠেলে দিলেন রানার দিকে। 'হটস্পট ফ্যাশন হাউসের মালিক। ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে বেশ নাম করেছে।'

সুরাইয়ার ফটোর উপর চোখ বুলাল রানা। ভাবল, ওর আসল পরিচয় কী? এই অ্যাসাইনমেন্টের সঙ্গেই বা কী সম্পর্ক মেয়েটির?

আর সুদর্শন এই চিনা তরুণ? ফটোর উল্টোপিঠটাও দেখল রানা, লেখা রয়েছে—তুং শান।

যেন রানার মনের কথা বুঝতে পেরেই বিসিআই চিফ বললেন, 'সুরাইয়া জেবিন আমাদের একজন ইনঅ্যাকটিভ এজেন্ট—স্লিপার। পাঁচদিন আগে তুং শান নামে ওই তাইওয়ানিজ ট্যুরিস্টের বডিগার্ডরা হুমকি দিয়ে বলেছে সাতদিনের মধ্যে ওকে নিতে আসবে তারা।'

'নিতে আসবে মানে, সার?' নিজের অজান্তেই প্রশ্নটা রানার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। 'জোর করে নিয়ে যাবে কোথাও?'

'হ্যাঁ, জোর করেই নিয়ে যেতে চাইছে।' পাঁচদিন আগে সুরাইয়ার দোকানে কী ঘটেছে, এবং পুলিশের প্রতিক্রিয়া কেমন

ছিল, সে-সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলেন বিসিআই চিফ।

'আসলে কে এই লোক, সার?' জানতে চাইল রানা, তুং শানের মুখোমুখি হওয়ার প্রবল আগ্রহ জাগছে ওর মনে।

'তার সম্পর্কে এখনও খুব কমই জানি আমরা,' বললেন বস্। 'অঢেল টাকা, ক্ষমতা আর সয়-সম্পত্তির মালিক, দেখাই যাচ্ছে। সুরাইয়াকে প্রেম নিবেদনের সময় বলেছে, তার সমস্ত বিত্ত-বৈভব এসেছে অবৈধ পথে। পুঁজির উৎস সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। তার পরিচয়, পেশা, কীর্তিকলাপ ইত্যাদি সবই তোমাকে জেনে নিতে হবে।'

খানিকটা অসহায় বোধ করছে রানা। বুঝতে পারছে না ওকে সুরাইয়ার পিছু নিতে হবে কেন! নিখোঁজ ভারতীয় সাবমেরিন কিংবা আরাকান রাজ্যে জড়ো হওয়া বাংলাদেশী জঙ্গিদের সঙ্গে এই ব্যাপারটার সম্পর্ক কোথায়। ওকে তুং শান সম্পর্কেই বা সব কথা জানতে হবে কেন।

'আমরা কি জানতে পেরেছি তুং শানের লোকেরা কোথায় নিয়ে যাবে সুরাইয়াকে?' বস্‌কে জিজ্ঞেস করল ও।

'সেটা জানার জন্যেই সুরাইয়ার পিছু নেবে তুমি,' বললেন রাহাত খান। 'কুয়ালালামপুর থেকে ইয়াঙ্গন ফ্লাইটের পাঁচটা টিকিট কাটা হয়েছে। ইয়াঙ্গনে পৌঁছে গোল্ডেন এক্সপ্রেস ট্রেনে চড়বে ওরা। ট্রেনের টিকিটও রিজার্ভ করা হয়ে গেছে।' একটু থেমে আবার বললেন বস্। 'তোমারও, রানা।'

'আমি যাচ্ছি সুরাইয়া জানে, সার?'

'ওকে বলা হয়েছে রানা এজেন্সির কেউ একজন ওই ট্রেনে থাকতেও পারে, প্রয়োজন হলে নিজের পরিচয় দেবে সে। কোডটা জেনে রাখো—ফাইবারগ্লাস।'

একটা কথা ভেবে রানা চিন্তিত। 'সার, ইনঅ্যাকটিভ এজেন্টদের আসলে খুব বেশি বিশ্বাস করা কি উচিত? মাসের পর মাস, বছরের পর বছর হাতে কোনও কাজ না থাকায়

প্রতিপক্ষের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে বসে ওরা সহজেই। আর একবার ফাঁদে পড়লে তা থেকে আর বেরুতে পারে না।'

'হ্যাঁ, কথাটায় যুক্তি আছে,' বললেন রাহাত খান। 'আমাদের এ-ও জানা নেই, এই মেয়েটি ডাবল এজেন্ট কি না। হতেই পারে, সুরাইয়াকে হয়তো টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন তিনি। 'সেক্ষেত্রে তোমাকে আমি খুব বড় একটা বিপদের মুখেই ঠেলে দিচ্ছি, কারণ তোমার মত সুরাইয়াকেও ব্রিফ করা হয়েছে, অর্থাৎ এই অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে সবই তার জানা। কাজেই, চোখ-কান খোলা রেখে কাজ করতে হবে তোমাকে।'

'সার,' বস্ থামতেই আরেক প্রসঙ্গ তুলল রানা, অস্পষ্টতা দূর করতে চাইছে। 'আমার অ্যাসাইনমেন্টের সঙ্গে তুং শানের সম্পর্কটা ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না।'

'দশ হাজার কোটি টাকা রিসিভ করেছে সালাউদ্দিন শাহ কুতুব, মনে আছে? তার মধ্যে থেকে পাঁচ হাজার কোটি টাকা জমা পড়েছে সিঙ্গাপুরের একটা বিশেষ ব্যাংকে—তুং শানের অ্যাকাউন্টে।'

'আচ্ছা!' আঁতকে উঠল রানা। 'তার মানে তুং শানের কাছ থেকে কিছু একটা কিনছে জঙ্গিরা।'

'তোমাকে জানতে হবে কী সেটা,' বললেন রাহাত খান।

'ইয়েস, সার!' রানা শুধু উত্তেজিত নয়, উৎসাহে টগবগ করে ফুটছে এখন ওর রক্ত; কী করতে হবে তার একটা পরিষ্কার ধারণা পেয়ে গেছে ও।

'প্লেন আর ট্রেনের টিকিট, অন্যান্য কাগজ-পত্র, সব তুমি ইলোরার কাছে পাবে,' বললেন রাহাত খান। 'ওখানে তুমি যাচ্ছ আরবের একজন আমীর হিসাবে—কয়েকটা তেলখনির মালিক, প্লেবয় টাইপ। তবে আরও কাগজ-পত্র থাকবে, প্রয়োজনে নিজের পরিচয় বদলাতে পারবে তুমি। কাল ফ্লাইট ধরার আগে

মেকআপ সেকশনকে আধঘণ্টা সময় দিয়ো। রাতে শোয়ার আগে তেলখনির ওপর হোম-ওঅর্কটাও সেরে রেখো।' দেয়ালঘড়ির উপর একবার চোখ বুলালেন বস্। 'ঠিক আছে, আমার কথা শেষ; তুমি কিছু জিজ্ঞেস করবে?' অর্থাৎ, ভাগো দেখি এখন!

•

পরদিন সকালে বিসিআই হেডকোয়ার্টারের মেকআপ রুমে ঢুকল রানা। মেকআপ এক্সপার্টরা জানাল, সব সময় সুট আর টাই-ই পরবে ও, তবে হেড-ড্রেস আর সাদা আলখেল্লা সঙ্গে রাখতে হবে। আরব শেখদের মত চিবুক ও ঠোঁট ঘিরে অমিতাভ বচ্চন টাইপ দাড়ি-গোঁফ থাকবে সারাক্ষণ।

ডাই, ফলস প্যাড ইত্যাদি ছাড়াই সূক্ষ্মভাবে বদলে দেওয়া হলো ওর চেহারা। কান দুটো মাথায় লেগে থাকল একটু বাঁকা হয়ে, আরেকটু লম্বাটে হলো নাক, চেহারা থেকে প্রাণবন্ত ভাব কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হলো।

মাথার চুল নতুন ভঙ্গিতে আঁচড়াতে হবে। সুটটা ইচ্ছে করেই ঢোলা করা হয়েছে, ওর বলিষ্ঠ কাঠামো যতটা সম্ভব গোপন রাখবার জন্য। মেকআপ আর্টিস্টদের একজন কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করতে বলল, কিন্তু রাজি হলো না রানা। কনট্যাক্ট লেন্স ওর জন্য অস্বস্তিকর। জানাল, প্রয়োজনের সময় চোখ লুকাবার কৌশল জানা আছে ওর।

কাগজ-পত্রে বলা হয়েছে ওর নাম শেখ মোহাম্মদ আমিরুল ফরহাদ ইবনে আহাদ।

মেকআপ রুম থেকে যখন বেরিয়ে এল রানা, এমনকী ওর দেহভঙ্গি আর হাঁটার ধরন পর্যন্ত অন্য রকম হয়ে গেছে। হাবভাব আর কথাবার্তায় উদ্যোগী ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট।

ওর মানিব্যাগ সার্চ করলে লায়নস্ আর রোটারি ক্লাবের

মেম্বারশিপ কার্ড পাওয়া যাবে। প্লেন কিংবা ট্রেনে কারও সঙ্গে পরিচয় হলে মানিব্যাগ খুলে তাকে স্ত্রী ও সন্তানের ফটো দেখাতে পারবে শেখ আমিরুল ফরহাদ ইবনে আহাদ।

চার

সেদিনই, শেষ বিকেল। ইয়াঙ্গন এয়ারপোর্ট, অ্যারাইভাল লাউঞ্জ।

সালোয়ার-কামিজ-ওড়না পরা রানা এজেন্সির এক এজেন্ট ভিড়ের ভিতর থেকে শেখ আমিরুল ফরহাদ ইবনে আহাদকে খুঁজে নিল। কোনও ইঙ্গিত বা বাক্যবিনিময় হলো না।

ইমিগ্রেশন পেরিয়ে এসে আউটার লাউঞ্জে একটা সোফায় বসল রানা, মেয়েটিও এসে বসল ওর পাশে। খানিক পর নিঃশব্দে উঠে চলে যাওয়ার সময় মেয়েটি নিজেরটা নয়, রানার ব্রিফকেস নিয়ে গেল। দুটো ব্রিফকেস একই রকম দেখতে। পাঁচ মিনিট পর রানাও সোফা ছাড়ল, রাজধানীতে ঢুকছে মেয়েটির রেখে যাওয়া ব্রিফকেস নিয়ে। সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে বদল হয়ে গেল ব্রিফকেস দুটো।

টার্মিনাল ভবনে থেকে গোল্ডেন এক্সপ্রেস ট্রেন ধরবার জন্য একটা ট্যাক্সি নিয়ে সরাসরি রেলওয়ে স্টেশনে চলে এল রানা। আসবার পথে এনভেলাপ খুলে দেখে নিয়েছে ট্রেনের টিকিটটা। ইতিমধ্যে ব্যক্তিত্বে ও বৈশিষ্ট্যে পুরোপুরি একজন সৌদি নাগরিক হয়ে উঠেছে ও।

ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক সময়েই স্টেশনে পৌঁছেছে রানা। আর একটু পরেই ওর ট্রেন ছাড়বে। পোর্টার ওকে একটা ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেন্টে এনে তুলল। অঢেল পেট্রোডলারের মালিক হলে যা করা উচিত তাই করল রানা, পোর্টারকে বিদায় করল একশ' মার্কিন ডলার বকশিশ দিয়ে।

শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত, অত্যাধুনিক ট্রেন। বুফে কার সহ আরাম-আয়েশের সব রকম আয়োজনই আছে। গোল্ডেন এক্সপ্রেসের ভাড়া অন্য যে-কোনও সাধারণ ট্রেনের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি, এটা বিশেষ করে ধনী পর্যটকদের জন্য চালু করা হয়েছে।

একটা ম্যাপ খুলে ট্রেন জার্নির রুটটা দেখে নিচ্ছে রানা। প্রায় পাঁচ ঘণ্টার জার্নি, ইয়াঙ্গন থেকে প্রোম হয়ে সেই সিতওয়ে পর্যন্ত যাবে।

ট্রেন থামবে ইনসেইন, হমাউবি, টাক্কি, থোনজে, থারাওয়াদ্দি, মিনহলা, জিগম, প্রোম এবং সবশেষে সিতওয়েতে।

রানার টিকিট সিতওয়ে পর্যন্ত। তবে প্রোমে নেমে ভান করবে রক্ত-চলাচল ঠিক রাখার জন্য একটু হাঁটাহাঁটি করছে, তারপর এক ফাঁকে চুপচাপ গায়েব হয়ে যাবে।

ওর এজেন্সি খবর নিয়ে জেনেছে সুরাইয়ার জন্য প্রোমের টিকিট কাটা হয়েছে। কাজেই ওখান থেকেই মেয়েটার পিছু নিতে পারবে বলে আশা করছে রানা। সুরাইয়া যদি বিসিআই চিফের নির্দেশ অমান্য না করে থাকে, এই মুহূর্তে গোল্ডেন এক্সপ্রেসের কোনও কমপার্টমেন্টে উঠে বসে আছে।

প্রোমে ট্যুরিস্টদের জন্য ট্যাক্সি ও হেলিকপ্টার সার্ভিস আছে, খুব সহজেই ওখান থেকে মায়ানমারের যে-কোনও শহরে পৌঁছানো যায়।

রানার ধারণা, সৈকত আছে এমন কোনও শহরে নিয়ে যাওয়া হতে পারে সুরাইয়াকে। সেক্ষেত্রে প্রথমেই সিতওয়ের

নাম চলে আসে। দেখা যাক, সময় হলেই জানা যাবে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে তীক্ষ্ণসুরে হুইসেল বেজে উঠল। শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা দেখবার জন্য ঝুঁকল রানা, কাঁচে লেগে একটু চ্যাপ্টা হলো ওর নাক। এত বয়স হয়েছে, তারপরও ট্রেন জার্নি ওর কাছে এখনও সাংঘাতিক রোমাঞ্চকর লাগে। প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তটা দারুণ থ্রিল এনে দেয় ওর মনে।

আবার বেজে উঠল গার্ডের হুইসেল, এবার সুরটার মধ্যে একটা চূড়ান্ত ভাব আছে। প্ল্যাটফর্ম বরাবর স্লিপিং-কারগুলোর দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক এই সময় মেয়েটিকে দেখতে পেল রানা।

চঞ্চলা হরিণীর মত দৌড়াচ্ছে সুরাইয়া, ওর ফরসা সুগঠিত পা ছোট স্কার্টের নীচে উজ্জ্বল ঝলকের মত লাগছে। গায়ে অত্যন্ত দামি একটা মিঙ্ক কোট, এক হাত দিয়ে মাথার চুলের সঙ্গে একটা হ্যাট চেপে ধরে আছে। অপর হাতে রয়েছে ছোট আকৃতির হাতব্যাগ। ওর সঙ্গে ছুটছে একজন বার্মিজ পোর্টারও, তার দু'হাতে দুটো আর বগলে একটা লেদার ব্যাগ।

সরাসরি রানার জানালার নীচ দিয়ে যাচ্ছে সুরাইয়া, মুখ তুলে তাকাল একবার। সিকি সেকেন্ড বা তারও কম সময়ের জন্য চোখাচোখি হলো দুজনের।

সুরাইয়ার চোখ ঠিক যেন একজোড়া কালো আঙুর, ডিম্বাকৃতি মুখে অসম্ভব সুন্দর মানিয়েছে। ফটোয় যেটা ফোটেনি, মেয়েটার চেহারায় আশ্চর্য একটা দৃঢ়তা আছে। নাকি জিদ?

অদৃশ্য হয়ে গেল সুরাইয়া। ঘটাং করে ট্রেনের শেষ দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো। স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে গোল্ডেন এক্সপ্রেস—চকমকে একটা ড্রাগন, টেনে নিয়ে চলেছে দৈত্যাকার ডিজেল ইঞ্জিন। প্রথম যাত্রাবিরতি, ইনসেইন।

নরম কুশনে হেলান দিল রানা। যাক, মেয়েটা তা হলে ট্রেন ধরতে পেরেছে। কিন্তু দেখে কি মনে হলো জোর করে কোথাও

নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে? না তো!

তা হলে কী ব্যাপার? তুং শানের পেশিশক্তি অনুপস্থিত কেন?

তারপর রানা ভাবল, টিকিট যখন পাঁচটা কাটা হয়েছে, তারাও নিশ্চয় আছে ট্রেনে, তবে লোকচক্ষুর আড়ালে।

লম্বা ট্রেনটা জয়েন্টের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় বিশেষ একটা ছন্দে অনবরত ঘটাং ঘটাং করছে, ইয়াঙ্গন শহরতলীকে পিছনে ফেলে আসবার পর স্পিডও বাড়ছে দ্রুত।

এর আগেও গোল্ডেন এক্সপ্রেস ট্রেনে চড়েছে রানা। লক্ষ করল রেললাইনের ধার থেকে নোংরা বস্তিগুলো গায়েব হয়ে গেছে, তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি সুদৃশ্য ভবন।

আরেকটু সামনে পাকা ও পরিষ্কার বাজার পড়ল। জুতো-জামা পরা ক্রেতা আর বিক্রেতা গিজগিজ করছে। মায়ানমারে পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই বোধহয় সব কাজে এগিয়ে। অন্তত দোকানদারি করছে নব্বুইভাগ মেয়েরাই। আর কী তাদের বাহারি পোশাক আর অলঙ্কার—সারং আর ব্লাউজে রঙবেরঙের জরি দিয়ে বিচিত্র সব নকশা করা হয়েছে, কানে দু'ইঞ্চি লম্বা দুল, গলায় পুঁতির মালা, হাতে রূপোর বালা।

বার্মিজ মেয়েরা ছোটখাট, হাসিখুশি; শোনা যায় ওরা নাকি খুব স্বামীভক্ত। মায়ানমারে এলে একটা ব্যাপার কোথাও দেখতে পায় না রানা, আর দেখতে না পেয়ে খুশিই হয় ও; সেটা হলো, সারাক্ষণ নিজের বুক ঢাকতে ব্যস্ত থাকে না বার্মিজ তরুণীরা। যার যা আছে তা-ই নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় এরা, বাঙালি মেয়েদের মত কুঁজো হয়ে বিকৃত ভঙ্গিতে দাঁড়ায় না।

এই বিচ্ছিরি অভ্যাসটা ফিগারের বারোটা তো বাজায়ই, মানুষ হিসাবেও একটা মেয়েকে ছোট করে দেয়। যেন নিজেই নিজেকে অপমান করে সে যে-জিনিসটা আছে, সেটাকে নেই বলে প্রমাণ করতে গিয়ে।

কাছে ও দূরের বাড়ি-ঘরে এক এক করে সন্ধ্যার আলো

জ্বলে উঠছে। মন্দিরে মন্দিরে বেজে উঠল কাঁসর ঘণ্টা। রাস্তায় রাস্তায় সাদা আলো ছড়িয়ে দিল ল্যাইটপোস্টগুলো। শীতের শুরু, তাই ঝপ্ করে অন্ধকার নেমে আসছে।

ব্রিফকেস খোলার আগে কমপার্টমেন্টের দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ওকে এটা দেওয়া হয়েছে বিসিআই টেকনিকাল ডিপার্টমেন্ট থেকে, রানা এজেন্সির ইয়াঙ্গন শাখার মাধ্যমে। এটা-সেটা আরও অনেক কিছুর সঙ্গে কৌশলে লুকিয়ে রাখা ছোট্ট একটা গোপন জায়গা আছে ভিতরে, সেখানে ভরা আছে ওর প্রিয় অস্ত্রগুলোও।

পিস্তল আর ছুরি। সেইসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে অ্যামিউনিশন।

পিস্তলের মেকানিজম আর ছুরির ধার, দুটোই পরীক্ষা করল রানা। তবে তাড়াতাড়ি আবার ফলস বটমে লুকিয়ে রাখল ওগুলো। মায়ানমারে সামরিক শাসন চলছে, অস্ত্র সহ ধরা পড়লে মহা ভোগান্তি আছে কপালে।

তা ছাড়া, প্রোমে পৌঁছাবার আগে এগুলো দরকার হবে বলেও মনে হচ্ছে না ওর।

চারদিক অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় জানালার কাঁচে নিজের প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছে রানা। নিজেকে লক্ষ্য করে একটা চোখ টিপল, তারপর ভাবল, একটানা পাঁচ ঘণ্টা সময় কাটানোর জন্য সবচেয়ে উপভোগ্য হলো সুন্দরী কোনও মেয়ের সঙ্গ।

সেরকম মেয়ে গোল্ডেন এক্সপ্রেসে আছেও। তা ছাড়া, ওর চার পাহারাদারকেও আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

কাজেই ঘুরেফিরে একটু খুঁজে দেখবে নাকি মেয়েটিকে?

অ্যাই, ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ো না! হয়তো দেখা যাবে শেখ আমিরুল ফরহাদ ইবনে আহাদের দিকে সুরাইয়া জেবিন একটি বার ফিরেও তাকাচ্ছে না।

করিডর থেকে টুং-টাং ঘণ্টি বাজার মৃদু আওয়াজ ভেসে এল। তারপর শোনা গেল বার্মিজ ও ইংরেজি ভাষায় ঘোষণা:

'দশ মিনিটের মধ্যে প্রথম সার্ভিস।'

রানার খিদে পেয়েছে, তবে সিদ্ধান্ত নিল দ্বিতীয় সার্ভিসের জন্য অপেক্ষা করবে। শেষ মুহূর্তে পৌঁছানোয় ট্রেন ধরবার জন্য ছুটতে হয়েছে মেয়েটাকে, প্রথম ঘণ্টি শুনে খেতে যাবে বলে মনে হয় না। মেয়েদের প্রতিমুহূর্তের উদ্বেগ হলো, কেমন দেখাচ্ছে নিজেকে। আর এই মেয়েটা তো বিশ্বসুন্দরী, কোথাও বেরোবার আগে অন্তত আধ ঘণ্টা আয়নার সামনে বসবে না?

সুরাইয়ার জন্য অপেক্ষা করবে রানা। ওকে একবার উজ্জ্বল আলোয় কাছ থেকে দেখতে চায়।

এক ঘণ্টা পর দ্বিতীয়বার টুং-টাং শুনে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। দোল খাচ্ছে লম্বা ট্রেন। দুই কমপার্টমেন্টের মাঝখানের ভেস্টিবিউল পার হওয়ার সময় ভারসাম্য রক্ষা করতে অবশ্য কোনও অসুবিধে হলো না।

পায়ের নীচে চকচকে লাইনের উপর দিয়ে প্রবলবেগে গড়াবার সময় প্রকাণ্ড চাকাগুলো অনবরত আওয়াজ করছে—পায়ে পড়ি যেতে দাও, পায়ে পড়ি যেতে দাও, যেতে দাও যেতে দাও, পায়ে পড়ি...

শুনলে কে না উপলব্ধি করবে, পালাই-পালাই এই রবের মধ্যে কী অমোঘ সত্য লুকিয়ে আছে। সবাইকে সবার যেতে দিতেই হবে!

আর মাত্র একটা ভেস্টিবিউল পেরুলে বুফে কার, এই সময় অস্বস্তির প্রথম খোঁচাটা অনুভব করল রানা।

ভেস্টিবিউলে ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিরাট এক চিনা কুস্তিগির। কাঁচ ঢাকা ছোট জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে দৈত্যটা, হাতের সিগারেট থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। গায়ে বাদামী রঙের ঢোলা ট্রেঞ্চ কোট, মাথায় অ্যাশ কালারের উলের টুপি।

রানার মনের ভিতর অ্যালার্ম অন করে দিয়েছে লোকটার

অসম্ভব চওড়া কাঁধ দুটো। এমনিতে ব্যাপারটার মধ্যে বিপদের কোনও আলামত নেই। ট্রেনের করিডরে বা ভেস্টিবিউলে অস্থির টাইপের এক-আধজন লোককে প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকতে বা হাঁটাহাঁটি করতে দেখা যায়, এটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়।

তবে সাতঘাটের পানি খাওয়া অভিজ্ঞ মানুষ এমআরনাইন। ওর প্রতিটি স্নায়ুর নিজস্ব ভাষা আছে। সেগুলো এখন মৃদু অ্যালার্ম বাজিয়ে সাবধান করে দিচ্ছে ওকে। সুরটা একমুহূর্ত শুনল ও, তারপর অফ করে দিল। সম্ভবত ফলস অ্যালার্ম। হয়তো কাঁধ দুটোর আকৃতি, পথ আগলে দাঁড়ানোর ভঙ্গি, আর পরনের ট্রেঞ্চকোট অন্য কোনও সময়ের অন্য কোনও লোকের কথা মনে করিয়ে দিতে চেয়েছে ওকে।

লোকটা ওর দিকে তাকাল না, তবে পায়ের আওয়াজ পেয়ে একটু সরে দাঁড়াল। তাকে পাশ কাটিয়ে ভেস্টিবিউল থেকে বেরিয়ে এল রানা।

বুফে কারে সবুজ লাউঞ্জ-সুট পরা মধ্যবয়স্ক বার্মিজ শেফ স্বাগত জানাল ওকে, খাতির করে নিয়ে এসে এক কোণের একটা টেবিলে বসাল।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে রানা দেখল সুরাইয়া এখনও খেতে আসেনি।

ওর অর্ডার নিতে এল সাদা ইউনিফর্ম পরা ওয়েটার। আপাতত শুধু আধ বোতল রেড ওয়াইন আর অ্যাপেটাইজার চাইল ও। ডিনারের অর্ডারও দিয়ে রাখল, তবে সেটা পরিবেশন করতে হবে আরও খানিক পরে।

ওয়াইনের গ্লাসে মাত্র চুমুক দিয়েছে, এই সময় ভেস্টিবিউল থেকে সুরাইয়াকে বুফে কারে ঢুকতে দেখল রানা, ও যেদিক থেকে এসেছে তার উল্টো দিক থেকে।

বুফে কারের চারদিকে কালো চোখের শান্ত দৃষ্টি বুলাল মেয়েটা। আর সবার মত রানাকেও দেখল, তবে আলাদা কোনও

দৃষ্টিতে নয়।

রানা অবশ্য সুরাইয়ার প্রতি আগ্রহটা গোপন করছে না। আসলে সৌদি আমীরের ভূমিকায় অভিনয় করছে তো!

সেটা অত্যন্ত উপভোগ্য একটা কাজ। সুরাইয়ার দিকে একবার তাকাবার পর চুম্বকের মত আটকে গেছে ওর দৃষ্টি। ভাবল, এত রূপ কি ভাল?

এরইমধ্যে ড্রেস পাল্টে কালো শ্যানেল ট্রাভেলিং সুট পরেছে সুরাইয়া, সঙ্গে খাটো স্কার্ট। ফরসা পা কামড়ে ধরে আছে কালো লেসের তৈরি মোজা।

মেয়েটার হাঁটার মধ্যে দৃষ্টিকাড়া, উপভোগ্য একটা ছন্দ আছে; বোঝা যায় আভিজাত্য আর সংস্কৃতির সম্মিলন ঘটেছে ওর মধ্যে।

প্রথম যাত্রাবিরতি ইনসেইনে থামতে যাচ্ছে গোল্ডেন এক্সপ্রেস, দ্রুত কমে আসছে স্পিড। দামি একটা বার্মিজ চুরুট ধরিয়ে জানালার বাইরে একবার তাকাল রানা, দেখল স্টেশনের আলো কাছে চলে আসছে।

ডিনারের জন্য অপেক্ষা করছে ও। মাঝে মধ্যে সরু আইল বরাবর চোখ বুলাচ্ছে। সুরাইয়া অন্য এক প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে বসেছে: লোকটা দেখতে ভাল, মাথায় ব্যাকব্রাশ করা কোঁকড়া চুল, গোঁফ জোড়া খুব চিকন করে ছাঁটা। সম্ভবত ট্যুরিস্ট, চেহারায় বোঝা গেল না কোন্ দেশি, তবে পাকিস্তানী বৈশিষ্ট্য আছে। তার দিকে বিশেষ খেয়াল দেয়নি রানা। তবে খানিক বাদে কুৎসিত আচরণ শুরু করায় লোকটা ওর বিরক্ত দৃষ্টি কেড়ে নিল।

দৃশ্যটা তত পরিষ্কার না হলেও, রানা নিঃসন্দেহ যে টেবিলের তলায় হাত লম্বা করে সুরাইয়ার ঊরুতে সুড়সুড়ি দেয়ার চেষ্টা করছে লোকটা। মেয়েটি যে বিরক্তি বোধ করছে তাতে তার কোনও বিকার নেই। কিছু একটা করা দরকার,

উপলব্ধি করছে রানা। তবে সিদ্ধান্ত নিল, আগে দেখবে কীভাবে সামাল দেয় মেয়েটি।

খানিক পর দেখল, হাঁটুতে লাথি খেয়ে সোজা হয়ে ভদ্রভাবে বসে আছে লোকটা। পাকিস্তানী উজবুক হয়তো বুঝতে পেরেছে মেয়েটি সাড়া দেবে না, ভাবল রানা। কিন্তু না, এবার পা বাড়াচ্ছে লোকটা। এ তো দেখা যাচ্ছে নাছোড়বান্দা সেক্স ম্যানিয়াক!

ওর সুপ এসেছে দু'মিনিটও হয়নি, এই সময় ওদিক থেকে নারীকণ্ঠের ক্রুদ্ধ চেঁচামেচি ভেসে এল। মুখ তুলতেই দেখতে পেল ঝট্ করে টেবিল ছেড়ে সিধে হচ্ছে সুরাইয়া, অপূর্ব সুন্দর মুখ লাল হয়ে উঠেছে, উল্টোদিকে বসা লোকটাকে কী যেন বলছে ও।

রানা একা নয়, ডিনার খেতে আসা সবাই ওদিকে তাকিয়ে আছে। টেবিলটার দিকে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গেল সবুজ লাউঞ্জ-সুট পরা বার্মিজ হেড শেফ। প্রায় মিনিটখানেক হাত ঝাপটানো আর উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় চলল। সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু কোঁকড়া চুলের লোকটা চেয়ার ছাড়তে চেষ্টা করল, অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে আর প্রতিবাদের সুরে কীসব বলছে—কিন্তু হেড শেফ তার কাঁধে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল আবার, খুব একটা মার্জিত ভঙ্গিতে নয়।

তারপর নরম সুরে সুরাইয়াকে কিছু বলল হেড শেফ, মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। সবাই দেখল সবুজ লাউঞ্জ-সুটের পিছু নিয়ে রানার টেবিলের দিকে যাচ্ছে মেয়েটা।

বুফে কারে এখন শুধু রানার টেবিলেই একটা চেয়ার খালি। ওদের দুজনকে এগিয়ে আসতে দেখে মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠল রানা। কী আশ্চর্য, এত তাড়াতাড়ি মুখোমুখি হতে হবে!

তবে অস্বস্তির ভাবটুকু মন থেকে মুছে ফেলল রানা। ওর

পরিচয় জানবার কোনও উপায় নেই সুরাইয়ার। ফলে অপ্রত্যাশিত এই সাক্ষাৎ কোনও বিপদ ডেকে আনবে না।

প্রধান শেফ রানার কনুইয়ের পাশে থামল। 'ভদ্রমহিলাকে আপনি এখানে বসবার অনুমতি দেবেন, সার, প্লিজ? ওদিকে সামান্য, ইয়ে... মানে, একটু ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ঘটেছে।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'ইয়েস, অভকোর্স,' সপ্রতিভ ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে উল্টোদিকের চেয়ারটা দেখিয়ে বলল ও, ওর ইংরেজি উচ্চারণে আরবী টান স্পষ্ট। 'ফর মি, ইট উড বি আ গ্রেট অনার।' সুরাইয়ার দিকে মাথা ঝোঁকাল ও, নিঃশব্দে হাসল একটু।

উল্টোদিকে চেয়ারটায় ধীরে ধীরে বসল সুরাইয়া। 'ধন্যবাদ। কারও রিজার্ভ করা চেয়ারে বসছি?' ওর ইংরেজির মধ্যে আঞ্চলিক কোনও টান নেই। পরিষ্কার অক্সফোর্ড অ্যাকসেন্ট।

'না-না-না, খালি আছে।'

বারকয়েক মাথা নুইয়ে বিদায় নিল হেড শেফ।

সুরাইয়ার ডোশিয়ে-র কথা মনে পড়ে গেল রানার, ইয়াঙ্গনে আসবার সময় প্লেনে বসে পড়েছে। তাতে বলা হয়েছে, সুরাইয়ার কৈশোর ও প্রাক-যৌবনকালটা কেটেছে ইংল্যান্ডে, নিজেদের রানশ হাউসে। ওখানে থাকতেই ফ্যাশনের উপর লেখাপড়াটা প্রায় শেষ করে ফেলে ও। স্বাধীনচেতা মেয়ে, স্বাধীন ভাবে চলে।

কাছ থেকে সুরাইয়ার রূপের অন্য একটা বৈশিষ্ট্য খেয়াল করল রানা। ওর চোখ-মুখের দৃঢ় ভাবটাই সব নয়, তার নীচে আশ্চর্য একটা শীতল প্রশান্তি ও তৃপ্তির ভাবও ছড়িয়ে আছে। সন্দেহ নেই নিজেকে নিয়ে খুব সুখী এই মেয়ে।

'আমি যেন মরুভূমিতে পথ হারানো এক বেদুঈন, হঠাৎ করে সবুজ মরুদ্যান আর স্বচ্ছ ঝরণার দেখা পেয়েছি,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'আসলে একা খেতে পছন্দ করি না তো, তাই

ভাগ্য আমাকে একজন সঙ্গী জুটিয়ে দিল।'

'ভাবতে ভাল লাগছে যে কারও খুশির কারণ হতে পেরেছি আমি,' মৃদুকণ্ঠে বলল সুরাইয়া।

'আপনাকে আমি ঢুকতে দেখেছি। তখন একটা সন্দেহ হয়েছিল, এখন দেখছি সন্দেহটা মিথ্যে নয়।'

রানার সারামুখে চোখ বুলাল সুরাইয়া। অন্তর ভেদ না করলেও, ওর দৃষ্টির তীব্রতা অনুভব করতে পারছে রানা। 'আপনি লেবানিজ, না মিশরীয়, মিস্টার—'

'ফরহাদ। শেখ আমিরুল ফরহাদ ইবনে আহাদ। আমি সৌদি। ওখানে আমার একটা কোম্পানি আছে, বালির নীচ থেকে তেল তুলি আমরা।'

ফরহাদ তেলখনির মালিক শুনে সুরাইয়ার কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না।

'সিতওয়ে পর্যন্ত যাব,' মিথ্যেই বলছে রানা। ভাবছে সুরাইয়াকে নিজের গন্তব্য না জানানোই ভাল। অন্তত এখনই নয়। 'ইচ্ছে আছে রথও দেখব, আবার কলাও বেচব।'

ওর কথা শুনে হাসল সুরাইয়া। দাঁতগুলো বেদানার দানার মত ছোট ছোট, আর মুক্তোর মত সাদা। 'আপনাকে আমার পারফেক্ট একজন ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে, মিস্টার ফরহাদ।'

'ইউ আর ওয়েলকাম, থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যাডাম।'

মুখের হাসি হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল, মাথা ঝাঁকিয়ে ছেড়ে আসা টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করল সুরাইয়া। 'অন্তত আপনি ওই ছারপোকাটার মত বেহায়া নন।'

মেয়েটাকে লাল ওয়াইন অফার করল রানা। 'আমার একটু সন্দেহ হচ্ছিল লোকটা বোধহয় আপনাকে বিরক্ত করছে। আসলে কী হলো বলুন তো? অবশ্য, অনধিকারচর্চা হয়ে গেলে থাক।'

শ্রাগ করল মেয়েটা। 'না, তা হচ্ছে না। আমি মনে করি

একটা মেয়েকে অপমান করা হলে দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের প্রতিবাদ করা উচিত। ওই ছারপোকাটা টেবিলের তলা দিয়ে আমাকে বিরক্ত করছিল।' খুক করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল সুরাইয়া। 'আমার পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। দুঃখের বিষয় হলো, আমার কাছে সেফটি পিন ছিল না।'

'যা ভেবেছিলাম, তা-ই...'

'আপনি দেখেছেন ব্যাপারটা? তা হলে কিছু বললেন না যে?'

'নিশ্চিত হবার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। তারপর আপনি আর সুযোগ দেননি, নিজেই বেশ ভালই তো সামলে নিলেন।'

ঠোঁট টিপে একটু হাসল সুরাইয়া। 'ধন্যবাদ।'

আইল বরাবর টেবিলটার দিকে তাকাল রানা। কোঁকড়া মাথাটা দেখতে পেল, বুফে কার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে লোকটা, ওদিকের ভেস্টিবিউল দিয়ে। রানার মনে হলো ট্রেনের চেয়েও বেশি দুলছে সে।

'দেখে মনে হচ্ছে দু'এক পেগ বেশি হয়ে গেছে,' বলল ও।

'কী বলছেন দু'এক পেগ! তাতে কি কেউ বেহেড মাতাল হয়?' হাত ঝাপটা দিয়ে প্রসঙ্গটা বাতিল করে দিল সুরাইয়া। 'আমরা বরং অন্য প্রসঙ্গে কথা বলি।'

'ঠিক। আপনার পরিচয়টা কিন্তু—'

'আমি সুরাইয়া জেবিন, মালয়েশিয়ান, ফ্যাশন ডিজাইনার,' বলল ও। 'কুয়ালায় আমার একটা ফ্যাশন হাউস আছে, হটস্পট।'

'হটস্পট?' জিজ্ঞেস করল রানা, চোখ-মুখ একটু উজ্জ্বল হলো। 'অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে, আপনার কোম্পানি সম্ভবত সৌদি আরব থেকেও অর্ডার পায়।'

বিনয়ের সঙ্গে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সুরাইয়া। রানাকে পলিশড় একজন মানুষ বলে মনে হচ্ছে ওর, মুগ্ধ না হয়ে পারছে না। 'আমার পরিচয় পর্বটা শেষ করতে দিন, প্লিজ। আমি

একজন প্রিন্সেস, বিবাহিতা, তবে স্বামী মারা গেছেন তিন বছর হলো—না, ছেলেমেয়ে নেই। যদি কখনও মনে ধরে যায়, এক রাতের জন্যে পছন্দের পুরুষকে আমন্ত্রণ জানাতে দ্বিধা করি না।' অকস্মাৎ রানাকে একাধারে বিস্মিত ও পুলকিত করে তুলল মেয়েটির চোখে ঝিক করে ওঠা দুষ্টামি। 'লোভ লাগছে না?'

সব নির্দ্বিধায় বলতে পারছে মেয়েটি, কোনও রাখ-ঢাক নেই। মুক্ত চিন্তা, মুক্ত মানসিকতার অধিকারী না হলে এ সম্ভব হত না। যে-কোনও বিষয়ে কৌতুক করবার সাহস রাখে। কারণটা হলো লন্ডন আর প্যারিসের অভিজাত পরিবেশে মানুষ। অস্বীকার করবার উপায় নেই, রানারও ওকে ভাল লাগছে। বলল, 'সত্যি বলতে কী, লোভ তো লাগছেই!' মেয়েটির চোখে চোখ রাখল ও, 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনি চলেছেন কোথায়?'

'যাচ্ছি আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে,' অবলীলায় মিথ্যে বলল সুরাইয়া। 'প্রোমে নেমে ট্রেন বদল করব।'

'ও।'

'আমাকে দেখে আপনার ঠিক কী সন্দেহ হলো বললেন না তো?' জানতে চাইল সুরাইয়া, রানার মন্তব্যটা ভোলেনি।

'সন্দেহটা ছিলঃ আমি কি দুনিয়ার সেরা সুন্দরীকে দেখলাম?' একটু বিরতি নিয়ে আবার বলল, 'এরকম নিখুঁত ফিগার আর ফেস কাটিং খুব কমই দেখা যায়।'

'আর আপনার ওই কথাটার মানে—রথও দেখবেন, কলাও বেচবেন?'

'অনেক এক্সপার্টের ধারণা, মায়ানমারের গোটা পশ্চিম উপকূল নাকি তেলের ওপর ভাসছে,' বলল রানা। 'আমি এলাকার কমিউনিকেশনসহ অন্যান্য ফ্যাসিলিটিজ দেখতে এসেছি। এ-দেশে আমার কোম্পানি তেল তুলবে কি না, সে সিদ্ধান্ত পরে নেব।'

কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুরাইয়া। 'আপনি তা হলে কাজের মানুষ? প্লেবয় টাইপের অলস সৌদি যুবরাজদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন না?'

বড় করে একটা শ্বাস টানল রানা। 'একজোড়া হাসি-খুশি ছেলেমেয়ে সহ আমার একটা সুখী দাম্পত্যজীবন আছে।'

পার্স খুলে এক প্যাকেট বেনসন আর গ্যাস লাইটার বের করল সুরাইয়া, একটা সিগারেট ধরিয়ে নাক দিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ছে। 'যত দেখছি ততই ভাল লাগছে আপনাকে আমার, মিস্টার ফরহাদ। আপনার সঙ্গে ওদের ফটো আছে, জানা কথা।'

'জানা কথা,' কথাটা একই সুরে পুনরাবৃত্তি করে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল রানা। মানিব্যাগ থেকে বেরুল একটা গ্রুপ ফটো। ফটোর মেয়েটা মোটাসোটা হলেও, সুন্দরী। আর বাচ্চা দুটো যেন কোনও নামকরা শিল্পীর আঁকা দেবশিশু, শুধু ডানা নেই, এই যা। এক সেকেন্ডের জন্য ভাবল ও, কারা ওরা?

ফটোটা দেখে ফেরত দিল সুরাইয়া। 'খুব সুন্দর ওরা। আপনি নিশ্চয়ই খুব সুখী একজন মানুষ, মিস্টার ফরহাদ,' চেপে রাখবার চেষ্টা করলেও, ওর কথার সুরে ক্ষীণ একটু তিক্ততার রেশ প্রকাশ হয়ে পড়ল। তবে একমুহূর্ত পরেই হাসিটা ফিরে এল চেহারায়। 'যদি অনুমতি দেন, আপনাকে আমি একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই।'

'বেশ তো, করুন।'

'স্ত্রীর কাছে আপনি কখনও অবিশ্বস্ত হয়েছেন, মিস্টার রানা?'

উত্তর দিতে সময় নিচ্ছে রানা, যেন সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না সত্যি বলবে, না মিথ্যে। অবশেষে কাঁধ ঝাঁকিয়ে শান্ত সুরে বলল, 'হ্যাঁ, দু'একবার। যখন বাড়ি থেকে দূরে থাকি আর নিঃসঙ্গ বোধ করি। আমার স্ত্রী খুবই প্র্যাকটিকাল, তিনি কখনোই

আমাকে কোনও প্রশ্ন করেন না।'

সুরাইয়ার ঠাণ্ডা দৃষ্টি ছুরির মত ধারাল হয়ে উঠল। 'তা কি আদৌ সম্ভব, মিস্টার ফরহাদ? একটা মেয়ে, স্ত্রী, প্রশ্ন না তুলে কি পারে? আমার ধারণা তা সম্ভব নয়।'

'আমার বেলায় সম্ভব হয়েছে,' বলল রানা।

খাবার আসার অপেক্ষায় অনেক গল্প হলো দুজনে: ক্রিয়েটিভ ফ্যাশন ডিজাইন সম্পর্কে, চলতে চলতে পথেঘাটে সুন্দরী মেয়েদের বিপদ সম্পর্কে, বালির নীচ থেকে তেল আহরণের ঝক্কি-ঝামেলা সম্পর্কে। ইতোমধ্যে যথেষ্ট ওয়াইন গিলে ফেলেছে মেয়েটি... হঠাৎ হাত বাড়িয়ে রানার কবজি স্পর্শ করল সুরাইয়া।

আঙুলগুলো ঠাণ্ডা ও শুকনো, অথচ তারপরও রানার সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়ল।

'আমি বলব, আপনার স্ত্রী খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে,' বলল সুরাইয়া। 'আমার ধারণা, তিনি জানেন প্রশ্ন করলে আপনি সত্যি কথাই বলবেন। এবং অন্তত এই একটি ব্যাপারে সত্যি কথাটা তিনি শুনতে চান না।'

খানিক চুপ করে থেকে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক বলেছেন। এটা হতে পারে। বোধহয় ঠিকই...'

'আমার সঙ্গে আপনি কি এক গ্লাস ওয়াইন শেয়ার করবেন, মিস্টার ফরহাদ?' হঠাৎ করেই জানতে চাইল সুরাইয়া। 'আমার কিংবা আপনার কমপার্টমেন্টে?'

রানা কল্পনাও করেনি এত তাড়াতাড়ি আর এত সহজে সুন্দরী একটি মেয়ের কাছ থেকে এরকম একটা প্রস্তাব পাওয়া যেতে পারে। সুরাইয়ার কামরাটা সার্চ করবার এই সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। 'ও, শিওর!' তাড়াতাড়ি বলল ও। 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! দেখা যাচ্ছে মরীচিকা নয়, বেদুঈন ব্যাটা সত্যি একটা সুজলা-সুফলা মরুদ্যান পেয়ে গেছে।'

কথা না বলে মৃদু হাসল সুরাইয়া, সেটা যথেষ্ট মিষ্টি হলেও, তাতে কোনও রঙিন প্রতিশ্রুতি নেই।

ওয়েটারকে এগিয়ে আসতে দেখছে রানা। 'তবে,' বলল ও, 'আমার একটা শর্ত আছে।'

'শর্ত?' একদৃষ্টে রানার দিকে তাকাল সুরাইয়া।

'হ্যাঁ। তার আগে আমার সঙ্গে আপনাকে ডিনারটা সেরে নিতে হবে,' বলে ইঙ্গিতে ওয়েটারকে দেখাল রানা। 'আমার অর্ডার দেয়া আছে, আপনি অর্ডার দিন।'

পাঁচ

ডিনার সেরে বিল মেটাল রানা। সুরাইয়াকে নিয়ে বুফে কার থেকে বেরিয়ে আসছে, চোখাচোখি হতে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল হেড শেফ, ঠোঁটের কোণে সম্মতি ও প্রশংসাসূচক ক্ষীণ হাসির রেখা।

করিডরে বেরিয়ে এসে রানাকে পথ দেখাল সুরাইয়া।

আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা, সুরাইয়াকে জানাবে না ওর কমপার্টমেন্টটা কোথায়।

সারাক্ষণ দোল খাচ্ছে ট্রেন, প্রতি মুহূর্তে ভারসাম্য হারাবার উপক্রম করছে সুরাইয়া; তারপরও বাধ্য না হলে রানাকে ধরছে না। যখন ধরছে, মাত্র দু'আঙুলের ডগা দিয়ে, তাও মাত্র দু'এক সেকেন্ডের জন্য।

গোল্ডেন এক্সপ্রেস এখন তুমুল বেগে ছুটছে। আশা করা যায়

ভোর হওয়ার আগেই প্রোমে পৌঁছে যাবে ওরা।

একটা ভেস্টিবিউল পেরুবার সময়—বদ্ধ জায়গার ভিতর চাকার গর্জন শতগুণ হয়ে আঘাত করছে কানে—গায়ে বাদামী রঙের ঢোলা ট্রেঞ্চ কোট পরা সেই চিনা কুস্তিগিরকে আবার দেখতে পেল রানা। দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে সে। হাতে সিগারেট, তাকিয়ে আছে জানালার বাইরে।

আবারও রানার মাথার ভিতর অ্যালার্ম বেজে উঠল। এবার আগের চেয়েও একটু জোরে। এই লোক তো সেই লোক নয়! প্রথম লোকটার মাথায় ছাইরঙা উলের টুপি ছিল। এর মাথায় সোনালি শোলা-র ক্যাপ। এই লোকটা আরেকটু বেশি লম্বা, আরেকটু কম মোটা—অনেকটা বক্সারদের মত দেখতে। মুহূর্তের জন্য বোকা বানিয়েছিল ট্রেঞ্চ কোট।

তা ছাড়া, এটা সেই একই ভেস্টিবিউলও নয়। বুফে কার থেকে রানা সুরাইয়াকে নিয়ে বেরিয়েছে উল্টোদিকের দরজা দিয়ে, যেটা দিয়ে ঢুকেছিল সেটা দিয়ে নয়। এখানে, এই ভেস্টিবিউলে, প্রথম লোকটাকে থাকতে হলে বুফে কার হয়ে আসতে হবে। রানা হলপ করে বলতে পারে তা সে আসেনি।

তার মানে ওরা দুজন। কুস্তিগির আর মুষ্টিযোদ্ধা।

বাকি দুজন? ওরা নিশ্চয়ই ট্রেনে উঠেছে, আছে কোথাও।

সুরাইয়ার জন্য দরজাটা খুলে ধরেছে, এই সময় অস্বস্তির কাঁটাটা আবার অনুভব করল রানা। একটু জোরালোই। ব্যাপারটা নিয়ে পরে চিন্তা করবে, আপাতত...

পরবর্তী কারের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় সুরাইয়া বলছেঃ 'আচ্ছা, এ কি সম্ভব বলে মনে করেন, মিস্টার ফরহাদ—ধরুন আমাদের মতই হঠাৎ পরিচয়, পরস্পরকে ভাল লেগে যাওয়ায় সময়টা ওরা নিভৃতে উপভোগ করল, তারপর ভাল বন্ধু হিসেবে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল? প্রেমের ন্যাকা ন্যাকা সংলাপ থাকল না, থাকল না কোনও অনুশোচনা কিংবা অপরাধবোধ?

হয়তো এই অভিজ্ঞতা রিপিট করার কোনও ইচ্ছেও থাকল না, যাতে ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি ভোলা যায়। সত্যি কি সম্ভব?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'সম্ভব,' বলল ও, 'শুধু ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটা ছাড়া। ভোলা সম্ভব বলে মনে করি না। বাকি সব—হ্যাঁ।'

আরেকটা ভেস্টিবিউল পার হচ্ছে ওরা, এটা খালি। ওদের পায়ের নীচে লাইন ধনুকের মত বাঁকা হয়ে এগিয়েছে, ফলে বেশ খানিকটা কাত হয়ে ছুটছে ট্রেন। দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন হয়ে ওঠায় রানার কাঁধ খামচে ধরল সুরাইয়া। খুব কাছাকাছি চলে এল দুটো শরীর, কয়েক সেকেন্ড পরস্পরের সঙ্গে সেঁটেও থাকল।

কমলা কোয়ার মত একজোড়া ঠোঁট যেন প্রচণ্ড পিপাসায় সামান্য ফাঁক হয়ে আছে, সেগুলো রানার মুখের সামনে এমনভাবে তুলে ধরল সুরাইয়া, ওর মনে হলো চুমো না খেলে যৌবনের স্বাভাবিক ধর্মকে অপমান করা হয়।

যদিও ব্যাপারটা শুরু হওয়ার একটু পরেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সুরাইয়া।

ওর কমপার্টমেন্টের বিছানা শোয়ার জন্য তৈরি করে দিয়ে গেছে অ্যাটেনড্যান্টরা। বেডের কিনারায় বসে আবার একটা বেনসন ধরাল মেয়েটা। সুগঠিত পা দুটো ক্রস করা।

ওদিকে চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে করিডরে মুখ বের করে দিয়েছে রানা। সাদা ইউনিফর্ম পরা একজন অ্যাটেনড্যান্টকে দেখতে পেয়ে রেড-ওয়াইনের অর্ডার দিল।

অপেক্ষার সময়টা কার কী বিষয়ে আগ্রহ তাই নিয়ে আলাপ করছে ওরা। পাঁচ-সাত মিনিটেই রানা বুঝে নিল, সুরাইয়া আর দশটা মেয়ের মত নয়, দুনিয়াটা কীভাবে চলছে না চলছে সব খবর ওর নখদর্পণে।

ওয়াইন ও গ্লাস এল ট্রেতে করে। কমপার্টমেন্টের দরজায় তালা লাগিয়ে দিল রানা। বোতল থেকে গ্লাসে ও-ই ঢালল,

একটা ধরিয়ে দিল সুরাইয়ার হাতে।

যে যার গ্লাস নিঃশব্দে শেষ করল ওরা।

আর যখন কিছু করবার নেই, রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে ওর মুখে নরম একটা হাত চেপে ধরল সুরাইয়া। 'আমাকে বলতে দাও, প্লিজ। আজকের মত আর কোনও রাত আমাকে এভাবে রোমাঞ্চিত করেছে কি না মনে করতে পারছি না। আমি চাই, এই বিচিত্র রাতের স্মৃতি আমাদের মনে অম্লান হয়ে থাকুক যতদিন বেঁচে থাকব।'

'তথাস্তু,' বিড়বিড় করল রানা।

'ফরহাদ, আমি মনে করি না আর কোনওদিন দেখা হবে আমাদের। চাইছিও না দেখা হোক। আমাকে ক্ষমা কোরো, তবে এই মুহূর্তে এটাই আমার অনুভূতি। আর ভবিষ্যতে যদি আমার কথা কাউকে বলো, আমি জানি তুমি বলবে, প্লিজ আমাকে ছোট কোরো না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল রানা। ভাবছে, এই মেয়ে ডাবল এজেন্ট হোক বা না হোক, আশা করতে দোষ নেই, ওকে ঠিকই তুং শানের আস্তানায় পৌঁছে দেবে।

একটু পর গ্লাস ও বোতল ট্রেতে তুলে বেডের উল্টোদিকে খুদে রাইটিং ডেস্কের উপর রাখল রানা, তারপর পরমাসুন্দরীর নরম দু'হাত ধরে টানল কাছে।

নিঃশব্দে কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। পরমুহূর্তে টের পেল করিডরের দুই প্রান্ত থেকে ওর দিকে হেঁটে আসছে বাদামী রঙের দুটো ট্রেঞ্চ কোট। প্রকাণ্ড শরীর ওদের, চওড়া মুখ, সরু চিনা চোখে কঠিন দৃষ্টি। দুজনেরই একটা করে হাত ফুলে থাকা পকেটে ভরা।

বুঝে নিল রানা, মারাত্মক বিপদে পড়েছে ও। সুরাইয়াও।

করিডরে ওরা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই। কুস্তিগির আর

মুষ্টিযোদ্ধা দৃঢ় ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। সৌদি ধনকুবের শেখ আমিরুল ফরহাদের ভূমিকায় ফিরে গেল ও, যে কি না এইমাত্র নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করেছে।

বোকা বোকা চেহারায় ডানদিকের লোকটাকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করল রানা। 'এক্সকিউজ মি, প্লিজ।'

কুস্তিগির, মাথায় অ্যাশ কালারের টুপি, ওকে অমার্জিত ভঙ্গিতে গার্ড রেইলের দিকে ঠেলে দিল, ক্যারিজের যেদিকটায় জানালা রয়েছে। 'এই, তুমি, এক মিনিট! তোমার নাম ফরহাদ?' চিনা উচ্চারণে ভালই ইংরেজি বলছে সে।

বিমূঢ় হওয়ার ভান করে তার দিকে তাকাল রানা, তারপর ভাব দেখাল রাগ হচ্ছে। জানে, খেলাটা খুব সাবধানে খেলতে হবে ওকে। এই গ্যাংটা সম্পর্কে তথ্য দরকার ওর।

'হ্যাঁ। আমি শেখ আমিরুল ফরহাদ ইবনে আহাদ। কেন? তোমরা কে? আমার নামই বা জানলে কীভাবে? আর, ধাক্কা মারলে যে?'

কুস্তিগির বলল, 'শান্ত থাকো, মিস্টার ফরহাদ। আমরা শুধু তোমার সঙ্গে একটা বিষয়ে কথা বলতে চাই, আর কিছু নয়। তোমাকে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে, প্লিজ।'

ভয় পেল রানা। 'তোমাদের সঙ্গে যেতে হবে কেন? দাঁড়াও, শোনো, আসলে কী চাও তোমরা—'

মাথায় সোনালি ক্যাপ পরা দ্বিতীয় লোকটা, মুষ্টিযোদ্ধা, ঝট্ করে পিস্তল বের করে চেপে ধরল রানার পিঠে। 'চলো। আর একটা কথাও নয়। আমার সামনে থাকো, সাবধানে হাঁটো। চালাকি করতে গেলে স্রেফ খুন হয়ে যাবে।'

রানার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। 'খু-খুন?' সুরাইয়ার কমপার্টমেন্টের দিকে চট্ করে একবার তাকাল ও। 'তোমরা নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছ। আমি তো শুধু—'

কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠল মুষ্টিযোদ্ধা। 'আমরা জানি কী

করছিলে তুমি, মিস্টার ফরহাদ। কিন্তু তুমি কি জানো, কার বিরিয়ানি এঁটো করেছ?'

'মানে?' বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে রানাকে।

'মানে জেনে আর কাজ নেই তোমার,' বলল মুষ্টিযোদ্ধা। 'কীভাবে কী হলো, সেটাই এখন শোনাবে তুমি। মার্চ!'

ভয়ে ফুঁপিয়ে ওঠার মত আওয়াজ করল রানা। 'ব্যাপারটা কী? ওহ্, গড! তোমাদের কেউ কি ওর স্বামী? আমাকে এভাবে হ্যারাস করা হচ্ছে কেন? আইডিয়াটা আমার নয়, ওর ছিল। ও-ই আমাকে নিজের কমপার্টমেন্টে দাওয়াত দেয়, তারপর—'

পিস্তল দিয়ে রানার শিরদাঁড়ার উপর গুঁতো মারল মুষ্টিযোদ্ধা। 'মুভ! বললাম না, সব শোনার জন্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তোমাকে।' তারপর বিড়বিড় করে সঙ্গীকে কী যেন বলল সে, ভাষাটা বুঝল না রানা।

হেসে উঠল দুজনেই।

মনে মনে খুশি রানা। ওকে তারা এরইমধ্যে নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ ধরে নিয়েছে। ঠিক যা চেয়েছে ও। তবে পিত্তির হাত থেকে মনে হয় বাঁচা যাবে না।

ছয়

একটা ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেন্টের কোনায় সিটে বসে আছে রানা। পরনে শুধু সাদা শর্টস। সদ্য ত্যাগ করা ওর প্রতিটি পরিচ্ছদ সার্চ করছে দৈত্যদের একজন।

দ্বিতীয় লোকটা উল্টোদিকের সিটে বসে হাতের ইস্পাত-নীল পিস্তলের নলে সাইলেন্সার ফিট করছে। তারপর রানার কলজে বরাবর তাক করল সেটা।

পিস্তলধারী যখন আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছিল, তুং শান নামটা কানে এসেছে রানার।

অ্যাশ কালারের টুপি, কুস্তিগির, সার্চ শেষ করে কাপড়চোপড় আর জুতো-মোজা রানার পায়ের কাছে ফেলল। 'তোমার কাগজ-পত্র সব ঠিক আছে, শেখ ফরহাদ।'

তা তো থাকবেই! বিসিআই-এর ডকুমেন্টস ডিপার্টমেন্ট কাঁচা কাজ করে না। নড়েচড়ে বসল রানা।

হাতের ফটোটা সামনে ধরল কুস্তিগির, সুরাইয়াকে যেটা দেখিয়েছিল রানা। 'কারা এরা?'

'আ-আমার স্ত্রী আর সন্তান,' একটু তোতলাল রানা। দুর্বল হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'আমার স্ত্রী... ফারজানা যদি কখনও ব্যাপারটা জানতে পারে, স্রেফ খুন হয়ে যাব আমি। প্লিজ, ভাই, আমরা কি—'

ওর গালে কষে একটা চড় মারল কুস্তিগির। 'চুপ! প্রশ্ন না করলে আর একটা কথাও না। মজা লোটার সময় মনে ছিল না?' পিস্তলধারী সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল সে। 'ব্যাটা বলে খুন হয়ে যাবে!'

মাথাটা পিছিয়ে নিল রানা, যেন ভয় পাচ্ছে আবার ওকে মারবে লোকটা।

হেসে উঠে রানার পাসপোর্টে টোকা দিল কুস্তিগির। 'তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ, মিস্টার ফরহাদ। তোমার জন্যে বউয়ের হাতে খুন হওয়াই অনেক আরামের হত। আমরা নিরীহ মানুষকে খুন করতে চাই না। ঠিক আছে, আরেকবার বলো মিস সুরাইয়া জেবিনের সঙ্গে কীভাবে তোমার পরিচয় হলো। দেখি প্রথমে যা বলেছ তার সঙ্গে ঠিক ঠিক মেলে কি না।'

সত্যি কথাই বলল রানা। যেভাবে সুরাইয়ার সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছে আউড়ে গেল দ্বিতীয়বার। এসবের সাক্ষী আছে।

দুই দৈত্যই মন দিয়ে শুনল। রানা থামতে গা চুলকাতে শুরু করল মুষ্টিযোদ্ধা, অন্য দিকে তাকিয়ে অলস সুরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে নিয়ে শোয়ার জন্যে ম্যাডাম টাকা চাইল?'

খুদে একটা লাল বালব জ্বলে উঠল রানার মাথার ভিতর। প্রশ্নটা এমন সহজভাবে করা হয়েছে, যেন ব্যাপারটার কোনও গুরুত্ব নেই। তার মানে গুরুত্ব আছে। সুরাইয়ার কাভার-এ খুঁত আছে কি না পরীক্ষা করছে?

রানা জবাব দিল, 'হঁ-হ্যাঁ, চেয়েছে। অবাকই হয়েছি, কারণ দেখে তো মনে হয়নি যে... কিন্তু চাইল। তবে আমি তাকে বেশি না, মাত্র পাঁচশ' ডলার দিয়েছি।'

পিস্তলধারী মুষ্টিযোদ্ধা হেসে উঠল। 'পয়সা-উসুল হয়েছে, মিস্টার ফরহাদ?'

নিঃশব্দে হাসতে চেষ্টা করে রানা বলল, 'তা হয়েছে। আমি—'

অপর লোকটা, কুস্তিগির, ধাম করে একটা ঘুসি মারল রানার নাকে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল মাথাটা। এক সেকেন্ড পর নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল, ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে মেঝের কার্পেটে।

রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল রানার; চোখ-মুখ কুঁচকে, গুঙিয়ে উঠে আঘাতটা হজম করল। ওরও সময় আসবে।

'দাঁড়াও!' নির্দেশ দিল কুস্তিগির।

দাঁড়াল রানা। রক্তে ভেজা নাকের দুটো ফুটোই সুড়সুড় করছে, কিন্তু লোকগুলোকে উত্তেজিত করা হবে ভেবে হাত তুলে মুছতে পারছে না।

মুষ্টিযোদ্ধা আর কুস্তিগির অনেকক্ষণ ধরে দেখল ওকে। তারপর পরস্পরের দিকে তাকাল।

'ব্যাটা স্বাস্থ্যবান লম্পট,' পিস্তল নেড়ে বলল মুষ্টিযোদ্ধা।

'তেলখনির মালিক এইরকম পেটা শরীর পেল কোথায়?'

'ঠিক বলেছ,' বলল বক্সার। 'আরাম-আয়েশ আর লাম্পট্যের পর ব্যায়ামের সময় কোথায়? না, সম্ভব নয়। ব্যাপারটা খুবই বেখাপ্পা।'

'টে-টেনিস খেলি আমি...'

হাতের ইশারায় ওকে থামিয়ে দিল মুষ্টিযোদ্ধা। ওরা এখন সশব্দে চিন্তা করছে, চায় না সেটায় বাধা পড়ুক।

'আমাদের উচিত ওর স্বাস্থ্যহানি ঘটানো,' সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল কুস্তিগির।

রানার চারদিকে হাঁটতে শুরু করল সে, ওর শরীরের শুকনো ক্ষতগুলো এক এক করে খুঁটিয়ে দেখছে। 'আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ব্যাটার সারা শরীরে জখমের দাগ। অনেক। নতুন, পুরানো, সব রকমেরই আছে। এর মত একটা কাপুরুষের গায়ে এত ক্ষতচিহ্ন আসে কীভাবে?'

পিস্তলটা আরও শক্ত করে ধরে সিট ছাড়ল মুষ্টিযোদ্ধা। 'ভাল প্রশ্ন।' স্থিরদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল সে। 'তোমার কাছে নিশ্চয়ই এর বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা আছে, শেখ সাহেব?'

একটা ঢোক গিলল রানা, ঠাণ্ডা ঘাম অনুভব করল ঠোঁটের উপর। তাগাদা দিল নিজেকে, তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা বের করো!

পকেটে হাত ভরে ছুরি বের করল কুস্তিগির। রানার চোখে চোখ রেখে বোতামে চাপ দিল সে, ক্লিক শব্দের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল সাড়ে ছয়ইঞ্চি লম্বা ফলা। 'আমরা সত্যি কথা শুনতে চাই,' হিসহিস করে বলল সে। 'গায়ে এত দাগ কীসের?'

'আ-আমি অটো অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'দুই-দুইবার...সত্যি বলছি! কসম! উইন্ডশিল্ড ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে সামনের গাড়ির উইন্ডশিল্ড ভেঙে ঢুকে পড়েছিলাম, শরীরের কোথাও কাটতে বাকি ছিল না।' ভয়ে প্রায় কেঁদে

ফেলার উপক্রম শেখ সাহেবের।

'উহুঁ, তুমি বানাচ্ছ,' হাতের পিস্তল নেড়ে বলল মুষ্টিযোদ্ধা। 'ওগুলো সব একসময়ে হয়নি।' ঝট্ করে রানার পিছনে সরে গেল সে।

'বললাম না, দুইবার...'

ঘাড়ের পিছনে সাইলেন্সারের ঠাণ্ডা স্পর্শ পেয়ে থেমে গেল রানা। নাক বরাবর সোজা তাকিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল, ঠক ঠক করে কাঁপছে সারা শরীর।

এখন পর্যন্ত ভালই চালিয়ে যাচ্ছে, জানে রানা। তবে লোক দুজনকে সত্যি সত্যিই ভয় পাচ্ছে এখন—পিছনের পিস্তলটা ঝুঁকির মাত্রা অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন ব্যাপারটা সময়ের চুলচেরা হিসাব আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করবে। যদি আর বেশি দেরি করে...

ফলার ডগাটা একবার পরীক্ষা করল কুস্তিগির, তারপর অলস ভঙ্গিতে রানার একটা হাত তুলে নিল। রানা অনুভব করল লোকটার ইস্পাতের মত শক্ত মুঠোয় প্রচণ্ড শক্তি। কিছু বলছে না লোকটা, ঠাণ্ডা চোখে দেখছে রানাকে। রানার বাম হাতের বুড়ো আঙুলে টিপসই দেওয়ার জায়গায় ছুরির ডগাটা ঠেকাল, তারপর আবার সরিয়ে নিল।

দ্বিতীয়বার ফলাটা আঙুলের মাংসে ঠেকিয়ে জোরে মোচড় দিল কুস্তিগির। চেঁচিয়ে উঠল রানা, এক ঝটকায় টেনে নিল হাতটা। 'উ-উহ! কেন খামোকা ব্যথা দিচ্ছ আমাকে! সত্যি কথাই বলছি আমি! কসম খাচ্ছি, তাও বিশ্বাস করছ না? বাকি দাগগুলো হয়েছে কলেজে রাগবি খেলতে গিয়ে...'

ছুরিটা আবার এগিয়ে আসছে।

কাঁপতে কাঁপতে মেঝেতে বসে পড়ল রানা। আকুল মিনতি জানাচ্ছে, 'না, না, খামোকা কষ্ট দিয়ো না! সত্যি বললেও তোমরা যদি বিশ্বাস না করো, আমি তা হলে কী করব—'

আগে থেকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ওর পেট লক্ষ্য করে লাথি চালাল কুস্তিগির। তবু সময় পেয়েছে রানা, ইচ্ছে করলে পাটা ধরে মোচড় দিতে পারত। কিন্তু জানে পিছনের পিস্তলটা সঙ্গে সঙ্গে ওর চাঁদি ফুটো করে দেবে।

লাথিটা ডান কাঁধের নীচে, হাতের উপর লাগতে দিল রানা। ঝাঁকি খেল ও, মাথাটা ঠুকে গেল সিটের পায়ার সঙ্গে।

'শালার ব্যাটা ছুরির ভয়ে মেঝেতে নেমে পড়েছে!' হিসহিস করে বলল কুস্তিগির। 'এখন না আবার পেশাব করে ফেলে।' কথা শেষ হওয়া মাত্র আবার পা চালাল। এবার রানার মাথা লক্ষ্য করে।

এবারও মারটা হজম করল রানা, তবে খুলির বদলে লাথিটা খেল পিঠে। নিজের রিফ্লেক্স অ্যাকশনের প্রশংসা করতে যাচ্ছে, এই সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দ্বিতীয় লোকটা, মুষ্টিযোদ্ধা, পিছন থেকে ওর ঘাড়ের উপর লাথি চালাল।

জুতোর কর্কশ কিনারা নিরাবরণ চামড়ায় ছোরার মত ঘষা খেল। ব্যথায় ককিয়ে উঠল রানা, এবার আর অভিনয় করছে না। দুদিক থেকে দুজনের লাথি খেয়ে কার্পেটের উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে ও, সেই সঙ্গে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত নিল রানা, খুন করবে।

মিনিট দুয়েক একটানা লাথি মেরে হাঁপিয়ে গেল লোক দুজন। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্টির হাসি হাসছে।

দম ফিরে পাওয়ার পর ছুরির ডগা দিয়ে জুলফি চুলকাচ্ছে কুস্তিগির, কুঁকড়ে ছোট হয়ে থাকা রানার উপর দিয়ে পিস্তলধারী মুষ্টিযোদ্ধার দিকে তাকাল। 'হয়তো,' বলল সে, 'সত্যি কথাই বলছে ও। বোঝাই তো যাচ্ছে অতি নিচু জাতের একটা কাপুরুষ। ওর এই বিনা বাধায় গড়াগড়ি খাওয়া দেখে আমার সারা শরীর ঘিন ঘিন করছে। তুমি চার্জে আছ, ব্যাং চি। কী করতে বলো?'

ক্রল করে সরে এসে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে, আবার সিটে উঠে বসল রানা। দু'হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে, থর থর করে কাঁপছে শরীরটা। আঙুলের ফাঁক দিয়ে দুজনের উপর নজর রাখছে।

ব্যাং চি, মুষ্টিযোদ্ধা, পিস্তলে ফিট করা সাইলেন্সার দিয়ে ভোঁতা চিবুক চুলকাচ্ছে। প্রতিপক্ষ সামান্যতম বাধা দেয়ার চেষ্টা না করায় হতাশ হয়েছে। রানার দিকে ঘৃণা ভরা দৃষ্টিতে তাকাল। 'তোমার ওই কথাটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল, জিনান। আমাদের উচিত কুকাজ করার অপরাধে ওর স্বাস্থ্যহানি ঘটানো। সেটা লিঙ্গচ্ছেদও হতে পারে।' একটু থেমে মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে আবার বলল, 'লাম্পট্যের অপরাধে সৌদিতে অবশ্য মুণ্ডু কাটার আইন আছে। আমরা ওর ওই জিনিসটার মুণ্ডু কেটে ফেলে দিতে পারি।'

'আইন কোনও সমস্যা নয়,' বলল কুস্তিগির জিনান। 'দুনিয়ার যে-কোনও আইনে আমরা ওর বিচার করতে পারি। এমনকী দরকার হলে নিজেরাই ওর জন্যে একটা আইন তৈরি করে নেব। শুধু দেখতে হবে মহামান্য তুং শান তাতে সন্তুষ্ট হবেন কি না।'

'হুম। আমাকে খানিক ভাবতে দাও।'

'ব্যাং চি, তাড়াতাড়ি,' বলল কুস্তিগির। 'থোনজেতে পৌঁছাতে আর বেশি দেরি নেই। তার আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এই হারামজাদাকে নিয়ে কী করব আমরা।'

ঠিক এই সময় দরজায় নক হলো। 'সার? আপনারা আছেন, সার?'

ব্যাং চি ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল। হাতের ছুরিটা আস্তে করে রানার গলায় ঠেকাল জিনান, ঠিক জাগিউলার ভেইনের উপর।

'আছি,' সাড়া দিল ব্যাং চি। 'কে? কী চাই?'

'আমি কনডাক্টার, সার। দুঃখিত, সার। আপনারা কে কোথায় যে নামবেন বলেছিলেন, আমার ঠিক মনে নেই, সার। ওই দুজন কি থোনজেতে? দয়া করে আরেকবার যদি বলতেন—'

আচ্ছা, ভাবল রানা, বোঝা গেল বাকি দুজনও আছে ট্রেনে।

'আমরা মাত্র একজন থোনজেতে নামব,' জানাল গ্রুপ লিডার ব্যাং চি।

'আধ ঘণ্টা পর, সার। আমরা থোনজে পৌঁছাব ঠিক আধ ঘণ্টা পর। অসংখ্য ধন্যবাদ, সার।'

'ধন্যবাদ।'

পরিস্থিতি বদলে গেছে। খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। অত্যন্ত সতর্ক লোক এরা দুজন, কনডাক্টারের কণ্ঠস্বরকে একটা ওয়ার্নিং সিগনাল হিসাবে দেখবে।

রানার উল্টোদিকের সিটে আবার বসল ব্যাং চি, পিস্তল হাতে এখনও কাভার দিচ্ছে ওকে। 'তুমি নেহাতই ভাগ্যবান একজন কাপুরুষ,' বলল সে। 'তোমাকে খুন করার প্ল্যানটা আমি বাতিল করে দিচ্ছি। কাপড় পরো। তারপর নতুন জীবন ফিরে পাওয়ায় আমাদের পায়ের জুতো চেটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বেরিয়ে যাও কামরা থেকে। নাও, আগে জামাকাপড় পরে নাও।'

সিট থেকে নেমে সিধে হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে রানা, কিন্তু পারছে না। ওর হাঁটু দুটো নিজে থেকেই ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে। আবার বসে পড়তে হলো ওকে। ব্যাং চি আর জিনানের দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকল, মুখে এক চিলতে দুঃখের হাসি। 'আ-আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছি। বমি করে ফেলব।'

রেগে গিয়ে চোখ পাকাল জিনান, 'এই হারামখোর, ভাল চাস তো জলদি কাপড় পরে নে! সাবধান, বমি আটকে রাখ্! তা না হলে তোর বমি তোকেই খাইয়ে ছাড়ব!'

বার কয়েক ঢোক গিলে বমি আটকাবার চেষ্টা করল রানা,

তারপর ভাব দেখাল অসুস্থ ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। হাত চালিয়ে জুতো-জামা পরছে ও।

ব্যাং চি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি প্রোমে নামছ?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ।'

'ওখানে তোমার কাজ কী?' কপালটা কুঁচকে রেখেছে।

'ওখানকার দুজন তেল বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করব,' বলল রানা। আসলে দেখা করবে ওর এজেন্সির এজেন্টের সঙ্গে। 'তারপর সিতওয়ে পর্যন্ত যেতে পারি—ঘুরে দেখব মায়ানমারের পশ্চিম উপকূলটা।'

'ওটা আরাকান রাজ্যে পড়েছে। কিন্তু সিতওয়েতে কেন? কী আছে ওখানে?' রানার ব্যাপারে এখনও পুরোপুরি নিঃসন্দেহ নয় ব্যাং চি। 'তেল ব্যবসায়ী হিসেবে তোমার তো যাওয়া উচিত আরও উত্তরে, ভারত-মায়ানমার সীমান্তের চিন অঞ্চলে—যেখানে প্রচুর তেল পাওয়া যাবে বলে শোনা যাচ্ছে।'

'এক্সপার্টরা বলছেন, পশ্চিম উপকূলেও প্রচুর তেল আছে,' বলল রানা, যেটা সুরাইয়াকেও বলেছে। বস্-এর নির্দেশ অনুসারে হোম ওঅর্ক করতে গিয়ে তথ্যটা জেনেছে ও।

জুলফি চুলকাচ্ছে ব্যাং চি, বলল, 'আমাদের আসলে উচিত তোমার বিবিকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেয়া কাজের ছুতোয় দেশের বাইরে এসে কী অকাজ-কুকাজ করছ। তুমি কী বলো, জিনান?'

'রসিয়ে রসিয়ে চিঠিটা আমিই লিখব,' বলল জিনান। 'তবে পরে। কার্পেটে বমি করে ফেলার আগেই বানচোতটাকে বিদায় করো।'

'এক মিনিট।' হাতের পিস্তলটা রানার পেটে তাক করল ব্যাং চি। 'এই কমপার্টমেন্টে যা কিছু হয়েছে কিছুই তোমার মনে নেই। এখানে আসলে কিছুই ঘটেনি। আমাদেরকে তুমি চেনো না, জীবনে দেখোনি কখনও। বুঝতে পারছ তো পরিষ্কার?'

'পা-পারছি,' বলল রানা, মুখে কথা বেধে যাচ্ছে। 'কাউকে

কিছু বলব না। খোদার কসম। এবং ধন্যবাদ, ভাই, আমাকে যেতে দিচ্ছ বলে। সত্যি বলছি, জীবনের তরে একটা শিক্ষা হয়ে গেল আমার।'

'হলেই ভাল,' বলল ব্যাং চি, তার চোখে মুহূর্তের জন্য করুণার একটা ভাব ফুটল। 'এরকম অ্যাথলেটিক বডি, অথচ যতই লাথি মারো, নেড়ি কুত্তার মত খালি কুঁই কুঁই—ভাবাই যায় না!'

'ওর জায়গায় আমি হলে,' বলল জিনান, 'অনেক আগেই আত্মহত্যা করতাম।'

রানা কথা বলছে না। গায়ে কোটটা চাপিয়ে নিজের টুকিটাকি জিনিস পকেটে ভরছে। আর বেশি সময় নেওয়া যাবে না। ওদের দুজনকে একসঙ্গে পেতে হবে, হাতের নাগালে। দুটো হাত আর আন-আর্মড কমব্যাটই ওর এখন একমাত্র অস্ত্র।

'আমি থোনজেতে নামছি,' রানাকে বলল ব্যাং চি। 'বাকি পথটুকুই প্রোম পর্যন্ত ট্রেনে থাকছে। জিনান তোমার ওপর কড়া চোখ রাখবে। নিজের ভাল চাইলে ম্যাডাম সুরাইয়ার ছায়া পর্যন্ত মাড়িয়ো না। মনে রেখো, জিনান কিন্তু ছুরি চালাতে ওস্তাদ।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, ভাই,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'তোমরা যা বলো। আমি আর কোনও বিপদে পড়তে চাই না।'

'বেশ। এবার বিদায় হও, তা না হলে আমিই হয়তো বমি করে ফেলব!'

আবার দাঁড়াল রানা। কিন্তু এবারও পা দুটো ভাঁজ হয়ে গেল। সিটে বসে পড়তে বাধ্য হলো ও। 'আমার পা...কাজ করছে না! বড় বেশি মেরেছ তোমরা। তা ছাড়া, এবার সত্যি আমি বমি করে ফেলছি।' মাথা নিচু করে মুখ খুলল, গলা থেকে খক খক আওয়াজ বেরুচ্ছে।

ব্যাং চিকে চিনা ভাষায় অভিশাপ দিতে শুনল রানা। আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখল তাড়াতাড়ি সাইলেন্সার খুলে পিস্তলটা

শোল্ডার হোলস্টারে গুঁজে রাখল সে। 'ধরো শালাকে,' জিনানকে বলল। 'এসো, বেজন্মাটাকে করিডরে বের করে দিই—বাইরে গিয়ে যা খুশি করুক।'

ওর দু'পাশে দাঁড়িয়েছে ব্যাং চি আর জিনান। কর্কশ দু'জোড়া হাত রানার কোমরের বেল্ট সহ ট্রাউজারের কিনারা খামচে ধরল। তারা ওকে তুলছে, হাঁটু দুটো নিস্তেজ করে রাখল রানা।

'জলদি!' বলল ব্যাং চি। 'কুত্তাটা এখনই বমি করে দেবে।'

বেল্ট আর ট্রাউজার ছেড়ে দু'দিক থেকে রানার দুই বগলের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিল ব্যাং চি আর জিনান, ওকে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে।

ল্যাগব্যাগ করে পা ফেলছে রানা, হাত দুটো শরীরের দু'পাশে মরা সাপের মত ঝুলিয়ে দিয়েছে। আর চার ফুট, তারপরেই—'

এখন!

মুহূর্তে ইস্পাতে পরিণত হলো রানার শরীর। লাফ দিল ও সামনে। ব্যাং চি আর জিনান মনে করল, পড়ে যাচ্ছে রানা মুখ থুবড়ে। ওর বগল তলা থেকে হাত ছুটে যাচ্ছে দেখে সামনে ঝুঁকল ভাল করে ধরবার জন্য। দুই হাতে কারাতের উল্টো কোপ চালাল রানা পিছন দিকে। মাপা মার। দুই হাতের কিনারা প্রচণ্ড জোরে লাগল ওদের কণ্ঠায়, ঠিক জায়গামতই। আচমকা আঘাতে আঁৎকে উঠল দুই বীর পালোয়ান। যখন দেখল দম নিতে পারছে না, দু'হাত চলে গেল ওদের গলার কাছে। এবার ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রথম লাথিতে ফাটিয়ে দিল রানা কুস্তিগিরের দু'পায়ের ফাঁকে ঝুলন্ত জিনিসটা, দ্বিতীয় লাথিতে ভচকে গেল মুষ্টিযোদ্ধার নাক-মুখ, কড়াৎ শব্দে ভাঙল সামনের তিন দু'গুণে ছ'টা দাঁত। প্রথমজন পড়ল উপুড় হয়ে—দম নিতে না পেরে ছটফট করছে মৃত্যুযন্ত্রণায়; আর দ্বিতীয়জন ধড়াস করে

পড়ল চিত হয়ে। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর কুতকুতে চোখজোড়া। নিষ্ঠুর একটুকরো হাসি ফুটে উঠল রানার মুখে, তারপর লাথির পর লাথি মেরে দুজনের পাঁজরের সবকটা হাড় ভেঙে একটা পা তুলে দিল পিস্তলবাজ বক্সারের গলায়। মুড়মুড় করে ভাঙল কণ্ঠনালীর নরম হাড়। হাঁ হয়ে আছে ওর মুখ, কষা বেয়ে নামছে রক্তের ধারা, দুই চোখ বিস্ফারিত। আধ মিনিটের মধ্যেই নিস্তেজ হতে হতে স্থির হয়ে গেল বীর মুষ্টিযোদ্ধার চোখ দুটো, দৃষ্টি নেই আর সে-চোখে। কুস্তিগির মারা গেছে আগেই।

জিনানকে জানালার ধারে টেনে এনে ব্যাং চির পাশে ফেলল রানা। বুকে কান ঠেকিয়ে দু'জনের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিল। জিনানের ছুরিটা এবার গেঁথে দিল ও মৃত ব্যাং চির বুকে, ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর।

এইবার খুলল বাইরের দিকের জানালা। হু-হু করে রাতের ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে কামরায়, সেই সঙ্গে কুয়াশাও। নাটকটা এমন ভাবে সাজাতে চাইছে, যেন কোনও কারণে ঝগড়া ও মারপিট বাধিয়ে জিনানের কণ্ঠনালী গুঁড়িয়ে দিয়েছে মুষ্টিযোদ্ধা ব্যাং চি। মারা গেছে মনে করে যখন ওকে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিতে গেছে, প্রথমে ছুরির বাঁট দিয়ে প্রথমে দাঁত ভেঙেছে জিনান ব্যাং চির, তারপর বুকে ছুরি ঢুকিয়ে খুন করেছে ওকে। একে অপরকে হত্যা করে জানালা দিয়ে বাইরে পড়েছে দুজনেই।

দু'হাতের তালু থেকে ধুলো ঝাড়তে যাবে রানা, ঠিক এই সময় কমপার্টমেন্টের দরজায় নক হলো আবার। 'আমি পোর্টার, সার। থোনজে। দরজা খুলুন, লাগেজ নিতে এসেছি, সার।'

ঝট্ করে চোখ তুলে জানালার দিকে তাকাল রানা। দেখল, কালো একটা ব্লক সিগনালকে পাশ কাটাচ্ছে ট্রেন। সেরেছে! এরইমধ্যে স্টেশনের সীমানায় ঢুকে পড়েছে ওরা। 'একটু দেরি হবে,' বন্ধ দরজার দিকে চোখ রেখে গলা চড়িয়ে বলল ও।

'এখন যাও তুমি, পাঁচ মিনিট পরে এসো। মোটা বকশিশ পাবে। এখানে এক ভদ্রমহিলার প্রাইভেসির ব্যাপার, বুঝলে?'

'ওহ্-হো, সরি, সরি! ভদ্রমহিলা? বুঝতে পেরেছি, সার! বিরক্ত করার জন্যে মাফ চাই, সার।'

শিস দিতে দিতে করিডর ধরে চলে গেল পোর্টার, রানার মাথাও ঝড়ের বেগে কাজ শুরু করল। সুইচ আর পয়েন্টের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় ট্রেন এখন ঝনাৎ ঝনাৎ ধাতব আওয়াজ করছে, দ্রুত একের পর এক পাশ কাটাচ্ছে সিগনাল বাতিকে।

ধ্যাৎ! ভাবল রানা। ও চেয়েছিল খোলা প্রান্তরে কোথাও ফেলে দেবে লোকগুলোকে, তা হলে হয়তো দিন কয়েক দেখতে পেত না কেউ। কিন্তু এখন আর সে-সুযোগ নেই।

না, ট্রেনে ফেলে রাখাও উচিত হবে না। ওদেরকে আবিষ্কার করামাত্র ট্রেন থামিয়ে পুলিশ ডাকা হবে।

সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা ফ্রেইট কার-এর পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে ওরা। ওদের ট্রেনের গতি দ্রুত কমে আসছে। আধ মাইল দূরে মেঘের গায়ে উজ্জ্বল একটা আলো দেখে রানা ধরে নিল ওখানেই স্টেশন। কাজটা ওকে হাত চালিয়ে করতে হবে।

প্রথমে জিনানকে বাইরে ছুঁড়ে দিল ও, চেষ্টা করল যাতে একজোড়া ফ্রেইট কারের মাঝখানে পড়ে লাশটা।

এরপর ব্যাং চি। টকটকে লাল হয়ে আছে ওর খোলা চোখ। তবে সেই চোখে মরা মানুষের দৃষ্টি।

কাজেই নিশ্চিন্ত মনে তাকেও জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল রানা। তবে এটাও দুই ফ্রেইট কারের মাঝখানে পড়ল কি না বোঝা গেল না অন্ধকারে। শরীরটার পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল ব্যাগ-ব্যাগেজ সহ টুকিটাকি আরও অনেক কিছু। কমপার্টমেন্ট একরকম খালি করে ফেলল ও। পোর্টার, অ্যাটেনড্যান্ট আর চেকাররা খালি কামরার রহস্য ভেদ করুক। এক সময় কেসটা বার্মিজ পুলিশের হাতে চলে যাবে।

টয়লেট থেকে নাক-মুখের রক্ত ধুয়ে জামা-কাপড়-চুল ঠিক করে বেরিয়ে এল রানা। শেষ একবার কমপার্টমেন্টে চোখ বুলাল ও। এমন কিছু ফেলে যাচ্ছে না, যার সাহায্যে এখানে ওর উপস্থিতি প্রমাণ করা যেতে পারে।

দরজার কবাটে কান ঠেকাল। কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। তালা খুলে বেরিয়ে এল করিডরে। কেউ নেই কোথাও। দরজায় তালা না মেরে ভিড়িয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিল ও, যাতে পাঁচ মিনিট পর পোর্টার এসে দেখে, তার সাহায্য ছাড়াই বেরিয়ে পড়েছে প্যাসেঞ্জাররা। একটা ভেস্টিবিউল থেকে কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে, শব্দ শুনে বোঝা গেল একটার উপর একটা চাপিয়ে স্তূপ করা হচ্ছে সুটকেস।

রানার কমপার্টমেন্টটা উল্টোদিকে। রওনা হলো সেদিকে, আরবী গানের একটা সুর ভাঁজছে। কোনও সমস্যা ছাড়াই পরবর্তী কার-এ ঢুকে পড়ল ও। যাক, কারও চোখে ধরা না পড়ে নিরাপদ জায়গায় ফিরে আসতে পেরেছে।

ধীরে ধীরে থোনজে স্টেশনে থামল গোল্ডেন এক্সপ্রেস। নিজের কমপার্টমেন্টে রয়েছে রানা, একটা চুরুট ধরিয়ে জানালার ধারে বসল। হাতে শ্যাম্পেনের ছোট একটা গ্লাস।

আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে নিজেকে বলে রাখল, প্রোমে পৌঁছাবার আগেই কোনও একটা স্টেশনে নেমে হয় একটা ছাতা নয়তো রেইনকোট কিনতে হবে।

রাতের স্টেশন হকাররা ঘুরে-ফিরে বার্মিজ পিঠা আর কমলালেবু বিক্রি করছে। কেউই প্রায় ট্রেন থেকে নামল না বা উঠল না। তিন মিনিট পর আবার রওনা হলো ওরা।

লাশ দুটো খুব তাড়াতাড়িই কেউ না কেউ দেখতে পাবে, ভাবল রানা। সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু হবে, এবং পুলিশ বুঝতে পারবে গোল্ডেন এক্সপ্রেস থেকেই ফেলা হয়েছে তাদেরকে। খবরটা ছাপা হবে কাগজে। ব্যাং চি আর জিনানের কর্তা তুং শান

মিলিয়ে নেবে দুয়ে দুয়ে চার।

এখন কাজে গতি আনা দরকার। দরকার পাল্টা আঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকা। তুং শানের আরও দুজন ব্যাকআপ আছে ট্রেনে।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে ব্যাগটা খুলল রানা। স্থির করেছে, এখন থেকে অস্ত্রগুলো সঙ্গে রাখবে।

সাত

পরদিন সকাল দশটা। প্রোম রেল স্টেশন।

চারদিকে ঘন কুয়াশা, তার মধ্যে টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে।

পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত রেইনকোটে ঢাকা, এক হাতে রিট্র্যাক্টেবল্ ওয়াকিং স্টিক, আরেক হাতে ব্রিফকেস, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, সামান্য খুঁড়িয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে এল প্রবীণ এক বার্মিজ।

তাড়াতাড়ি একটু সরে দাঁড়াল বৃদ্ধ, কারণ তার পিছু নিয়ে সুরাইয়া আর ওর দুই নতুন গার্ডও ট্রেন থেকে নামছে। আড়চোখে তাদেরকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে সে। এই দুই গার্ডও ব্যাং চি আর জিনানের মতই প্রকাণ্ডদেহী। সুরাইয়ার মাথায় ছাতা ধরেছে যে লোকটা, তাকে আগেও দু'একবার দেখেছে সে ট্রেনে। দুজনেই ব্যাং চি আর জিনানের মত ট্রেঞ্চ কোট পরে আছে।

জরির কাজ করা ঝলমলে সারং আর ব্লাউজ পরেছে সুরাইয়া।

দ্বিতীয় গার্ড আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ওদের পিছু নিয়ে হাঁটছে, ঘাড় ফিরিয়ে বারবার পিছনদিকে তাকাচ্ছে সে। প্রবীণ লোকটা তাদের কাছাকাছিই রয়েছে, তবে ওকে দেখে তাদের কোনও মধ্যে প্রতিক্রিয়া হলো না।

ট্রেন প্রোমে থামার ঘণ্টাখানেক আগে নিজের চেহারা বদলে বুড়োমানুষ সেজেছে রানা, ফলে খুব কাছ থেকে দেখেও ওকে চিনতে পারছে না সুরাইয়া।

দুজন সঙ্গী ট্রেন থেকে বেমালুম গায়েব হয়ে যাওয়ায় বাকি দুজন গার্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছে। পাহারা দেওয়ার ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে সুরাইয়ার নিরাপত্তার ব্যাপারেই বেশি চিন্তিত তারা।

এটা তাদের বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় যে ব্যাং চি আর জিনানকে সরিয়ে দিয়েছে কেউ। দুই গার্ডই অত্যন্ত সতর্ক, সারাক্ষণ চোখ বুলাচ্ছে চারপাশে, যেন ভাবছে তাদেরকে সরাবার জন্যও ফিরে আসতে পারে সে।

স্টেশন থেকে না বেরিয়ে নিউজ স্ট্যান্ডে দাঁড়াল রানা। একটা ইংরেজি দৈনিক কিনে নাড়াচাড়া করছে। আসলে ওটার আড়ালে মুখ ঢেকে একটা কাফের উপর নজর রাখছে। সুরাইয়াকে নিয়ে ওই কাফেতে ঢুকেছে গার্ড দুজন।

জানালা দিয়ে কাফের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছে রানা, একটা পে বুদে ঢুকে গার্ডদের একজন কথা বলছে টেলিফোনে। সন্দেহ নেই পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছে তুং শানকে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর কাফে থেকে বেরুল তারা। প্রথমে বেরুল একজন গার্ড, কাফের দোরগোড়া আগলে এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল সে, চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে পথ ছাড়ল। তার পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল সুরাইয়া, দ্বিতীয় গার্ড ওর মাথায় ছাতা ধরে আছে। দ্রুত, তবে সতর্কতার সঙ্গে, স্টেশন

থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা।

দুই মিনিট পর রানাও বেরিয়ে এল, দাঁড়াল ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। দেখল রাস্তার ওপারের একটা রেন্ট-আ-কার কোম্পানি থেকে সাদা মার্সিডিজ ভাড়া করছে সুরাইয়ার গার্ডরা।

সুরাইয়াকে দেখে শান্ত মনে হলেও, ওর মনের ভিতর কী চলছে আন্দাজ করতে পারছে রানা। ব্যাং চি আর জিনানকে দেখতে না পেয়ে ওর মনেও নিশ্চয় প্রশ্ন জাগছে। নতুন গার্ডরাও কি আর ওকে জেরা করেনি!

আসল বিপদটা সামনে—আস্তানায় পৌঁছানো মাত্র তুং শান নিজে জেরা করবে সুরাইয়াকে—ব্যাং চি আর জিনান কোথায়? ওকে পাহারা দিচ্ছিল, কাজেই ওরই তো জানবার কথা কী হয়েছে তাদের।

আবার এমনও হতে পারে যে সুরাইয়াকে তারা কেউ কোনও প্রশ্নই করবে না। কারণ ওকে সন্দেহ করবার কোনও কারণ তো নেই।

লাইনের প্রথম ট্যাক্সিটায় উঠল রানা। 'আমার মক্কেলরা জানে কোথায় যাচ্ছি, কাজেই ওদের সঙ্গে থাকো,' ড্রাইভারকে রাস্তার ওপারের সাদা মার্সিডিজটা দেখিয়ে দিল। ইতোমধ্যে চলতে শুরু করেছে সেটা।

মাথা ঝাঁকিয়ে মার্সিডিজের পিছু নিল ড্রাইভার। ব্যাকসিটে হেলান দিল রানা। আপাতত অবসর, কাজেই মনের কানাচে জমে থাকা রহস্যময় প্রশ্ন আর সমস্যা আবার উঁকি-ঝুঁকি মারছে।

বাংলাদেশী জঙ্গি নেতারা সীমান্ত পার হয়ে মায়ানমারের আরাকান রাজ্যে জড়ো হচ্ছে।

সন্দেহভাজন সাধারণ জঙ্গিরা ঢাকা ছেড়ে গ্রামের দিকে সরে যাচ্ছে সপরিবারে। কারণ অজ্ঞাত।

সাতটা জঙ্গি সংগঠনের তরফ থেকে সালাউদ্দিন শাহ কুতুব বাংলাদেশী কারেন্সিতে প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা রিসিভ

করেছে। টাকাটা তাকে দেওয়া হয়েছে আল-কায়েদার মাধ্যমে। দাতারা মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা দেশের ধনাঢ্য নাগরিক।

দশ হাজার কোটি টাকা দিয়ে একটা কেন, অনেক দেশেরই অনেক ক্ষতি করা যায়। ওই টাকার অর্ধেক, অর্থাৎ পাঁচ হাজার কোটি টাকা জমা পড়েছে সিঙ্গাপুরের একটা ব্যাংকে—তুং শানের অ্যাকাউন্টে। এর তাৎপর্য কী?

কে এই তুং শান? এত টাকা দিয়ে ওর কাছ থেকে কী কিনছে জঙ্গিরা? কী করবে তা দিয়ে?

এতসব তৎপরতার সঙ্গে ভারতের ডুবে যাওয়া ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিনের কি কোনও সম্পর্ক আছে?

বৃষ্টি আর কুয়াশার মধ্যে ধীরে ধীরে বাঁক ঘুরছে সাদা মার্সিডিজ। পকেট থেকে ভাঁজ করা আঞ্চলিক ম্যাপটা বের করে চোখ বুলাল রানা। এই রাস্তায় ভাল কোনও হোটেল পড়বে না, বড় কোনও শপিং মল নেই, নেই এয়ারপোর্ট কিংবা স্টিমার ঘাটও।

'বোধহয় বুঝতে পারছি কোথায় যাচ্ছে ওরা,' হঠাৎ হেসে উঠে ড্রাইভারকে বলল রানা। 'ভাবছি তুমি কি আমাকে ওদের আগে ওখানে পৌঁছে দিতে পারবে? দুশ' কিয়েত বকশিশ পেলে?'

প্রবল আগ্রহে সিটের উপর নড়েচড়ে বসল ড্রাইভার। 'আপনি শুধু জায়গাটার নাম বলুন, সার, তারপর দেখুন কেমন উড়িয়ে নিয়ে যাই।'

'স্কাই ট্যুর অ্যান্ড গাইড সার্ভিস,' সিটি ম্যাপ থেকে চোখ তুলে বলল রানা।

দুর্যোগময় আবহাওয়া, তবে জানে প্যাসেঞ্জার আপত্তি করবে না, ট্যাক্সিটাকে একরকম উড়িয়েই নিয়ে যাচ্ছে ড্রাইভার। দ্বিতীয় বাঁকে সাদা মার্সিডিজকে পাশ কাটাল সে। আরও ছয় মাইল ছোটার পর একটা বেসরকারী হেলিপ্যাডের সামনে ট্যাক্সি

থামাল, সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে—'স্কাই ট্যুর অ্যান্ড গাইড সার্ভিস'।

ভিতরে ঢুকে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল রানা। টিকিট কাটার আগে জরুরি কিছু তথ্য জেনে নিতে ভুল করল না—প্রোম থেকে সিতওয়ে-প্রপার হয়ে থানথামা, থানথামা থেকে সিতওয়ে-প্রপার হয়ে প্রোম, এই রুটে কপ্টার সার্ভিস চালানো হয় দুপুর দুটো পর্যন্ত; অন্যান্য রুটের সার্ভিস শুরু হবে বেলা দুটোর পর; প্রতি ট্রিপে বিশজনকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, যাত্রীর সংখ্যা কমপক্ষে পাঁচজন না হলে কপ্টার উড়বে না। তবে আজ এরইমধ্যে বারোটা টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। আর আধ ঘণ্টা পর ছাড়বে কপ্টার।

রানা ভাবল, বেলা দুটোর পর কোথাও যেতে চাইলে গার্ডরা এত তাড়াতাড়ি সুরাইয়াকে নিয়ে এখানে আসত না। টিকেট কাউন্টারের মেয়েটাকে প্রশ্ন করে জেনে নিল, তাদের কপ্টারের শেষ গন্তব্য থানথামা পয়েন্ট একটা রিসর্ট শহর।

টিকিট কাটার পর রানার মনে হলো, সুরাইয়াকে নিয়ে এখানেই আসছে গার্ডরা, ওর এই ধারণা ভুলও হতে পারে। সেক্ষেত্রে আবার ওদেরকে খুঁজে বের করাটা সহজ হবে না।

টিকিট পকেটে রেখে টেলিফোন বুদে ঢুকল রানা, ডায়াল করল ওর এজেন্সির সিতওয়ে শাখার নম্বরে। কণ্ঠস্বরই ওকে বলে দিল অপরপ্রান্তে শাখাপ্রধান শাহিন সিরাজ রিসিভার তুলেছে।

কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে সে-সম্পর্কে একটা ধারণা দিল রানা, যোগাযোগ কেটে দেওয়ার আগে নির্দেশ দিল সিরাজকে কী করতে হবে।

টেলিফোন বুদ থেকে বেরিয়ে হেলিপ্যাডে চলে এল রানা। দেখল সাদা-কালো রঙের বিরাট একটা হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে। দরজা খোলা, পাশেই বার্মিজ স্টুয়ার্ডেস আর পাইলট

দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদেরকে টিকিটটা একবার দেখিয়ে কপ্টারে চড়ল ও।

প্যাসেঞ্জারদের উপর চোখ বুলাতেই বুঝল সবাই তারা গোল্ডেন এক্সপ্রেস থেকে এসেছে। তাদের মধ্যে মাত্র দুজন স্থানীয়, পাঁচজন ইউরোপিয়ান তরুণ-তরুণী, একটা চিনা দম্পতি, একজন করে নেপালি, থাই আর সম্ভবত মঙ্গোলিয়ান—শুধু শেষ তিনজনের বয়স একটু বেশি।

রানা তাদেরকে ঠিকই চিনতে পারছে, তবে ছদ্মবেশ থাকায় তাদের কারও ওকে চিনতে পারার কথা নয়। বারোজনের কেউই ওকে বিশেষ ভাবে লক্ষ করছে না। এদের মধ্যে তুং শানের চর থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিল ও।

পিছন দিকের একটা সিটে বসল।

পনের মিনিট পর জানালা দিয়ে সুরাইয়াকে দেখতে পেল রানা, গার্ডদের সঙ্গে হেলিপ্যাডের দিকে এগিয়ে আসছে।

কপ্টারে উঠে প্যাসেঞ্জারদের উপর চোখ বুলাল গার্ডরা, নিশ্চয় অনেককে চিনতেও পারল, তবে কারও মধ্যেই বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়া হতে দেখা গেল না। সামনের দিকে বসল ওরা।

দশ মিনিট পর আকাশে উঠে পড়ল হেলিকপ্টার।

চল্লিশ মিনিটের যাত্রা। আকাশে ওঠার দশ মিনিটের মধ্যেই বিস্কিট আর কফি পরিবেশন করল বার্মিজ স্টুয়ার্ডেস। সঙ্গে একটা করে ট্যুর গাইড। কেউ চাইলে বার্মিজ চুরুটও পেতে পারে।

ট্যুর গাইডে চোখ বুলিয়ে রানা দেখল থানথামাতে বেশ কয়েকটা আন্তর্জাতিক মানের হোটেল রয়েছে, তার মধ্যে একটা অন্তত ফাইভ স্টার। বিদেশিদের জন্য আলাদা সৈকত। জেটিতে পাওয়া যায় ডিপ সি ফিশিং-এর জন্য ছোট-বড় নানা ধরনের মোটর বোট।

আরও চল্লিশ মিনিট পর সুরাইয়াকে নিয়ে থানথামা শেরাটনে উঠল গার্ড দুজন। ওদের পিছু নিয়ে রানাও পৌঁছেছে এখানে। ও ঠিক বুঝতে পারছে না এই রিসর্ট শহরে এসে হোটেলে কেন উঠল তারা। তারপর হঠাৎ করেই একটা চিন্তা খেলে গেল ওর মাথায়।

গার্ডদের ফলো করা হচ্ছে, এটা জানার পর তুং শান হয়তো সুরাইয়াকে এক্ষুনি নিজের আস্তানায় নিয়ে যেতে চাইছে না। নিশ্চয়ই তার নির্দেশেই হোটেলে তোলা হয়েছে ওকে।

সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও খোঁজ-খবর নেবে তুং শান। তারপর হয়তো, নিরাপদ বলে মনে করলে, ফুর্তি করবার জন্য থানথামা শেরাটনে নিজেই চলে আসবে। দু'চার ঘণ্টা বা খুব বেশি হলে এক রাত থেকে আবার ফিরে যাবে নিজের গোপন আস্তানায়।

অপেক্ষা করতে হবে রানাকে। ওকে হয়তো সুরাইয়ার বদলে খোদ শয়তানটাকে অনুসরণ করতে হবে।

চিন্তা-ভাবনায় ত্রুটি দেখে নিজেকে তিরস্কার করল রানা।

সুরাইয়াকে ফলো করে তুং শানের আস্তানা চিনে নেবে, ওর প্ল্যানটা ছিল এরকম। এখন যদি সুরাইয়ার কাছে নিজেই চলে আসে শয়তানটা, তার পিছু নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই ওর প্রয়োজন এখানেই তাকে কাবু করা। তারপর জেনে নেওয়া পাঁচ হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে জঙ্গিদেরকে কী দিয়েছে সে।

কাজটা অবশ্য সহজ হবে না।

সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র আছে, তবে চেহারা আর কথাবার্তায় বার্মিজ মনে হওয়ায় সে-সব আর বের করবার দরকার হলো না। একদিনের ভাড়া অগ্রিম দিয়ে হোটেলে নাম রেজিস্ট্রি করল রানা, কাউন্টার থেকে স্যুইটের চাবি নিল, তারপর ব্রিফকেস ও চাবিটা পোর্টারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা নিয়ে যাও, আমি আসছি।'

*

একটা পে বুদে ঢুকল রানা। এবার ডায়াল করল শাহিন সিরাজের মোবাইল নম্বরে।

'দুই ঘণ্টার মধ্যে থানথামায় পৌঁছাচ্ছি, মাসুদ ভাই।'

'গুড,' বলল রানা। ওকে কী করতে হবে সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল।

টেলিফোন বুদ থেকে বেরিয়ে এসে এলিভেটরে চড়ল ও। ইতিমধ্যে গা থেকে রেইনকোট খুলে ভাঁজ করা বাম হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছে। ওই হাতেই ওয়াকিং স্টিকটা ছিল, সেটা এই মুহূর্তে মাত্র আধ হাত লম্বা, জায়গা করে নিয়েছে বার্মিজ লুঙ্গির পকেটে।

নিজের স্যুইট নয় তলায় হলেও, সাততলায় নামল রানা। নাম রেজিস্ট্রি করবার সময় খাতাটায় চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়েছে সুরাইয়া আর গার্ডদের কামরা দুটো সাততলায়। সুরাইয়ার কামরার নম্বর একশ' বারো, ওটার পাশে একশ' চোদ্দো নম্বরে উঠেছে গার্ডরা।

সুরাইয়ার জন্য চিন্তা হচ্ছে রানার। হোক ট্রেনিং পাওয়া বিসিআই এজেন্ট, স্লিপার হওয়ায় বহুদিন ধরে অ্যাকটিভ নয়—ফিল্ডে এটাই ওর প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট। হঠাৎ নার্ভাস হয়ে পড়তে পারে মেয়েটা। তারচেয়ে বড় ভয়, তুং শানের নির্দেশ পেয়ে সুরাইয়াকে টরচার করবার জন্য হোটেলে তোলা হয়নি তো? রানার ধারণা, সেটাও অসম্ভব নয়।

ব্যাং চি আর জিনানের কী হয়েছে বলো, তা না হলে রেপ করার পর জবাই করে ফেলে রেখে যাব—গার্ডরা এরকম হুমকি দিতে পারে।

সেরকম কিছু হতে যাচ্ছে বুঝতে পারলে অবশ্যই ওর প্রথম কাজ হবে সুরাইয়াকে রক্ষা করা, ভাবল রানা। অ্যাসাইনমেন্টের ভবিষ্যৎ? সেটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে।

নির্জন করিডর ধরে নিঃশব্দ পায়ে এগোচ্ছে রানা। একশ বারো নম্বর কামরার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। এটা সুরাইয়ার কামরা। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল—না, ভিতর থেকে কোনও শব্দ আসছে না।

করিডরের দুদিক আরেকবার দেখে নিল রানা, ইচ্ছে কবাটের গায়ে কান ঠেকাবে। দুদিকেই সিঁড়ি আর এলিভেটর রয়েছে। কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

কবাটের দিকে মাথাটা কাত করতে যাচ্ছে রানা, খুট করে এক শব্দ হতে স্থির হয়ে গেল। পাশের কামরার দরজা খুলে করিডরে পা রাখল গার্ডদের একজন।

কামরা থেকে বেরোবার সময় বামদিকে তাকিয়ে ছিল লোকটা, তা না হলে দেখতে পেত সুরাইয়ার কামরার দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা।

যেন হাঁটার মধ্যেই আছে, এরকম একটা ভান করে তাকে পাশ কাটাল রানা। কঠিন চোখে ওকে দেখছে গার্ড। সন্দেহ হয়েছে তার।

হওয়ারই কথা। প্রবীণ হলেই বা কী, সেই প্রোম স্টেশন থেকে যেখানেই যাচ্ছে তারা সেখানেই এই লোকটাকে আশপাশে ঘুর ঘুর করতে দেখছে—ব্যাপারটা কী?

পিঠে গরম আঁচ অনুভব করছে রানা, জানে প্রকাণ্ডদেহী গার্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওখানে। ওর সারা শরীর আশঙ্কায় আড়ষ্ট হয়ে উঠল, এই বোধহয় থামতে বলল ওকে।

তারপর শুনতে পেল। ভারী পায়ের আওয়াজ। ওর পিছু নিয়ে এগিয়ে আসছে।

এক মুহূর্ত পর ফিসফিস আওয়াজ ঢুকল রানার কানে। অস্পষ্ট স্বরে কথা বলছে কেউ।

তারপর মনে পড়ল ওর। দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে এল গার্ড, কিন্তু তারপর দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হয়নি। খোলা

দরজার পাশ দিয়ে আসবার সময় ভিতরে তাকায়নি ও, ফলে জানা হয়নি দ্বিতীয় গার্ড কোথায় ছিল।

কান পাতল রানা। হ্যাঁ, দু'জোড়া জুতোর আওয়াজ।

নিশ্চয় দরজার কাছাকাছি কোথাও ছিল দ্বিতীয় গার্ড। রানাকে করিডর ধরে এগোতে দেখেছে সে। তারপর সঙ্গীর ইঙ্গিত পেয়ে বেরিয়ে এসেছে করিডরে। এই মুহূর্তে ব্যাং চি আর জিনানের সম্ভাব্য খুনিকে অনুসরণ করছে তারা, সেই ফাঁকে নিচু গলায় কথা বলছে পরস্পরের সঙ্গে।

কী বলছে রানা শুনতে পাচ্ছে না। তবে খেয়াল করল, পায়ের আওয়াজ দ্রুত নয়, তাই একেবারে কাছে চলে আসছে না। অর্থাৎ কী ভেবে কে জানে খানিকটা দূরত্ব বজায় রাখছে তারা।

সামনে এলিভেটর। ওটার দিকে চোখ পড়তেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার। গার্ড দুজন কী প্ল্যান করেছে আন্দাজ করতে পারল ও।

পেশাদার খুনিরা সাধারণত হোটেলের করিডরে কাউকে খুন করে না। খুন করবার জন্য আদর্শ জায়গা হলো এলিভেটর।

হাঁটা থামায়নি, ডান হাত দিয়ে বেল্টের সঙ্গে সংযুক্ত প্যান্টের ভিতরের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করল রানা। হাতবদল হওয়ার পর রেইনকোটের আড়ালে ঢাকা পড়ল বাম হাতে ধরা অস্ত্রটা। এরপর অভিনয় শুরু করল রানা, করিডরের দু'পাশে কবাটের মাথায় লেখা নম্বরগুলো খুঁটিয়ে দেখছে।

আরও দশ সেকেন্ড পর, এলিভেটর ও সিঁড়ি যখন কাছে চলে এসেছে, হঠাৎ ঘুরে লোক দুজনের মুখোমুখি হলো ও। 'আচ্ছা বলতে পারেন,' বার্মিজ ভাষায় জানতে চাইল, চশমার উপর দিয়ে পালা করে গার্ডদের দিকে তাকাচ্ছে, 'দুশ' দশ নম্বর স্যুইটটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না কেন?' পরিষ্কার কিছু দেখেনি, তবে ওর সন্দেহ হলো দুজনের হাতেই কিছু আছে—তা না হলে

একটা করে হাত তারা ঝট করে পিছনে লুকাল কেন?

হয় তারা ভাষাটা বোঝে না, কিংবা ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে থাকল। ধীরে ধীরে পরস্পরের দিকে তাকাল তারা, তারপর রানার দিকে ফিরে দুজনই একযোগে বেসুরো গলায় হেসে উঠল।

'দুশ' দশ সাততলায় কীভাবে পাবেন,' কর্কশ হাসি থামিয়ে চিনা দৈত্যদের একজন বলল, 'ওটা তো নয় কি দশতলায় হওয়ার কথা।'

'আপনারা বলছেন এটা দশতলা?' অবাক হওয়ার ভান করল রানা।

'আপনি সাততলায় ঘুর ঘুর করছেন,' কঠিন সুরে বলল দ্বিতীয় দৈত্য। 'উদ্দেশ্যটা কী, বলুন তো!'

'আটশ'? না-না, আটশ' হবে কেন! আমার স্যুইটের নম্বর দুশ' দশ।'

'দেং পি, এ কী রে!' চিনা দানবদের একজন বিড়বিড় করল।

'আয়, শালার শরীরে খানিকটা এইডস ভাইরাস ঢুকিয়ে দিই,' চিনা ভাষায় বলল দ্বিতীয় দানব।

'কী?' চোখ-মুখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'হিয়ারিং এইডটা? সত্যি দুঃখিত, ব্রিফকেস থেকে বের করা হয়নি ওটা।'

'চল ফিরি, লী যান!' বিরক্ত হয়ে বলল দ্বিতীয় চিনা। 'এই ব্যাটা কানে বেশি শোনে।'

'নাকি অভিনয় করছে?' নিজের ভাষাতেই সন্দেহ প্রকাশ করল দেং পি। 'শোন, লী যান, লোকটার পিছু নিয়ে দেখে আসা উচিত আসলে কোথায় থাকে, ব্যাকআপ আছে কি না। আমার বিশ্বাস, ব্যাটা ছদ্মবেশী টিকটিকি, পেছনে লেগেছে—'

'কী বললেন?' আঁতকে উঠল রানা, কথা বলছে গলা চড়িয়ে। 'আপনারা পিছনে ছুরি লুকিয়ে রেখেছেন? কিন্তু কেন?'

পরিষ্কার টের পেল রানা, দুই চিনা যে যার শিরদাঁড়ার কাছে কিছু একটা গুঁজে রাখল। কী কারণে যেন হঠাৎ সাবধান হয়ে গেছে তারা। কারণটা একটু পর বুঝতে পারল রানা।

'লী যান!' দাঁতে দাঁত চাপল দেং পি, রানার মাথার উপর দিয়ে আরও সামনে তাকিয়ে আছে সে। 'আপদ বিদায় কর, তা না হলে বিপদ ডেকে আনবে।' পরমুহূর্তে হাত দুটো রানাকে দেখাল সে। 'কই, কোথায় ছুরি?'

'কই, কোথায়?' লী যানও তার খালি হাত দুটো দেখাচ্ছে রানাকে।

এক গাল হাসল রানা। 'তা হলে আমি ভুল শুনেছি, বাপ। ঠিক আছে, আমার স্যুইটটা এবার দেখিয়ে দাও আমাকে।'

'ওকে বলুন, দেখিয়ে দেবে,' বলে এলিভেটরের দিকে চিবুক তাক করল দেং পি।

পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল রানা। দেখল হোটেলের ইউনিফর্ম পরা একজন পোর্টার করিডর ধরে এগিয়ে আসছে। 'ঠিক আছে। ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'এই, পোর্টার, দুশ' দশ নম্বরটা প্লিজ দেখিয়ে দাও আমাকে।' লক্ষ করল ঘুরে নিজেদের কামরার দিকে হাঁটা ধরেছে তুং শানের গার্ডরা।

'আসুন, সার,' রানার হাত থেকে ভাঁজ করা রেইনকোটটা নিতে গেল সে। 'সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই হবে।'

এক পা পিছাল রানা, পোর্টার যাতে রেইনকোটটার নাগাল না পায়। 'না, আমি এলিভেটরে চড়তে ভয় পাই। সিঁড়ি বেয়ে উঠব।'

'আমি সেটাই বলছি, সার,' সবিনয়ে বলল গার্ড। 'আসুন।'

রানা লক্ষ করল, ওদের কথা শোনার জন্য আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে চিনা দানবরা। 'কী? তুমি যেটা বলবে সেটাই আমাকে শুনতে হবে?' পোর্টারের উদ্দেশে প্রায় গর্জে উঠল ও। 'ও হে, ছোকরা, তোমার স্পর্ধা তো কম নয় দেখছি! ম্যানেজারের কাছে

তোমার নামে আমি রিপোর্ট করব।' গজ গজ করছে, পোর্টারকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

নয়তলায় উঠে এসে দুশ' দশ নম্বর স্যুইটে ঢুকল রানা। কী হোলে চাবি ঝুলছে, পোর্টার চলে গেছে নিজের কাজে। দরজায় তালা দেওয়ার পর দেখল সিটিং রুমের একটা সোফার উপর ওর ব্রিফকেসটা রেখে গেছে পোর্টার।

রেইনকোট রেখে ব্রিফকেসটা নিল ও, বেডরুমে ঢুকে বিছানার উপর রাখল সেটা, তারপর হাতের পিস্তল চালান করে দিল বালিশের তলায়।

নিচু টেবিলে গাইড বুক সহ একটা টেলিফোন সেট রয়েছে, বিছানায় বসে গাইডটা উল্টেপাল্টে দেখল রানা, তারপর টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল একশ' বারো নম্বরে। সুরাইয়া কী অবস্থায় আছে জানা দরকার।

রিং হচ্ছে, কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছে না। আট-দশবার রিঙ হওয়ার পর ভাবল, চিনা দুজন ওকে বেঁধে রেখেছে বেডের সঙ্গে? কানেকশন কেটে দিয়ে একটু পর আবার রিঙ করল।

এবারও কেউ ধরছে না।

কী করা উচিত ভাবছে রানা। ছদ্মবেশ পাল্টে নিজে আরেকবার যাবে, নাকি হোটেলের সিকিউরিটিকে রিপোর্ট করবে?

হাতের কাজ ফেলে রাখা যায় না, হঠাৎ আবার বেরুতে হতে পারে ওকে। কাপড়চোপড় নিয়ে বাথরুমে ঢুকল। শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল, ছদ্মবেশ থেকে মুক্ত হয়ে আবার ফিরে পেল শেখ মোহাম্মদ আমিরুল ফরহাদ ইবনে আহাদের চেহারা ও বেশভূষা। এখন আবার চিবুকে শোভা পাচ্ছে ওর সৌদি দাড়ি-গোঁফ।

বেডরুমে ফিরে এসে হাতঘড়ি পরল রানা। প্রায় একটা

বাজতে চলেছে। দরজা বন্ধ করে ফোন করল রুম সার্ভিসকে। লাঞ্চের অর্ডার দিল—এখন থেকে ঠিক আধ ঘণ্টা পর একটা ট্রলিতে করে সিটিং রুমে পৌঁছে দিতে হবে; ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে গেলে যাবে, যখন উঠবে তখন খাবে।

তারপর আবার সুরাইয়ার নম্বরে ডায়াল করল। এবার একটু পরেই অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল কেউ। 'হ্যালো?' মিষ্টি নারীকণ্ঠ, চিনতে পারল রানা।

'ম্যাডাম সুরাইয়া জেবিন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইয়েস। আপনি কে বলছেন, প্লিজ?' স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর, কোনও রকম উদ্বেগ বা টেনশন আছে বলে মনে হচ্ছে না।

'হোটেলের সিকিউরিটি সেন্টার থেকে ফোন করছি, ম্যাডাম,' বলল ও। 'এর আগেও বেশ কবার রিঙ করেছি, কিন্তু আপনি...'

'দুঃখিত। শাওয়ারে ছিলাম, শুনতে পাইনি,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল সুরাইয়া। 'কী জন্যে ফোন করেছেন, প্লিজ?'

'কিছু না, এটা স্রেফ একটা রুটিন রিমাইন্ডার,' বলল রানা। 'সিকিউরিটি সেন্টারের ফোন নম্বরটা মনে রাখবেন: জিরো-নাইন-নাইন-নাইন। যখন যে সমস্যাই হোক, জানাতে ভুলবেন না, আমরা সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাব। আপনার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাই আমাদের দায়িত্ব।'

'ও, বুঝেছি। অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল সুরাইয়া। 'আর কিছু?'

'জী-না।'

রানা রিসিভার রেখে দিতে যাচ্ছে, এই সময় জিজ্ঞেস করল সুরাইয়া, 'আপনার নামটা যেন কী, প্লিজ?'

হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নিল রানা, মেয়েটাকে সাহস যোগানো দরকার, যাতে বুঝতে পারে বিসিআই ওকে একা ছেড়ে দেয়নি, ওর ওপর সারাক্ষণ নজর রাখা হচ্ছে। 'ফাইবারগ্লাস,' বিড়বিড় করল ও।

'খোদা!' ফিসফিস করে বলল সুরাইয়া, একইসঙ্গে বিস্ময়ের ধাক্কা আর উল্লাস অনুভব করছে। 'আপনি... কীভাবে... কোথায়...'

'ভয় পেয়ো না, আমরা তোমার আশপাশেই আছি,' বলল রানা। 'এক কথায় জবাব দাও। কোনও রকম বিপদ দেখতে পাচ্ছ?'

'না।'

'পরে দেখা হবে,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা। রিসিভার রেখে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল ওখানে, বুঝতে পারছে না কী কারণে অস্তস্তি বোধ করছে।

তারপর ব্যাপারটা উপলব্ধি করল। ঠিক অস্বস্তি নয়; অন্তরের গভীর কোনও প্রদেশে, অবচেতন মনে, একটা বিপদের আশঙ্কা জেগেছে: চিনা দৈত্যদের আসলে বোকা বানানো যায়নি, বরং সতর্ক করা হয়েছে; এরপর ব্যাং চি আর জিনানের খুনিকে ধরবার জন্য ফাঁদ পাতবে তারা।

ট্রেনে রাতটা পুরোপুরি নির্ঘুম কেটেছে, লাঞ্চ সেরে কাপড়চোপড় পরেই বিছানায় শুলো ও, বাইরের দরজায় তালা দিতে ভোলেনি। বেডরুমের দরজাতেও লাগিয়ে দিয়েছে ছিটকিনি ও হ্যাস্পবোল্ট।

সন্ধ্যার খানিক আগে টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল রানার। বিছানায় উঠে বসে রিসিভার তোলার সময় জানালার দিকে চোখ পড়ল। বৃষ্টি হচ্ছে না, তবে জানালার বাইরে গাঢ় কুয়াশা সাদাটে পাঁচিল তুলে রেখেছে, কিছুই চোখে পড়ছে না।

'হ্যালো?'

'মাসুদ ভাই, শাহিন সিরাজ। সুরাইয়াকে নিয়ে এই মাত্র এলিভেটর থেকে বেরুল দুই চিনা গার্ড। জেটিতে যাওয়ার জন্যে আগেই ট্যাক্সি ডাকা হয়েছে, কিন্তু খুব বেশি কুয়াশা দেখে ইতস্তত করছে।'

'এই প্রথম বেরুচ্ছে?' প্রশ্ন করল রানা।

'আপনি জানলেন কীভাবে?' বেশ অবাক হলো সিরাজ। 'না, তিনটের দিকে একা একবার বেরিয়েছিল ওদের একজন, এই তো আধ ঘণ্টা আগে ফিরেছে।'

'ঠিক আছে, আসছি আমি।' লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল রানা, বেসিনে দাঁড়িয়ে চোখে-মুখে পানি ছিটাল, তারপর ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় শেখ মোহাম্মদ আমিরুল ফরহাদ ইবনে আহাদকে খুঁটিয়ে একবার দেখে নিয়ে বেরিয়ে এল স্যুইট থেকে। ব্রিফকেসটা সঙ্গে নিচ্ছে, তবে এখন সেটার রঙ আগের মত কালো নয়।

হোটেলের লাউঞ্জে রানা আর সিরাজ পরস্পরকে দেখল, তবে কোনও রকম বাক্য বা ইশারা বিনিময় হলো না। হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে পৌঁছবার জন্য রীতিমত অন্ধের মত হাতড়াতে হলো রানাকে। চারদিকে নিশ্ছিদ্র মেঘের মতো ঝুলে আছে সাদাটে কুয়াশা।

এরকম আবহাওয়ায় সাগর বিপজ্জনক না? ভাবল রানা। তা হলে জেটিতে কী?

তিন মিনিটের পথ আসতে ড্রাইভার সময় নিল বারো মিনিট। তবে ট্যাক্সিতে থাকার সময়ই টের পেল রানা, ধীরে ধীরে হালকা হয়ে আসছে কুয়াশা।

জেটি থেকে খানিকটা দূরে থাকতে ট্যাক্সি ছাড়ল ও। পাকা রাস্তা এড়িয়ে, ওটার সঙ্গে সমান্তরাল একটা রেখা তৈরি করে সৈকত ধরে হন হন করে এগোল।

কুয়াশা কমছে ঠিকই, তবে দৃষ্টিসীমা খুব বেশি হলে মাত্র পঁচিশ গজ। সাবধানে হাঁটছে রানা, এখনও জেটি দেখা যাচ্ছে না, এই সময় সামনে থেকে একটা শক্তিশালী ইঞ্জিন স্টার্ট নেওয়ার আওয়াজ ভেসে এল।

রানার অভিজ্ঞ কান বলছে, ওটা কোনও ইয়ট হবে। হাঁটার

গতি বাড়িয়ে দিল ও। পঁচিশ-ত্রিশ গজের মধ্যে, রাস্তায় কিংবা সৈকতে, কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তবে সামনে থেকে বঙ্গোপসাগরের উচ্ছ্বাস, জলযানের ধাতব ঝঙ্কার, মাঝি-মাল্লাদের দু'একটা হাঁক-ডাক ভেসে আসছে। চারপাশে ছোট-বড় অসংখ্য বোল্ডার ছড়ানো রয়েছে, সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে হন হন করে এগোচ্ছে রানা। একটু পরেই দৃষ্টিপথে চলে এল সাগরের কিনারা। ওর ডানদিকের পাকা রাস্তা জেটির সঙ্গে মিশেছে। জেটিটা সোজা এগিয়ে কুয়াশার ভিতর হারিয়ে গেছে।

সৈকত থেকে রাস্তা হয়ে জেটিতে উঠে এল রানা। শেষ মাথায় পৌঁছাল দৌড়ে। যা আন্দাজ করেছে তাই, ঝলমলে একটা সোনালি ইয়ট। উত্তর-পশ্চিম দিকে চলেছে। পিছনটা দ্রুত ঢাকা পড়ে গেল গাঢ় কুয়াশার সাদা চাদরে।

অস্থির দৃষ্টিতে জেটির দু'পাশে চোখ বুলাল রানা। গোটা দশেক মাছ ধরার স্টিলবডি ট্রলার ছাড়া আর মাত্র একটা লঞ্চ দেখা গেল, অন্য কোনও জলযান নেই।

লঞ্চটা মায়ানমার নৌ-পুলিশের। ইউনিফর্ম পরা, হাতে কারবাইন, তিনজন কনেস্টবলকে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে, জেটির দিকে পিছন ফিরে ডেকে দাঁড়িয়ে কুয়াশা দেখছে। ওদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার চিন্তাটা বাতিল করে দিল রানা।

আবহাওয়ার অবস্থা দেখে জেলেরা বোধহয় আজকের মত যে যার বাড়ি ফিরে গেছে, ট্রলার পাহারা দিচ্ছে তাদের অল্পবয়েসী হেলপাররা। বিদেশি ট্যুরিস্টদের সঙ্গে প্রায়ই কথা বলতে হয়, কাজ চালাবার মত ইংরেজি শিখে নিয়েছে তারা।

কিন্তু তাদের কাউকে মোটা বকশিশের লোভ দেখিয়েও কাজ হলো না। মাথা নেড়ে বার্মিজ কিশোর বলল, 'ফুয়েল নেই।' তারপর চোখ-ইশারায় দূরে কী যেন একটা দেখাবার চেষ্টা করল।

আরেকজন বলল, 'মালিকের নিষেধ আছে।'

তৃতীয়জন বলল, 'এই কুয়াশার ভেতর কী করে যাই! দেখতে পাচ্ছেন না, ঘাটে একটা লঞ্চও নেই? আজকের সবগুলো ট্রিপ বাতিল করে দিয়ে ইয়টগুলোও ফিরে গেছে। আপনি ছাড়া আর একজন ট্যুরিস্টও তো আসেনি।'

'তোমাকে যেতে হবে না, আমি একাই যাব। কত হলে ট্রলারটা ভাড়া দেবে বলো,' জানতে চাইল রানা। 'দু'তিন ঘণ্টা পর ফিরিয়ে দেব।'

'একা আপনি কোথায় যাবেন?' জিজ্ঞেস করল তরুণ আরাকানী।

'সাগরে বেড়াব,' বলল রানা।

মাথা নাড়ল ট্রলারের হেলপার, তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'পাগলেও একথা বিশ্বাস করবে না।'

কথাটা শুনে প্রচণ্ড রাগ হলো, খপ করে ধরে পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল তাকে, তারপর ট্রলারটা দখল করে পিছু নিল সোনালি ইয়টের; একমাত্র 'লিড' কুয়াশার ভিতর সাগরে হারিয়ে যাচ্ছে দেখে হতাশ হয়ে এরকমই একটা অবাস্তব দৃশ্য কল্পনা করল এমআরনাইন।

হতাশ হয়ে ফেরবার ভান করে জেটি থেকে নেমে এল রানা, রাস্তা ধরে কিছুটা হাঁটল। যখন বুঝল লঞ্চঘাট থেকে ওকে দেখা যাচ্ছে না, লাফ দিয়ে রাস্তা থেকে নীচে নেমে বালির উপর দিয়ে ডানদিকে দৌড় দিল।

ওদিকটায়, পঞ্চাশ কি ষাট গজ দূরে, নৌকা আকৃতির কিছু একটা আছে, কুয়াশায় ভাল করে দেখা যায়নি। ইশারা করা না হলে ওদিকে তাকাতই না ও। বার্মিজ কিশোরের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত ওর?

সেটা বলবার সময় এখনও আসেনি।

আশপাশে অসংখ্য বোল্ডার। রানা এখন হাঁটছে। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা বড় বোল্ডারের আড়াল থেকে সাবধানে

উঁকি দিচ্ছে। হ্যাঁ, কাছ থেকে দেখে চিনতে পারছে আকৃতিটা।

পুরানো একটা বোট। বারো ফুট লম্বা, হোন্ডা কোম্পানির আউটবোর্ড মোটর।

চারপাশে বড় বড় বোল্ডার, বোটটা সেগুলোর মাঝখানে। জেটিটা যথেষ্ট উঁচু হওয়ায় ওখান থেকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছে রানা, তাও ইশারা করা হয়েছে বলে। গোটা ব্যাপারটা এমনভাবে সাজানো, একটা গবেটও বুঝবে যে এখানে একটা ফাঁদ পাতা আছে।

কোথায় সেটা?

হাতে ছুরি নিয়ে এক বোল্ডার থেকে আরেক বোল্ডারের পিছনে চলে আসছে রানা; অপর হাতের ব্রিফকেস এমনভাবে ধরে আছে, প্রয়োজনের সময় ওটাকে যেন ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কুয়াশার ভিতর চারদিকে যতদূর দেখা যায় তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। বোটটাকে ঘিরে থাকা এই বোল্ডারগুলোর আড়ালেই লুকিয়ে আছে খুনি। ওর হিসাব অন্তত তাই বলে।

চিনা দৈত্যদের একজন হোটেল ছেড়ে একা বেরিয়ে এই ফাঁদটা পেতেছে এখানে। প্রথমবার এসে বোটটা পানি থেকে তুলে রেখে গেছে সৈকতে, বার্মিজ কিশোরকে টাকা দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে রাজি করিয়েছে বিদেশি কেউ ট্রলার ভাড়া করতে চাইলে চোখ ইশারায় তাকে যেন আউটবোর্ডটা দেখিয়ে দেওয়া হয়। ওটাই হলো টোপ।

রানার সন্দেহ, এমনকী লঞ্চটারও একটা ভূমিকা থাকতে পারে এই ফাঁদে। ফাঁদে আটকানোর পর রানাকে হয়তো পুলিশকে দিয়ে ক্রসফায়ার-এ মারা হবে। কে জানে, ওরা হয়তো আসল পুলিশ নয়।

দ্বিতীয়বার সুরাইয়ার সঙ্গে এসেছে। সুরাইয়া আর সঙ্গীকে ইয়টে তুলে দিয়ে ফিরে গেছে টোপের কাছে। এই মুহূর্তে ওটার চারপাশের কোনও একটা বোল্ডারের আড়ালে অ্যামবুশ পেতে

বসে আছে।

বোল্ডারের সংখ্যা কমে আসছে। আর মাত্র তিনটে দেখা বাকি। দ্রুত গাঢ় হয়ে উঠছে সন্ধ্যার অন্ধকার। বালির উপর কোনও শব্দ না করে পা ফেলছে রানা।

আর মাত্র দুটো পাথর। আর মাত্র একটা। সাবধানে এগোচ্ছে, হাতের ছুরি প্রস্তুত।

রানা হতাশ, সেই সঙ্গে নিজের উপর বিরক্ত। এক এক করে সবগুলো বোল্ডার দেখা হয়ে গেল। কেউ এখানে লুকিয়ে নেই।

তা হলে কী বোকা বানানো হয়েছে ওকে? ফাঁদের সমস্ত লক্ষণ রাখা হয়েছে, কিন্তু আদৌ কোনও ফাঁদ পাতা হয়নি? উদ্দেশ্য ছিল ওকে দেরি করিয়ে দেওয়া?

সেক্ষেত্রে সফল হয়েছে তারা। কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে প্রতি মুহূর্তে আরও দূরে সরে যাচ্ছে ইয়টটা, অথচ ও এখনও আউটবোর্ডকে পানিতেই নামাতে পারেনি।

ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে চলে এল রানা, যেখানে আউটবোর্ডটা পড়ে রয়েছে। জায়গাটার একটা অংশ সামান্য উঁচু, সাগরের ঢেউ নাগাল না পাওয়ায় সেখানে অল্প কিছু ঘাস জন্মেছে।

অস্থির হয়ে আছে রানার মনটা, কারণ জানে সুরাইয়াকে নিয়ে ক্রমশ নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে ইয়ট। বোটের পাশে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে ও, ভাবছে—কারিগরি ফলানো আছে, এটা নিয়ে কিছুদূর গেলেই তলার একটা অংশ খুলে যাবে, কিংবা বিস্ফোরিত হবে?

তলাটা পরীক্ষা করা দরকার।

অসম্ভব ভারী বোট, রানা ধারণা করল জাম কাঠের তৈরি। ছুরিটা চলে গেল বগলের তলায় স্ট্র্যাপে, আর ব্রিফকেসটা নামল পায়ের কাছে বালির উপর। দু'হাতে আউটবোর্ডের কিনারা ধরে ওল্টাবার চেষ্টা করছে ও।

একটা দিক দু'হাত দিয়ে গায়ের জোরে ঠেলে শূন্যে তুলে ফেলেছে, সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত, ঠিক এমনি সময় দেখতে পেল ফাঁদটা।

প্রতিপক্ষ জানত বোল্ডারগুলোর আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে কি না সার্চ করে দেখবে রানা। তাই লুকাবার জন্য এই জায়গাটা বেছে নিয়েছে। আরে, বুদ্ধিটা দারুণ তো!

তবে একটু বেশি কাছে হয়ে গেছে না?

আট

মাত্র দু'হাত দূরে প্রথমে ঘাসের একটা চাপড়া নড়ে উঠতে দেখল রানা। নড়াচড়াটা সামান্যই, তবে বালির উপর লম্বা একটা জায়গা জুড়ে—উঁচু জায়গাটার সবটুকু, অর্থাৎ, প্রায় ছ'ফুট।

তারপর বালির ভিতর থেকে একজন মানুষের মাথা আর একটা হাত বেরিয়ে এল, হাতটায় সাইলেন্সার ফিট করা একটা পিস্তল।

ঘাসের চাপড়া ছড়ানো বালির নীচে শুধু নাকটা বের করে শুয়ে ছিল দেং পি। দেখামাত্র তাকে চিনতে পারল রানা। সে-ও চিনল রানাকে। মুখে বালি ঢুকে পড়বার ভয়ে ঠোঁট টিপে হাসছে বিদ্রূপের হাসি। পিস্তলের ট্রিগার টানার আগে হাতটা সবটুকু লম্বা করে দিল সে।

আর যখন কোনও উপায় নেই, হাতের বোটটাই রানার অস্ত্র হয়ে উঠল। গলুই ধরে একটা দিক পুরোপুরি তুলে ফেলেছে

আগেই, সেটা শুধু আরেকটু সামনের দিকে ঠেলে ছেড়ে দিল।

বোটটা সরাসরি মুখের উপর নেমে আসছে দেখে ট্রিগার টেনে দিল পি। ঢপ করে ভোঁতা একটা শব্দ হলো।

গুলিটা লাগল না, রানার মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। পরমুহূর্তে ওর ছেড়ে দেওয়া বোটের কিনারা সরাসরি আঘাত করল দেং পির কপালে।

তার পিস্তল ধরা হাতটা বোটে চাপা পড়েনি, তবে সেটা দু'তিনবার ঝাঁকি খাওয়ার পর আলগা ঘাসের উপর মরা সাপের মত পড়ে আছে, আর কখনও নড়বে না। বোটের কিনারাই তার কপাল পুড়িয়েছে। কপালের ভাঙা হাড় ভিতরে ঢুকে সম্ভবত চটকে দিয়েছে অনেকটা মগজ।

টর্চ বের করে উপুড় করা বোটটাকে দ্রুত সার্চ করল রানা। না, কোথাও লিমপেট মাইন ফিট করা হয়নি, কিংবা অন্য কোনও রকম কারিগরিও ফলানো হয়নি।

আবার কিনারা ধরে সিধে করতে হলো বোট। তারপর বালির উপর দিয়ে টেনে পানিতে নামাতে শীতের মধ্যেও ঘাম ছুটে গেল রানার। প্রথমেই পরীক্ষা করল ও ফিউয়েলের অবস্থা। চলবে।

বুদ্বুদ আকৃতির খুদে একটা ককপিট আছে, সেটার ভিতর বসে স্টার্ট দিল রানা। তবে কোনও আলো জ্বালল না।

ইয়টের সারা গায়ে আলো জ্বলতে দেখেছে রানা। তবে এখন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে সব। ইতিমধ্যে অনেকটা দূরে চলে গেছে সেটা, তাই ইঞ্জিনের আওয়াজ পাচ্ছে না।

পিছনদিকেও খেয়াল রাখছে রানা। এখন পর্যন্ত যতটুকু বুঝতে পারছে পুলিশের লঞ্চ, কিংবা জেলেদের কোনও ট্রলার ওর পিছু নেয়নি।

আশার কথা একটাই, আউটবোর্ডের স্পিড ইয়টের চেয়ে বেশি। রানার হাতে পড়ে তীরবেগে ছুটল ওটা, যাচ্ছে ইয়ট

যেদিকে গেছে সেদিকে। প্রতি মুহূর্তে স্পিড আরও বাড়াচ্ছে।

সাগরে কী? প্রশ্নটা বারবার বিরক্ত করছে ওকে। মনে পড়ল মাত্র কয়েক মাস আগে পারমাণবিক মিসাইলবাহী একটা ভারতীয় সাবমেরিন ডুবেছে বঙ্গোপসাগরের এদিকটায়।

আরও মনে পড়ল, জেলেদেরকে একদিক থেকে ডলারবাহী ট্রলারের লোকজন ধাওয়া করেছে, আরেকদিক থেকে ধাওয়া করেছে কুখ্যাত এক তাইওয়ানিজ জলদস্যুর লোকজন। তারা বিশেষ করে ক্যাকটাস দ্বীপের ধারেকাছে কাউকে ঘেঁষতে দিচ্ছিল না।

এ-সবের সঙ্গে কি তুং শানের কোনও সম্পর্ক আছে?

আলো জ্বালছে না রানা। হঠাৎ যদি এখন কোনও লঞ্চ বা জাহাজ ওর সামনে পড়ে যায়, ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে বোটটা, থেঁতলানো মাংস আর হাড়গোড় ভাঙা ওর শরীরটাকে ঠুকরে খাবে সামুদ্রিক মাছেরা।

তীর থেকে দশ নটিকেল মাইল দূরে চলে এল আউটবোর্ড। এখনও ইয়টের কোনও চিহ্ন নেই। এক নটিকেল মাইল মানে ২০২৫ গজ। অর্থাৎ, সাড়ে এগারো মাইল সরে এসেছে ও ডাঙা থেকে। ক্রমে বড় হচ্ছে ঢেউয়ের আকার।

আধ-খোলা দেরাজের ভিতর টর্চের আলো ফেলল রানা। হাবিজাবি এটা-সেটার সঙ্গে পুরানো চার্টটা দেখতে পেয়ে বের করে আনল, ভাঁজ খুলল সাবধানে।

ইয়টটা যদি নাক বরাবর পশ্চিমে যেত, পঞ্চাশ কিলোমিটার সামনে পড়ত অয়েস্টার আইল্যান্ড। ওটা মায়ানমারের দ্বীপ। আর পশ্চিম ঘেঁষে উত্তরে রয়েছে ক্যাকটাস আইল্যান্ড। ওটাও মায়ানমারের দ্বীপ, মেইনল্যান্ড থেকে মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। ওর জানা আছে, বিদেশি পর্যটকদের জন্য রিসর্ট ফ্যাসিলিটি আছে ওখানে।

কুয়াশা আরও হালকা হয়ে এল। আরও পাঁচ নটিকেল মাইল

এগোবার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। তবে আলো নয়, প্রথমে ইঞ্জিনের আওয়াজই শুনতে পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আউটবোর্ডের স্পিড কমিয়ে আনল।

আরও তিন মিনিট পর কুয়াশার ভিতরে, রাতের অন্ধকারে, ম্লান আলোর বেশ কিছু ফোঁটা দেখা গেল, ক্রমশ বড় আর উজ্জ্বল হচ্ছে। সন্দেহ নেই ওটাই সেই ইয়ট, সুরাইয়াকে তুং শানের কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

কুয়াশা কেটে যাচ্ছে, তবে সেই সঙ্গে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে উঠছে। একটু পরেই দৃষ্টিপথে চলে এল আলো ঝলমলে ক্যাকটাস আইল্যান্ড। দেখতে পেয়ে সেদিকে ঘুরে গেল সোনালি ইয়ট। দেখাদেখি রানার বোটও।

আউটবোর্ড মোটর একটানা ভটভট আওয়াজ করছে। ইয়ট থেকে শুনতে পাবে ভেবে স্পিড কমিয়ে আরও পিছিয়ে পড়ল রানা। একটু পর মোটর বন্ধ করে দিল। ভাবল, সুরাইয়াকে ওখানে কেন নিয়ে যাচ্ছে ওরা? কী আছে ওখানে?

ক্যাকটাস আইল্যান্ড সম্পর্কে কী জানে স্মরণ করছে রানা। দ্বীপটা লম্বায় বারো মাইল, চওড়ায় মাত্র পাঁচ। ওটার কাছাকাছি আরও ছোট কয়েকটা দ্বীপ আছে, তবে ক্যাকটাস ছাড়া আর কোনওটাতে মানুষ বাস করে না। ক্যাকটাসের অধিবাসীরা প্রায় সবাই খ্রিশ্চান।

বিশেষ করে বিদেশি পর্যটকদের জন্য অল্প কিছুদিন হলো বিনোদনের লোভনীয় ঠিকানা হয়ে উঠেছে ক্যাকটাস আইল্যান্ড। ফাইভ স্টার হোটেল, ক্যাসিনো, নাইট ক্লাব, গলফ কোর্স, রেস কোর্স, থিম পার্ক, ওয়াটার স্কিইং, রোলার কোস্টার ইত্যাদি সবকিছুরই ব্যবস্থা আছে এখানে।

ইয়টের স্টার্ন লাইট ধীর গতিতে ঘুরে যেতে দেখল রানা, একটু পর পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেল; তারপর দৃষ্টিপথে চলে এল পোর্ট রানিং লাইট। ইয়টটাকে এখন আড়াআড়ি দেখতে

পাচ্ছে ও, যাচ্ছে ক্যাকটাসের উত্তর তীরের দিকে।

বিদ্যুতের আকস্মিক ঝলকানিতে রানা দেখল অন্ধকার আকাশে প্রচুর মেঘ জমেছে।

আবার মোটর স্টার্ট দিল ও, ইয়টের সঙ্গে সমান্তরাল রেখা ধরে চলেছে। ওর ধারণা এখন পর্যন্ত সব ঠিকই আছে। আলো না জ্বেলে এগোচ্ছে, কাজেই বোটটাকে কেউ দেখতে পায়নি; যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করায় মোটরের আওয়াজও কারও শুনতে পাওয়ার কথা নয়। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হতে পারে ডাঙায় ওঠার পর।

বোটের নাক ঘুরিয়ে দিল রানা, তীরের দিকে যাচ্ছে সোজা, ইয়টের আলোর উপর সারাক্ষণ একটা চোখ রেখেছে। ওদের চেয়ে আগে তীরে নামতে চাইছে, ইয়ট থেকে সুরাইয়াকে নিয়ে কোথায় ওরা ওঠে দেখতে চায়। সেটা নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট কোনও জেটিই হবে। ওদের গন্তব্য জানা নেই রানার।

কুয়াশার ভিতর থেকে হঠাৎ করেই সামনে চলে এল সৈকত। গতি কমাল রানা, একেবারে শেষ মুহূর্তে পরিত্যক্ত ও ভাঙা একটা ল্যান্ডিং স্টেজের সঙ্গে সংঘর্ষটা এড়াতে পারল, তারপর ছোট্ট পাথুরে শেলফে উঠে পড়ল বোট নিয়ে।

লাফ দিয়ে হাঁটু সমান ঠাণ্ডা পানিতে নামল রানা, টেনে ডাঙায় তুলে আনছে আউটবোর্ডকে। কাজটা করতে শরীরের সবটুকু শক্তি ব্যয় করতে হলো।

ওখান থেকে ঢাল বেয়ে উঠল ও, সৈকতের মাথা থেকে কাছাকাছি একটা সাইডওয়াক দেখতে পেয়ে চলল সেদিকে। সাইডওয়াকের শেষ মাথায় জেটি, আলো ঝলমলে সোনালি ইয়টটা ভিড়েছে ওখানে। ইঞ্জিনটা চালু রাখা হয়েছে, এগজস্ট থেকে রাশি রাশি খুদে বুদ্বুদ বেরুচ্ছে।

সাবধান হওয়া সত্ত্বেও কংক্রিটের উপর ভেজা জুতোর ছপ ছপ শব্দ হচ্ছে। সাইডওয়াক ছেড়ে সরু সৈকতের বালিতে নেমে

এল রানা।

ছোটখাট এক সারি একচালাকে দূর থেকে পাশ কাটাচ্ছে ও, সারিটার একটা মাথা জেটির কাছে পৌঁছেছে। রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য ওগুলোয় আশ্রয় নেয় পর্যটকরা। শেষ চালাটার কোণে থেমে সাবধানে উঁকি দিল রানা। জেটি থেকে কংক্রিট সাইডওয়াকে নেমে আসছে সুরাইয়া, সঙ্গে সেই দৈত্যটা—লী যান।

এই সময় নড়ে উঠল ইয়ট। আড়মোড়া ভাঙছে যেন। ইঞ্জিনের আওয়াজ বাড়ল। সেদিকে চেয়ে রানা দেখল, জেটি ছেড়ে পিছিয়ে যাচ্ছে সোনালি রাজহাঁস। তার মানে, ভাবল ও, এটা নিশ্চয়ই কারও প্রাইভেট জেটি, সুরাইয়াকে এখানে পৌঁছে দিয়ে নিজের জেটিতে ফিরে যাচ্ছে ক্যাপটেন। সেটা নিশ্চয় এই ক্যাকটাস দ্বীপেরই অন্য কোনওদিকে হবে।

রাতটা তা হলে এই দ্বীপেই কাটাতে হচ্ছে সুরাইয়াকে।

সাইডওয়াকে নেমে সোজা রানার দিকে হেঁটে আসছে লী যান, তার পিছু নিল সুরাইয়া। সাইডওয়াক থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে, একচালাটার কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা।

আবার একবার বিদ্যুৎ চমকাল, ঝট করে মাথাটা টেনে নিল রানা। এবার বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে, মেঘের গুরুগম্ভীর ডাকও শোনা গেল।

ঠিক কোথায় আসছে ওরা, কেন, কিছুই বুঝতে পারছে না ও। পিছু হটে অন্য একটা একচালার পিছনে গা ঢাকা দিতে পারে ও, কিন্তু তাতে যে সময় লাগবে, তার আগেই ওকে দেখে ফেলবে লী যান। তা ছাড়া ওরা কোথায় যায়, কী করে, জানতে হবে ওকে—লুকালে তা সম্ভব নয়।

ওরা যদি না থেমে সোজা এগোয়, সাইডওয়াক থেকে বালিতে নামতে হবে, তারপর পাশ কাটাবে রানাকে। তবে না, একচালার সামনের বারান্দায় পৌঁছে সুরাইয়াকে দাঁড়াতে বলল

লী যান। পকেট হাতড়ে কী যেন বের করছে দৈত্যটা। আরও দু'পা এগিয়ে একচালার দরজার সামনে পৌঁছাল, রানার দৃষ্টিপথের বাইরে সেটা।

এরপর আওয়াজ শুনে রানা বুঝল, দরজার তালা খুলছে লী যান। একটু পরেই মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন ঢুকল কানে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সুরাইয়া, সরে গিয়ে পথ করে দিল; ওকে পাশ কাটিয়ে বারান্দা হয়ে সাইডওয়াকে নেমে গেল ছোট একটা গলফ কার্ট, লী যান চালাচ্ছে।

গলফ কার্ট দাঁড় করাল সে। বারান্দা থেকে নেমে এসে তার পাশে বসল সুরাইয়া। সাইডওয়াক ধরে ধীরগতিতে দ্বীপের ভিতর দিকে এগোল গলফ কার্ট।

সাবধানে ওটার পিছু নিল রানা। সাইডওয়াকে উঠল না, সরু সৈকতেই থাকছে।

একটু পরেই চওড়া পাকা রাস্তায় উঠল গলফ কার্ট। দু'পাশের শপিং মল, বার, নাইটক্লাব, থিয়েটার ইত্যাদি রাস্তার বহুদূর পর্যন্ত রঙিন আলোয় আলোকিত করে রেখেছে।

কুয়াশায় খুব বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না, তারপরও চৌরাস্তায় প্রচুর লোকের ভিড় দেখা যাচ্ছে। তাদেরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল গলফ কার্ট।

এই মুহূর্তে একটা টাওয়ারকে পাশ কাটাচ্ছে সেটা, দশতলা উঁচু। নিওন-এর তৈরি উজ্জ্বল নামটা বহু দূর থেকে পড়া যায়—সুলতানা। সুলতানার পাশেই রয়েছে ফাইভ স্টার হোটেল টাকল মাকান ইন।

সুলতানার গায়ে আরও আট-দশটা রঙিন নিওনসাইন রয়েছে, সৈকত থেকে চোখ বুলাচ্ছে রানা। টাওয়ারটার প্রতিটি ফ্লোরে একটা করে ক্যাসিনো খুলে বসেছে গ্যাম্বলিং মোগলরা।

টাওয়ার সহ আলোকিত রাস্তা পিছিয়ে পড়ল, মোড় নিয়ে প্রায় অন্ধকার পিচ ঢালা পথ ধরে এগোচ্ছে গলফ কার্ট। ওটার

উপর চোখ রেখে একটা বাগান পেরুচ্ছে রানা। এদিকের রাস্তায় স্ট্রিট ল্যাম্প কম, ছটার মধ্যে মাত্র একটা জ্বলতে দেখল। রাস্তার ধারে একের পর এক অসমাপ্ত বাড়ি-ঘর আর খালি কিছু প্লট দেখা যাচ্ছে।

বাগান থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা পেরুল রানা, ফুটপাথে উঠে পাঁচিল ঘেঁষে হাঁটছে, গলফ কার্ট এখন ওর পঞ্চাশ গজ সামনে।

এই মুহূর্তে একটা ল্যাম্পপোস্টের নীচ দিয়ে এগোচ্ছে গলফ কার্ট। খানিক পর রানাও ওটার নীচে পৌঁছাল, দেখল রাস্তার ধারের একটা সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে—প্যাগোডা রোড।

আবার এগোল রানা, দেখল পঞ্চাশ গজ দূরে বাম দিকে মোড় নিচ্ছে গলফ কার্ট। বাঁকটার কাছে এসে আরেকটা রোড সাইন দেখতে পেল ও, তাতে লেখা—নে উইন রোড।

নে উইন রোডের শেষ মাথায় প্রকাণ্ড একটা দালান আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এগারো তলা উঁচু, সারা গায়ে আলোকসজ্জার বাড়াবাড়ি, মাথায় টকটকে লাল রঙের নিওনসাইন: **ক্যাসিনো আন্দামান।**

রাস্তার ধারে একটা একচালার ভিতর ঢুকল গলফ কার্ট। একটু পর সেখান থেকে বেরিয়ে এল সুরাইয়া আর লী যান। রাস্তা পার হয়ে চওড়া একটা বোর্ডওয়াক-এ উঠল ওরা, বালির উপর দিয়ে ক্যাসিনো আন্দামানের দিকে চলে গেছে কাঠের ওই সেতু।

এতক্ষণে রানা বুঝতে পারল, ওরা একটা গলফ কোর্স পেরুচ্ছে। ক্যাসিনো আন্দামান আসলে কোর্সটার এক প্রান্তে।

বোর্ডওয়াকটাকে এড়িয়ে ঢাল বেয়ে খানিকটা নীচে নামল রানা, বালির উপর দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে এগোচ্ছে। ক্যাসিনো আন্দামানের পিছনদিক থেকে সাগরের গর্জন ভেসে আসছে, কিছুক্ষণ হলো জোরাল বাতাসও বইছে। তার মানে, ভাবল ও, ক্যাকটাস আইল্যান্ড গড়ে পাঁচ মাইল চওড়া হলেও, কোথাও

কোথাও তা হাজার-বারোশ' গজের বেশি নয়।

আরও কিছুটা এগোবার পর, কুয়াশা এখনও যথেষ্ট গাঢ় হওয়া সত্ত্বেও, ক্যাসিনো আন্দামানের পিছন দিকে সাগর দেখতে পেল রানা, ট্রলার আর যাত্রীবাহী স্টিমারের আলোগুলোকে ম্লান হলুদ ফোঁটার মত লাগছে।

বোর্ডওয়াকের নীচে নেমে এল রানা। কাঠের বিরাট সব স্তূপ সেতুটার অবলম্বন হিসাবে কাজ করছে, সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোল ও।

কাঠের শেষ স্তূপটাকে পাশ কাটিয়ে আসবার পর রানার সামনে একটা খাড়াই পড়ল। চোখ-কান খোলা রেখে সাবধানে সেটার মাথায় উঠল ও। কাছ থেকে ক্যাসিনো আন্দামানকে প্রকাণ্ড একটা দুর্গ মনে হলো ওর।

এগারোতলা বিল্ডিংটায় একটাও জানালা নেই। পুরোটাই যেহেতু শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত, একেবারে এয়ারটাইট রাখা হয়েছে। কাছ থেকে ছোট আরেকটা নিওনসাইনও এখন পড়তে পারছে রানা—**হোটেল আন্দামান**।

ক্যাসিনো আন্দামানের ইস্পাতের তৈরি বিরাট ফটকটা বন্ধ। সুরাইয়াকে নিয়ে সেটার দিকে এগোচ্ছে লী যান, ফটকের গায়ে বসানো গেটটা হঠাৎ খুলে গেল। গেটের ভিতর থেকে চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল বাইরে, দেখতে পেয়ে ডাইভ দিয়ে বালির উপর পড়ল রানা।

খুব অবাক হচ্ছে ও। জুয়া খেলবার এত বিশাল আয়োজন, অথচ প্রবেশমুখে না আছে দামী গাড়ির সারি, না আছে সুবেশী জুয়াড়িদের ভিড়। শুধু আবহাওয়া খারাপ বলে? নাকি অন্য কোনও কারণ আছে?

ফটকের গেটটা বন্ধ হয়ে যেতে আবার ছায়ায় ঢাকা পড়ল ক্যাসিনো আন্দামানের সামনেটা। নড়াচড়া না করে ওখানেই পড়ে থাকল রানা, নাকটা বালি ছুঁই ছুঁই করছে। কুয়াশার পরদা

ভেদ করে আর কিছু দেখা যায় কি না খুঁজছে ও। গলফ কোর্সটা এখন ওর বাম দিকে, নে উইন রোডের বাকি অংশ ওর ডানদিকে।

ক্যাসিনো আন্দামান তুং শানের হেডকোয়ার্টার, নাকি এখানে দু'একদিনের অতিথি সে?

প্রথমে ইঞ্জিনের ভারী আওয়াজ শুনতে পেল রানা, তারপর দেখতে পেল ট্রাকটাকে। বালিতে সেঁটে থাকা কানে টায়ারের নরম গুঞ্জন ঢুকল। কাঠের একটা এবড়োখেবড়ো স্তূপের পিছনে আড়াল নিল ও, চেষ্টা করল বালির ভিতর যতটা পারা যায় সেঁধিয়ে যেতে।

কাঠের স্তূপটাকে ছুঁয়ে গেল স্পটলাইটের উজ্জ্বল আলো। ট্রাকের মাথায় বসানো রয়েছে ওটা। প্লাস্টিক হোলস্টার থেকে ওয়ালথারটা বের করে আনল রানা, বাধ্য না হলে ব্যবহার করবে না, কিন্তু বলা তো যায় না কখন দরকার লাগবে।

ওর প্ল্যান ছিল সুরাইয়াকে কোথায় তোলা হয় দেখা। সেটা দেখবার পর এখন ভাবছে, ক্যাসিনো আর হোটেল একসঙ্গে হওয়ায় ভিতরে ঢোকা কোনও সমস্যা নয়।

সমস্যা নয় দু'চারদিন ভিতরে থেকে খোঁজ নেওয়াও। আসলে জানা দরকার, ওখানে কী করছে তুং শান, সিকিউরিটির এত সব আয়োজন কীজন্য।

হোটেল আন্দামানে উঠে ক্যাসিনো আন্দামানে জুয়া খেলতে হবে ওকে। সেজন্য প্রস্তুতি দরকার। আজ সম্ভব নয়, কাল দিনের বেলা ধনকুবের একজন জুয়াড়ি হিসাবে প্রকাশ্যে ওখানে ঢুকতে হবে ওকে।

তাই এখন কোনও ঝামেলা না করে, প্রতিপক্ষের মনে কোনও রকম শঙ্কা বা সন্দেহ না জাগিয়ে, চুপিসাড়ে ফিরে যাওয়া দরকার ওর।

সাদা আলোর বল্লমটা আবার ছুটে এল ওর দিকে, ছয় ইঞ্চির

জন্য দীর্ঘ শরীরটার নাগাল পেল না। ট্রাকটা ধীরে ধীরে পাশ কাটাচ্ছে ওকে, ওটার চওড়া টায়ার ওর কাছ থেকে দশ ফুট দূরেও নয়। স্পটলাইটের আভায় ট্রাকটার মাথায় এক পলকের জন্য কী যেন একটা দেখতে পেল রানা।

রেইডার অ্যান্টেনা! ওই ট্রাক আসলে একটা মনিটর ভ্যান, সম্ভবত ক্যাসিনোকে ঘিরে রুটিন টহলে বেরিয়েছে।

ক্যাসিনোর সঙ্গে হোটেল, অথচ ফটক বন্ধ: দুর্গের মত দুর্ভেদ্য বিল্ডিংটাকে ঘিরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে স্পটলাইট আর রেইডার অ্যান্টেনা ফিট করা ভ্যান; রানা ভাবল, অবশ্যই ডাল মে কুছ কালা হ্যায়!

এখন ব্যাখ্যা পাওয়া গেল লী যান আর সুরাইয়া গেটের দিকে এগোতেই সেটা কেন খুলে গিয়েছিল। ঠিক ওই সময় ফটকের সামনে ওদের দুজনের পৌছানোর কথা ছিল। রেইডার ভ্যানের স্ক্রিনে ওদের বিপ ধরা পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে রেডিওর সাহায্যে ক্যাসিনোর গার্ডকে তথ্যটা জানিয়ে দিয়েছে অপারেটর।

রেইডার স্ক্রিনে কি আরেকটা, তৃতীয় বিপ-ও ধরা পড়েছে? ওরটা?

গড়ান দিয়ে চিৎ হলো রানা, ওয়ালথারে বালি ঢুকেছে কি না পরীক্ষা করল। ভাল ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি, ভাবল ও। এখন, বালিতে শুয়ে থাকা অবস্থায়, রেইডার বিম ওকে ছুঁতে পারছে না। ওর বিপ স্ক্রিনে দেখা যাবে না। কিন্তু ওকে ধরে নিতে হবে প্রাইভেট জেটি থেকে সুরাইয়া আর লী যানকে অনুসরণ করে ক্যাসিনো পর্যন্ত আসবার সময় ওর বিপ দেখা গেছে।

অর্থাৎ তুং শান আর তার গং জানে বাইরে কেউ লুকিয়ে আছে। তৃতীয় বিপটা স্বভাবতই শত্রুর বলে ধরে নেবে ওরা।

দেং পি রিপোর্ট না করায় ইতিমধ্যে তার পরিণতি সম্পর্কে একটা ধারণা হয়তো পেয়ে গেছে তারা, কাজেই তৃতীয় বি-

পটাকে দেং পির খুনি বলে মনে করবে।

এরকম অবস্থায় কী করবে তুং শান? আমি হলে সুরাইয়াকে জেরা করতাম, ভাবল রানা। কী হত জেরার ধরন? সেটা কল্পনা করতে চাইছে না ও।

তবে, ওর ধারণা ভুলও হতে পারে।

কী ঘটে গেছে তা হয়তো সুরাইয়াকে বুঝতেই দেবে না তুং শান। রানা কী করে দেখবার জন্য অপেক্ষায় থাকবে সে। তার জানবার কোনও উপায় নেই কুয়াশার ভিতরে কে ঘুরঘুর করছে, কী উদ্দেশ্যে।

তবে তুং শান বুঝবে যে রানা রেইডার ভ্যান দেখেছে, বুঝেছে জিনিসটা কী। যতই সাহসী আর একগুঁয়ে লোক হোক, তাকে ভাগিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ওটা।

সিদ্ধান্তে পৌঁছাল রানা। ও চায়, তুং শান জানুক সুরাইয়ার পিছু নিয়ে আসা লোকটা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে।

আবার ওকে পাশ কাটাতে আসছে ভ্যানটা, বালির উপর খসখসে আওয়াজ করছে টায়ার। এবার স্পটলাইট রানার কাছাকাছি এল না।

গম্ভীর এক চিলতে হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। সন্দেহ নেই তারা জানে আশপাশেই কোথাও আছে ও। এ-ও জানে রেইডার বিমের নাগালের মধ্যেই আছে, তবে লুকিয়ে। অপেক্ষা করতে কোনও সমস্যা নেই তাদের। আগে হোক বা পরে আড়াল থেকে বেরুতেই হবে ওকে।

ভ্যানটা আবার কুয়াশার ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে হাতঘড়ি দেখবার জন্য ঝুঁকি নিয়ে পেনলাইটটা একবার জ্বালল রানা। শেষ রাউন্ডের পর দশ মিনিট পার হয়েছে। এর মানে হলো, ও যদি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে, ভ্যানটা নিজ পরিধির সবচেয়ে দূর বিন্দুতে থাকবে। তখন এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারবে ও।

পাঁচ মিনিট পর বোর্ডওয়াকের নীচ থেকে ক্রল করে সাগরের দিকে বেরিয়ে এল রানা, তারপর দৌড় শুরু করল সৈকত আর নে উইন রোড পুব দিকে রেখে।

ক্যাসিনো আন্দামানের একপাশে চলে এসেছে রানা, এই সময় কামানের মত কান ফাটানো গর্জন শুনে ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে আকাশের দিকে তাকাল ও। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। কিছু না, মেঘ ডাকছে। কিন্তু রানার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে ক্যাসিনো আন্দামানের ছাদ।

ওখানে একদিক খোলা নিচু একটা দোচালা রয়েছে। সেটার ভিতর নানা আকৃতির ডিশ, মোটা তার আর পাইপ সহ অত্যন্ত জটিল সব যন্ত্রপাতি সাজানো। ওগুলোর শুধু মাথা কিংবা কিনারা দেখতে পেয়েছে ও, বাকি আকৃতি কল্পনা করে নিচ্ছে। এক পলক দেখেই বুঝতে পারল, এ-সব ইকুইপমেন্ট অত্যাধুনিক ও শক্তিশালী কমিউনিকেশন আর ডিটেকশন সিস্টেমে ব্যবহার করা হয়।

আবার দৌড়াচ্ছে রানা, ভাবছে, তুং শানের পেশাটা কী? এ-সব ফ্যাসিলিটি কী কাজে লাগে তার? এ-ধরনের ইকুইপমেন্ট খোলামেলা জায়গায় রাখতে হয়, কিন্তু এখানে চালার নীচে রাখা হয়েছে ওগুলোর অস্তিত্ব যাতে আকাশ থেকে টের পাওয়া না যায়।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রসঙ্গটা আপাতত মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল ও। সবই ওকে ক্যাসিনোর ভিতর ঢুকে জেনে নিতে হবে।

রেইডার স্ক্রিনে রানা এখন একটা সচল বিপ। ভীত-সন্ত্রস্ত একটা বিপকে লেজ তুলে পালাতে দেখছে তারা। ঠিক এটাই ওদেরকে বোঝাতে চেয়েছে ও।

প্যাগোডা রোডে পৌঁছাল রানা, তবে বাম দিকে বাঁক না ঘুরে সৈকত ধরে চলল অন্য একটা রাস্তা ধরে। একটু পর দেখল এটার নাম ইরাবতী রোড।

রাস্তাটার আরও অনেক সামনে, কুয়াশার ভিতর, নিঃসঙ্গ স্ট্রিট ল্যাম্পের ম্লান আলো দেখতে পাচ্ছে ও। কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে তাকাল রানা, দেখল খুদে দুটো হলুদ চোখ অনুসরণ করছে ওকে।

ওর পিছু নিয়েছে ভ্যানটা, তবে এখনও অনেকটা দূরে রয়েছে, ব্যবহার করছে সাইডলাইট। যেমনটা আশা করেছিল রানা, রেইডার স্ক্রিনে ওর বিপ পেয়ে গেছে তারা। এবং এখন তারা দেং পির সম্ভাব্য খুনিকে ধরতে আসছে।

ছোটার গতি আরও বেড়ে গেল রানার। চারপাশে চোখ বুলিয়ে লুকাবার জায়গা খুঁজছে ও। প্ল্যানটা সফল করতে চাইলে সব খুব দ্রুত আর সুষ্ঠুভাবে হওয়া চাই।

হঠাৎ বিশেষ একটা সুবিধে পেয়ে গেল রানা। ঠিক সময়মত ভাগ্যের সহায়তা। স্ট্রিট ল্যাম্প থেকে একশ' গজ দূরে রয়েছে ও, এই সময় দেখল ওটার নীচ দিয়ে এক লোক হেঁটে যাচ্ছে। ওর মতই সুট পরা, প্রায় একই আকৃতি। মনে মনে তার মঙ্গল কামনা করল রানা।

লোকটা জুয়াড়ি, কেয়ারটেকার কিংবা মেইন্টেন্যান্স ওআর্কার হতে পারে। লোকটা কে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যাপার নয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, প্রাণরক্ষা করতে হলে রানার জায়গায় এখন রেইডার স্ক্রিনে ওই লোককে থাকতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয়, যদি খুন করার আগে নিজেদের ভুল ধরা পড়ে ওদের কাছে।

লাফ দিল রানা, রাস্তার পাশে ঘন একটা ঝোপের ভিতর পড়ল। ভেজা বালির উপর লম্বা হয়ে শুয়ে প্রার্থনা করছে, রেইডারটা যেন খুব বেশি শক্তিশালী না হয়, রেঞ্জও যেন এক মাইলের কমই থাকে। ওর হিসাবে, ক্যাসিনো থেকে অতটা দূরেই চলে এসেছে ও।

মনে মনে আরও একটা জিনিস আশা করছে রানা—ভ্যানের

লোকেরা মাঝেমধ্যে এদিক-ওদিকও যেন তাকায়। কারণ ভোজবাজির মত একটা বিপের জায়গায় আরেকটা বিপ চলে আসছে, এটা যেন তারা দেখতে না পায়!

বোধহয় কাজ হচ্ছে। দু'মিনিট পর রানা যেখানে লুকিয়ে আছে সেই ঝোপটাকে ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে গেল রেইডার ভ্যান। তার মানে ওই লোকটার পিছু নিয়েছে তারা। পর পর দুবার বড় করে শ্বাস নিল রানা, তারপর ক্রল করে সৈকতের দিকে এগোতে শুরু করল।

চুরি করা বোটটা নিয়ে মেইনল্যান্ডে ফিরতে হবে ওকে।

নয়

পরদিন বেলা বারোটার দিকে নিঃশেষে বিদায় নিল কুয়াশা, পারদের মত ঝলমলে সূর্য আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিল চারদিক।

মেইনল্যান্ডের ধানথামায় দেশি-বিদেশি অনেক ট্যুরিস্ট খারাপ আবহাওয়ার জন্য হোটেল থেকে বেরুতে পারছিল না, রোদ উঠতেই দলে দলে বেরিয়ে পড়ল সবাই।

এরকম বারোজনের একটা দল বেলা তিনটের দিকে জেটি থেকে রওনা হলো ক্যাকটাস দ্বীপের উদ্দেশে। ওদের মধ্যে একজন শ্রী লঙ্কান তামিল ব্যবসায়ী রয়েছে, নাম সাইয়িদ উপল ফারুক। তরুণ, সুদর্শন এবং অত্যন্ত দামি পোশাক-পরিচ্ছদ উপল ফারুকের। শ্রী লঙ্কার অত্যন্ত নামকরা একটা গ্রুপ অভ

ইন্ডাস্ট্রিজ-এর মালিকের একমাত্র সন্তান। অসুস্থ পিতার সাহায্য দরকার, তাই কেমব্রিজের লেখাপড়া অসম্পূর্ণ রেখেই ফিরে আসতে হয়েছে তাকে দেশে। বছরে একশ' কোটি রুপি ইনকাম ট্যাক্স দেয় ওদের কোম্পানি।

তরুণ উপল ফারুক বাপকে সাহায্য করার নামে হঠাৎ করে বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হাতে পেয়েই দু'হাতে টাকা ওড়াতে শুরু করেছে। প্রচুর মদ খায় সে, তবে কখনও মাতাল হয় না। সুন্দরী নারীর পিছনে অকাতরে টাকা খরচ করে। সেই সঙ্গে আছে জুয়ার নেশা। এই জুয়ার নেশাই ওকে টেনে নিয়ে চলেছে ক্যাকটাস আইল্যান্ডে।

মায়ানমারের থানথামায় বেড়াতে এসে গতরাতে উপল ফারুক হোটেল ম্যানেজারের মুখে শুনেছে, ক্যাকটাস দ্বীপের ক্যাসিনো আন্দামানে খুব বড় স্টেকে জুয়া খেলা হয়—কোনও রকম কারচুপি ছাড়াই। রুলেত থেকে শুরু করে পোকার, তিন-তাস, নাইন-কার্ড...মোটকথা যে জুয়াই তুমি খেলতে চাও, সব আয়োজনই আছে ওখানে, শুধু জোচ্চুরিটা নেই।

কাল শুনেছে, ব্যস, আজই চেক আর ক্রেডিটকার্ড নিয়ে চলেছে সে ক্যাকটাস দ্বীপে।

চেহারা, নাম আর কাগজ-পত্র বদলে ফেলা হয়েছে, শেখ মোহাম্মদ আমিরুল ফরহাদ ইবনে আহ্বাদই এখন ধনীর দুলাল সাইয়িদ উপল ফারুক। তবে নতুন এই চরিত্রটি ভুয়া নয়, বাস্তবে এর অস্তিত্ব আছে। কেউ খোঁজ নিলে রানার তথ্যে কোনও ভুল পাবে না, হুবহু মিলে যাবে।

পরিচয় গোপন করে যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে জুয়া খেলতে গেছে উপল ফারুক, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দু'চারজন ছাড়া আর কেউ ব্যাপারটা জানে না; কাজেই তার চেহারা আর পরিচয় নিয়ে এখানে রানার ধরা পড়বার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

হোটেল থেকে রওনা হওয়ার আগে নিজ এজেন্সির সিতওয়ে

শাখার প্রধান শাহিন সিরাজকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে রানা—ক্যাসিনো আন্দামানের পিছনে একটা জঙ্গল আছে, সেই জঙ্গল সংলগ্ন সৈকতে পাওয়া যাবে পরিত্যক্ত কয়েকটা জেটি; ওগুলোর একটায় ওর জন্য যেন মাছ ধরার ছোট একটা ট্রলার বেঁধে রাখে ও, অন্তত একজোড়া অক্সিজেন-ট্যাংক আর ওয়েটসুট সহ।

দলটার সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে জেটিতে এসে রানা শুনল, ক্যাসিনো আন্দামানে জুয়া খেলতে হলে ট্যুরিস্টদের কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। যেমন—নিজের পাসপোর্ট ও পরিচয়-পত্র জমা দিতে হবে; কোন্ ব্যাঙ্কে কত নম্বর অ্যাকাউন্ট, ক্রেডিট কার্ড-এর কোড ইত্যাদি ক্যাসিনো কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে; সঙ্গে পোষা পশু-পাখি রাখা যাবে না; বাচ্চাদের প্রবেশ নিষেধ ইত্যাদি।

থানথামা জেটিতে **ক্যাসিনো আন্দামান** লেখা সোনালি একটা সুদৃশ্য ইয়ট অপেক্ষা করছিল, তাতে ওঠার সময় রানার সন্দেহ হলো গতকাল সন্ধ্যায় এটাই কি সুরাইয়াকে ক্যাকটাস দ্বীপে পৌঁছে দিয়েছিল?

সুরাইয়ার কথা মনে পড়তে একটা শঙ্কা জাগল রানার বুকে। কাল রাতে মেয়েটাকে একা বাঘের ঘরে ঢুকতে দেখেছে ও। জানোয়ারটা ওকে নিয়ে কী করেছে আন্দাজ করা মুশকিল। সুরাইয়া বেঁচে আছে তো? যদি বেঁচে তাকে, কীসের বিনিময়ে? নিজের ও ফাইবারগ্লাস-এর পরিচয় ফাঁস করে দিয়ে?

তিনজন বডিগার্ডকে খুন করে সুরাইয়ার মিত্র, আরেকজন স্পাই, তুং শানের হেডকোয়ার্টারে ঢুকতে যাচ্ছে আজ।

আর দু'এক ঘণ্টার মধ্যে কপালে কী আছে ভাবতে গিয়ে একটা ঢোক গিলল রানা। কয়েকটা প্রশ্ন ভিড় করে এল মনে। সুরাইয়ার কী অবস্থা না জেনে ওর কি ওখানে গিয়ে ঢোকা উচিত হচ্ছে? কথা বের করবার জন্য ওর উপর টরচার করা হতে পারে, বলা যায় না, দু'মুখো সাপও হতে পারে মেয়েটা।

সেক্ষেত্রে ভিতরে ঢুকে দেখবে হাতে পিস্তল নিয়ে তুং শান

ওর জন্য অপেক্ষা করছে, তার পাশে দাঁড়িয়ে ভুবনভোলানো হাসি উপহার দিচ্ছে পরমাসুন্দরী ডাবল এজেন্ট সুরাইয়া জেবিন।

না, এই প্ল্যান ধরে এগোনো ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই। এসপিওনাজ লাইনের এটাই রীতি; ভিলেনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তার আস্তানায় হানা দিতে হয় স্পাইকে।

ঘণ্টা দেড়েকের ইয়ট ভ্রমণ, সময়টা বারোজন সম্ভাব্য জুয়াড়ির সঙ্গে গল্প-গুজব করে কাটাবার সিদ্ধান্ত নিল রানা।

আমেরিকান দুই সহোদর ভাই রয়েছে ওদের সঙ্গে, পিট হোপ আর নিট হোপ। পিট ফ্রি লান্সার জার্নালিস্ট, নিট এয়ারকুলার তৈরি করে এমন একটা কোম্পানির ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি। নিউ ইয়র্কের একটা লটারিতে দশ লাখ ডলার জিতে সেগুলো যেমন খুশি খরচ করবার জন্য একসঙ্গে বেরিয়েছে দুই ভাই।

প্রথমে ওরা থাইল্যান্ডে আসে, ওখানে একটা ক্যাসিনোয় নগদ দু'লাখ ডলার হেরে মন খুব খারাপ। ক্ষতিটা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য ক্যাসিনো আন্দামানে যাচ্ছে। এবারই প্রথম, ক্যাকটাস দ্বীপে আগে কখনও যায়নি ওরা, তবে শুনেছে ওটার কথা।

আর আছে ধবধবে সাদা আলখেল্লায় আপাদমস্তক ঢাকা আরব আমিরাত-এর কুচকুচে কালো তিন শেখ। তাদের নাম শেখ জালাল ইবনে আসাদ, শেখ ফাহাদ ইবনে কাবিল, শেখ কালাম ইবনে উমর। একইরকম সউদি দাড়ি তাদের তিনজনের।

তিনজনের কাউকেই বিশেষ আলাপী বলে মনে হলো না রানার, ভাল ইংরেজি না জানাই বোধহয় কারণ। তবে উপল ফারুকের পরিচয় আর উদ্দেশ্য শুনে তাদের লিডার, শেখ জালাল ইবনে আসাদ, দাড়ি চুলকে আড়ষ্ট আরবী ভাষায় চ্যালেঞ্জের সুরে

জানিয়ে দিল, কে কত বড় জুয়াড়ি, কার ভাগ্য কাকে কী সহায়তা করে, সবই জানা যাবে খেলার টেবিলে।

গত বছরও এসেছিল তারা, তবে খেলাটা নাকি জমেনি। তার মানে, রানা ধরে নিল, বোধহয় অনেক টাকা হেরেছিল সেবার।

আরব আমিরাতের এই তিন শেখকে দেখে কেন যেন রানার মনটা খুঁত খুঁত করছে, কারণটা নিজের কাছেও পরিষ্কার নয়। তাদের মধ্যে প্রথম লোকটা, শেখ জালাল ইবনে আসাদ, চোরা চোখে বারবার তাকাচ্ছে ওর দিকে, আর মাঝে-মধ্যে এক সঙ্গীর কানে ফিসফিস করে কী সব বলছে।

মায়ানমার এয়ার ফোর্সের একজন সাবেক এয়ার ভাইস মার্শাল থাকিন মাউং, আর আণবিক শক্তি কমিশনের নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট থান বানডুলা। অবসর গ্রহণের পর হাতে মোটা টাকা এসেছে, তাই ভাগ্য পরীক্ষার জন্য জুয়া খেলতে যাচ্ছেন তাঁরা। এই প্রথম।

আছে সিঙ্গাপুরের দুজন পেশাদার জুয়াড়ি—মো হো আর তাণ্ডব সিং। চিনা লোকটার বয়স চল্লিশের কম নয়, চোখে-মুখে লেখা রয়েছে: মস্ত ধড়িবাজ। প্রায়ই সে ক্যাকটাসে জুয়া খেলতে আসে।

তাণ্ডব সিং তরুণ, অ্যাথলেটিক কাঠামো, অত্যন্ত স্মার্ট ও চটপটে। পেশায় গাইড সে, আগেও ক্যাকটাস দ্বীপে তার আসা হয়েছে। এবার নিয়ে এসেছে এক নেপালি তরুণকে।

তার নাম ইমন দর্জি। রানা লক্ষ করল তার সঙ্গে ইমন দর্জির চেহারা না মিললেও, কাঠামোটা খুব মেলে। সে-ও সুদর্শন আর সুবেশী। না, আগে কখনও ক্যাকটাস দ্বীপ কিংবা ক্যাসিনো আন্দামানে আসেনি সে।

কী কারণে বলা মুশকিল, নিজের গাইডকে এড়িয়ে রানার কাছাকাছি থাকার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে ওই নেপালি

তরুণের মধ্যে। ভাল করে পরিচয়ও হয়নি, অথচ এরইমধ্যে এক ফাঁকে রানাকে এক প্যাকেট দামী চুরুট প্রেজেন্ট করেছে সে।

ওদের গ্রুপে আর আছে নিঃসঙ্গ এক জার্মান সুন্দরী, নাম বেলিন্ডা ব্রুনো। মেয়েটির বয়স বেশি নয়। সব ট্যুরিস্টই ওর প্রতি দুর্বল, বিশেষ করে নেপালি তরুণ ইমন দর্জি আর তার গাইড সিঙ্গাপুরিয়ান তাণ্ডব সিং; কিন্তু বেলিন্ডার যত আকর্ষণ হাসিখুশি শ্রী লঙ্কান উপল ফারুকের প্রতি।

উপল ফারুক জার্মানিতে গেছে, জার্মান ভাষাও এক-আধটু বলতে পারে, এ-সব শুনে খানিক ইতস্তত করবার পর বেলিন্ডা ওর কানের কাছে ঠোঁট তুলে এনে মিষ্টি গলায় ফিসফিস করল, 'আজ সন্ধ্যায় তুমি আমাকে সঙ্গ দেবে, প্লিজ?' প্রশ্নটা করবার পর লজ্জাকাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে, প্রজাপতির ডানার মত ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলছে।

শঙ্কিত বোধ করল রানা। কী বলবে, কীভাবে বলবে ঝুঝতে পারছে না। 'তুমি...আমি...ঠিক বুঝতে পারছি না—'

'আগে সমস্যাটা শোনো, শুনলে আমাকে তুমি সাহায্য না করে পারবেই না,' নিচু গলায়, সুর করে বলল বেলিন্ডা। 'আমার স্বামী কার্ল ব্রুনো ক্যাসিনো আন্দামানে জুয়া খেলবে...'

হাঁফ ছাড়ল রানা। 'তুমি বিবাহিতা।'

'হ্যাঁ।'

'থ্যাঙ্ক গড,' বলেই চোখ দুটো সরু করল রানা। 'সেক্ষেত্রে কী কারণে অন্য কারও সঙ্গ দরকার তোমার?'

'কারও নয়, আমার শুধু তোমার সঙ্গ দরকার,' জোর দিয়ে বলল বেলিন্ডা।

বলে কী মেয়ে! তুং শানের চর নাকি? 'কিন্তু কেন?'

'তুমি আমাকে বলতে দিচ্ছ কই! এভাবে জেরা করলে কী হয়? আমাকে তো কথাই...'

'ঠিক আছে, বলো কী বলবে।'

'ও খেলবে, আর আমি ওকে পাহারা দেব,' আবার শুরু করল বেলিন্ডা। 'যেখানেই খেলতে যায় ও, আমাকে সঙ্গে যেতে হয়, তা না হলে—যে ভয়ঙ্কর নেশা—হেরে ভুত হয়ে যাবে যে!'

এই সময় রানা খেয়াল করল, নেপালি তরুণ ইমন দর্জি চোরা চোখে ওর আর বেলিন্ডার দিকে তাকাল।

'কোথায় সে ভদ্রলোক? তোমার স্বামী?' ইয়টের সেলুনে বসা লোকজনের উপর চোখ বুলাচ্ছে রানা। বিশেষ মনোযোগ না দিলেও খেয়াল করল, অ্যাপ্রন পরা দুই তরুণী স্টুয়ার্ডেস কেক আর কোল্ড ড্রিঙ্কস পরিবেশন করতে আসছে।

ওদের পিছু নিয়ে মেইন সেলুনে ঢুকল আরও দুই বার্মিজ তরুণী, পরনে হোটেল আন্দামানের লোগো আঁকা সাদা ইউনিফর্ম, কাঁধে লেখা—রিসেপশনিস্ট। মেয়ে দুটোর কাছে একটা করে ল্যাপটপ রয়েছে, আরোহীদের পাসপোর্ট আর পরিচয়-পত্র দেখে প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে নিচ্ছে কমপিউটারে।

'আমার স্বামী ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা করে,' রানার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে বেলিন্ডা। 'ব্যবসার কাজেই সিতওয়েতে এসে ক্যাসিনো আন্দামানের কথা শুনেছে। রওনা হবার ঠিক আগে খবর পেল, পোর্টে কার্গো খালাস নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে একটা দিন ওখানে থেকে যেতে হচ্ছে ওকে।'

'ও।' মাথা ঝাঁকাল রানা, ভয়-ভাবনা কেটে গিয়ে রোমান্টিক একটা ভাব চলে আসছে ওর মনে। 'কিন্তু বুঝলাম না, শুধু আমার সঙ্গ কেন দরকার তোমার?'

'কিছু মনে কোরো না, জুয়াড়িদের সাংঘাতিক ভয় করি আমি,' বলল বেলিন্ডা। 'আমি একা একটা মেয়ে... কার মনে কী আছে... কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হলো: এই মানুষটাকে বিশ্বাস করা যায়, এর দ্বারা আমার কোনও ক্ষতি হবে না। আমি আসলে চেহারা দেখে মানুষ চিনতে পারি।'

রানার বলতে ইচ্ছে করল, কিন্তু এটা তো আমার আসল চেহারা নয়! তার মানে কিচ্ছু পার না! কিন্তু তার বদলে বলল, 'আমিও তো জুয়াড়ি!'

'তাতে কী!' হেসে উঠল বেলিন্ডা। 'আমার স্বামীকে আমি চিনি—নিপাট ভদ্রলোক, মাটির মানুষ, আমি ছাড়া অন্য কোনও মেয়ের দিকে ভুলেও ফিরে তাকায় না। আমার মন বলছে, তুমিও তাই হবে। কারণ, তোমার চেহারার সঙ্গে আমার স্বামীর চেহারা অনেকটাই মেলে।'

নিজের এত গুণ আছে শুনে মেজাজটা বিগড়ে যেতে চাইছে রানার, সেই সঙ্গে মনে রঙ লাগাতে শুরু করা রোমান্টিক ভাবটা উবে যাচ্ছে কর্পূরের মত। তবু ক্ষীণ আশা জাগিয়ে রেখে জানতে চাইল ও, 'আজ সন্ধ্যায় ঠিক কী ধরনের সঙ্গ তুমি আশা করছ আমার কাছ থেকে, বেলিন্ডা?'

'তুমি যখন খেলতে বসবে, আমাকে সঙ্গে রেখো,' বলল বেলিন্ডা। 'আমি খুব লক্ষ্মী। মানে, অপয়া নই। তোমার পাশে থাকলে নির্ঘাত জিতবে তুমি। তারপর আমার সঙ্গে ডিনার খাবে।'

প্রশ্নটা করতে অনেক সাহস সঞ্চয় করতে হলো রানাকে। 'তারপর?'

পরমুহূর্তে ওর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মেইন সেলুনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সেই প্রকাণ্ডদেহী বডিগার্ড লী যান।

চোখাচোখি হতে দৃষ্টি সরিয়ে নিল সে, বিশাল শরীরটা নিয়ে হেলেদুলে সেলুনের ভিতর ঢুকল। তবে এগোল না, একপাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা হাত ট্রেঞ্চকোটের পকেটে ঢোকানো, বাকি আরোহীদের খুঁটিয়ে লক্ষ করছে।

ফিরে এসে রানার উপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। তবে দুই-তিন সেকেন্ড পর আবার সরে গেল।

'তারপর?' রানার দিকে আড়চোখে তাকাল বেলিন্ডা, প্রশ্নের জবাব দিতে ইতস্তত করছে। 'সেটা কেবল সময়ই বলতে পারে, তাই না?' ওর চোখে দুষ্টামির ঝিলিকের সঙ্গে আরও রয়েছে মধুর প্রতিশ্রুতি।

কিন্তু বেলিন্ডার কথা রানা শুনতে পাচ্ছে না, চোখের ভাষা পড়বারও সময় নেই, লী যানকে অলস পায়ে এগিয়ে আসতে দেখে ওর হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে।

তুং শানের মাথা কীভাবে কাজ করবে, আন্দাজ পাবার চেষ্টা করছে রানা। লোকটা জানে ব্যাং চি, জিনান আর দেং পির খুনি সুরাইয়ার পিছু নিয়ে গতকাল রাতে এসে তাদের এগারোতলা হেডকোয়ার্টার দেখে ফিরে গেছে। ফিরে যাওয়ার কারণ, তাদের আস্তানায় অনুপ্রবেশ করা সম্ভব নয়। তবে লোকটা যে-ই হোক, হাল ছাড়বে বলে মনে হয় না; আজ প্রকাশ্য দিবালোকে ভিতরে ঢোকার সুযোগটা অবশ্যই নেবে। কাজেই খুনিটাকে সনাক্ত করবার জন্য ইয়টে লী যানের থাকা দরকার।

সে-কারণেই এখানে দেখা যাচ্ছে লী যানকে। খুনিকে সনাক্ত করতে এসেছে সে।

পা দুটো একটু ফাঁক করল রানা, প্রয়োজন হলে যাতে অনায়াসে লাফ দিতে পারে। দৈত্যটার চোখ ফাঁকি দিয়ে জ্যাকেটের দুটো বোতামও খুলে রাখল, প্যান্টের ভিতর বেল্টের সঙ্গে আটকানো হোলস্টার থেকে পিস্তলটা দ্রুত বের করতে সুবিধে হবে।

স্টুয়ার্ডেসের ট্রে থেকে টিশুপেপার মোড়া একপিস কেক তুলে বেলিন্ডার হাতে ধরিয়ে দিল রানা, নিজে শুধু একটা ঠাণ্ডা স্প্রাইট নিল।

ওর দিকে এগিয়ে আসছে লী যান। দম আটকে অপেক্ষা করছে রানা। ওর সামনে চলে এল সে, অলস পায়ে হাঁটছে। অথচ ওর দিকে নয়, ওর আরেকপাশের সিটে বসা নেপালি

তরুণ ইমন দর্জিকে দেখছে দৈত্যটা খুঁটিয়ে।

রানা ঠিক বুঝতে পারছে না স্বস্তি বোধ করবে কি না। লী যান কি তা হলে প্রথম থেকে ওকে নয়, ইমন দর্জিকেই দেখছিল? তাই যদি হয়—কেন? থানথামার সেই কানে-কম-শোনা আধ-বুড়ো লোকটার সঙ্গে চেহারার মিল আছে বলে?

ঘাড় ফিরিয়ে ইমন দর্জির দিকে তাকাল রানা। একই সময়ে সে-ও তাকাল, ফলে চোখাচোখি হয়ে গেল।

মনটা খুঁত খুঁত করছে রানার। কে এই তরুণ?

ওদের কেক আর ড্রিঙ্কস শেষ হয়েছে, এই সময় ল্যাপটপ নিয়ে সামনে চলে এল ইউনিফর্ম পরা দুই বার্মিজ রিসেপশনিস্ট। সবার দেখাদেখি রানা আর বেলিন্ডাও যে যার পাসপোর্ট আর পরিচয়-পত্র বের করে ধরিয়ে দিল মেয়ে দুটোর হাতে।

রানার সব কাগজই জাল, তবে শাহিন সিরাজ গ্যারান্টি দিয়ে বলেছে কারও সাধ্য নেই যে ধরে।

প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো ল্যাপটপে তোলা হচ্ছে, এই সময় রানা খেয়াল করল ওর একটু পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে লী যান, ওদের কাগজ-পত্রের উপর সে-ও চোখ বুলাচ্ছে।

কাজটা শেষ হতে রিসেপশনিস্টদের একজন জানাল, 'আন্দামানে আপনাদের নাম লেখানো হয়ে গেল। এরপর শুধু এক সময় রিসেপশনে গিয়ে একটা করে সই করবেন, ব্যস। বিরক্ত করার জন্যে সত্যিই দুঃখিত।'

এরপর যতক্ষণ মেইন সেলুনে থাকল মেয়ে দুটো, লী যানও ওদের সঙ্গে ছায়ার মত লেগে রইল। একসময় তিনজনই একসঙ্গে বেরিয়ে গেল সেলুন থেকে।

লী যান আপাতত দৃষ্টিসীমা থেকে বিদায় নিলেও, ইয়টে তার উপস্থিতি অশুভ একটা লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে রানার। তাকে দেখামাত্র সুরাইয়ার কথা মনে পড়ে গেছে ওর। উদ্বেগটা নতুন করে জেঁকে বসেছে মনে। কে জানে, কেমন আছে মেয়েটা!

আজ ইয়টটা কাল রাতের সেই প্রাইভেট জেটিতে ভিড়ল না, ঘুরে দক্ষিণ-পশ্চিমে চলে এল। এখানে বোট ক্লাবের পাশেই বিরাট ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি রয়েছে—অনেকগুলো জেটি, প্রতিটিতে কোনও না কোনও হোটেলের নাম লেখা। হোটেল আন্দামানের নামে তিনটে জেটি দেখল রানা। একই রকম দেখতে আরও দুটো ইয়ট আগেই নোঙর করা রয়েছে ওখানে।

জেটি থেকে নামতেই তরুণী বার্মিজ মেয়েরা—পরনে আঁটসাঁট সারং আর খাটো ব্লাউজ, মাথায় হোটেল আন্দামান লেখা ক্যাপ—দুই সারিতে দাঁড়িয়ে অতিথিদের গায়ে ফুলের পাপড়ি ছড়াল।

তারপর এয়ারকুলার লাগানো মাইক্রোবাসে তোলা হলো ওদেরকে।

ওদের পিছু নিয়ে এসে লী যানও উঠল গাড়িটায়। এবার তার সঙ্গে আরেকজনকে দেখল রানা, এ-ও বিশালদেহী একজন চিনা। ড্রাইভারের দু'পাশে বসল তারা।

ক্যাসিনো আন্দামানে যাওয়ার সময় রাস্তায় প্রাইভেট কার খুব কমই দেখল রানা। সবই হয় কোনও হোটেলের গাড়ি, নয়তো রেন্ট-আ-কার কোম্পানি থেকে ভাড়া করা।

আজও এগারো তলা দালানটার বিরাট ফটক বন্ধ দেখল রানা। বোর্ডওয়াকটা সরু, শুধু হাঁটার জন্য তৈরি করা হয়েছে। তবে গলফ কার্টও চালানো যায়, কাল রাতে অন্তত চালাতে দেখেছে ও।

মাইক্রোবাস এগোচ্ছে পাকা চওড়া রাস্তা ধরে। ভিউ মিররে চোখ রেখে আরোহীদের উপর চোখ বুলাচ্ছে লী যান আর তার সঙ্গী। রানা খেয়াল করল, ওর দিকে তাকালেও, তাকানোর ধরনটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ইমন দর্জিকে অত্যন্ত সতর্ক চোখে দেখছে সে, যতবার দেখছে ততবারই কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠছে চোখ দুটো।

অভিনয়? ভাবল রানা। অসম্ভব নয়।

লী যান হয়তো সন্দেহ করেছে কাল সন্ধ্যায় দেং পিকে খুন করে তাদের পিছু নিয়ে রানাই এসেছিল ক্যাকটাস দ্বীপে, কিন্তু ওর মনে হয়তো একটা মিথ্যে নিরাপত্তা বোধ জাগাবার জন্য বারবার সন্দেহের দৃষ্টিতে ইমন দর্জির দিকে তাকাচ্ছে।

আশপাশে কোথাও রেইডার ভ্যানটাকে দেখা না গেলেও, রানা জানে বিল্ডিঙের ভিতর থেকে ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের সাহায্যে নজর রাখা হচ্ছে ওদের মাইক্রোবাসের উপর। লী যান আর তার সঙ্গী যখন নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলতে ব্যস্ত, জানালা দিয়ে মাথা বের করে আকাশ দেখবার ছলে বিল্ডিংটার ছাদের দিকে তাকাল ও। কিন্তু এদিক থেকে সেই দোচালাটা দেখতে পেল না।

কাল রাতে চোখে পড়েনি—গলফ কোর্সটা আসলে বিল্ডিঙের পিছনদিকে সাগরের কিনারা পর্যন্ত বিস্তৃত; ওদিকটায়, একপাশে, একটা হেলিপোর্ট। বিভিন্ন আকারের তিনটে হেলিকপ্টার রয়েছে ওখানে।

মাইক্রোবাস যখন পঞ্চাশ গজ দূরে, বিরাট ফটক খুলে গেল। ভিতরে কোনও গার্ড নেই, নেই কোনও দারোয়ান, কোথাও থেকে বোতাম টিপে খোলা হয়েছে ওটা। নিশ্চয়ই কোনও মনিটরের স্ক্রিনে মাইক্রোবাসটাকে আসতে দেখেছে কেউ, ফটক খোলার বোতামটা সে-ই টিপেছে।

মাইক্রোবাসের পিছনে ফটকটা বন্ধ হওয়ার পর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। দেখল, এমনকী ফটকের গায়ে বসানো গেটটা খোলার জন্যও কোনও মানুষ রাখা হয়নি। ওখানে একটা রোবট দাঁড়িয়ে আছে, হাত দুটো অস্বাভাবিক লম্বা। এ-ধরনের রোবট আগেও দেখেছে ও, রিসিভারে নির্দেশ পেলে যান্ত্রিক হাত দিয়ে অনেক কাজ করতে পারে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে গেটটা খোলে আর বন্ধ করে।

বিল্ডিংটা এয়ারটাইট, কোথাও দিয়ে এক বিন্দু আলো-বাতাস ঢোকার উপায় নেই; তবে ভিতরটা উজ্জ্বল দিনের মতই আলোকিত। সিলিঙের অদৃশ্য কোনও উৎস থেকে আসা সাদা ও ঠাণ্ডা আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে আছে।

মাইক্রোবাস থামল গ্যারেজের ভিতর। ঢোকার মুখেই দুজন সশস্ত্র গার্ড।

রানা লক্ষ করল, গ্যারেজ থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড বেযমেন্টে নামবার জন্য তালা দেওয়া লোহার একটা গেট রয়েছে। গেটের ভিতর ও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একজন করে রাইফেলধারী প্রহরী। গেটের পাশে, গ্যারেজের ভিতর, একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। ওটা সম্ভবত সার্ভিস এলিভেটর, ভাবল রানা।

গ্যারেজে দুটো রোলস রয়েস সহ এক ডজন দামি গাড়ি দেখল রানা। কেউ একজন মাইক্রোবাসের ড্রাইভারকে প্রশ্ন করতে তার বদলে জবাব দিল লী যান: 'হোটেল ও ক্যাসিনোর মালিক মিস্টার তুং শানের ব্যক্তিগত বাহন ওগুলো।'

লী যানের হাবভাব আর আচরণের উপর বিশেষ নজর রাখছিল রানা। কেন যেন ওর সন্দেহ হলো গাড়িটা হোটেলের ভিতর ঢোকার পর থেকেই ওর দিকে তার তাকানোর ধরনটা অদ্ভুতভাবে পাল্টে গেছে। এখন শুধু ইমন দর্জির উপর নয়, ওর দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে-সে।

একটু পর আরও নিরেট প্রমাণ পাওয়া গেল।

মাইক্রোবাস থেকে নামবার পর ওদেরকে পথ দেখাল লী যান ও তার সঙ্গী। এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছে ওরা। তার ঠিক পিছনেই রয়েছে রানা। ওর পাশে রয়েছে বেলিন্ডা।

শরীরটা প্রকাণ্ড হলে কী হবে, ধাপ বেয়ে তরতর করে উঠে যাচ্ছে লী যান। তার সেই ছন্দের সঙ্গে মিল রেখে রানাও উঠছে।

কিন্তু হঠাৎ কী যে হলো, ধাপের উপর ধপ করে বসে পড়ল

লী যান।

রানার চোখ ছিল তার ঘাড়ের উপর, সে বসে পড়বার এক সেকেন্ড আগে সেটাকে শক্ত হয়ে যেতে দেখেছে ও, ফলে একেবারে শেষ মুহূর্তে হলেও সাবধান হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও লী যানের পিঠে একটা হাত ঠেকিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে হলো ওকে।

রানা বুঝল, লী যান আশা করেছিল ওর পিঠে হুমড়ি খেয়ে পড়বে ও, আর ঠিক তখনই সিধে হতে শুরু করবে সে—ফলে তার পিঠ থেকে ডিগবাজি খেয়ে সামনের ধাপে ছিটকে পড়বে ও, হাড়গোড় কিছু না কিছু একটা নির্ঘাত ভাঙবে।

কিন্তু সেরকম কিছু না ঘটায় লী যান মোটেও হতাশ হলো না। পরিস্থিতিটা দ্রুত স্বাভাবিক করে নিল সে। ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল, চোখ-মুখ এমনভাবে কুঁচকে রেখেছে যেন তীব্র ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে, বলল, 'দুঃখিত, সার, সত্যিই দুঃখিত! ক্র্যাম্প, সার, মরে যাচ্ছি—'

রানার মনে হলো ব্যথা পাওয়ার মিথ্যে ভান করছে লোকটা। যে-কোনও কারণেই হোক, তার সরু চিনা চোখ দুটোয় তৃপ্তির হাসি লেগে রয়েছে।

অমায়িক হেসে তার বিশাল পিঠে হাত বুলিয়ে দিল রানা, বলল, 'একটু পর ঠিক হয়ে যাবে। তোমার পিঠে লাগেনি তো?' নিজেকে সাবধান করে দিল ও, প্রতি মুহূর্ত সাবধানে থাকতে হবে ওকে।

আড়ষ্ট হাসি দেখা গেল লী যানের ঠোঁটে। 'আরে, সত্যি তাই! এরইমধ্যে ব্যথাটা চলে যাচ্ছে।' ধীরে ধীরে সিধে হলো সে, আবার ধাপ বেয়ে উঠছে।

এতক্ষণে ব্যাপারটা রানার মাথায় ঢুকল।

খুব চাতুর্যের সঙ্গে বোকা বানানো হয়েছে ওকে! রানা তাদের কাউকে খুন করেছে কি না, কাল সন্ধ্যায় ক্যাকটাস দ্বীপে ও

এসেছিল কি না, এ-সবের কিছুই জানা নেই লী যানের; তবে যে-কোনও কারণেই হোক রানাকে তার সন্দেহ হয়েছে।

সেই সন্দেহ অমূলক কি না জানবার জন্য রানার একটা পরীক্ষা নিয়েছে সে। আর সেই পরীক্ষাটায় ডাব্বা মেরেছে ও।

হঠাৎ বসে পড়ে লী যান জানতে চেয়েছে রানার রিফ্লেক্স কী রকম। ওর রিফ্লেক্স দারুণ, ট্রেনিং পাওয়া একজন এসপিওনাজ এজেন্ট, পুলিশ অফিসার কিংবা কোনও সেনা সদস্যের এতটা ভাল হওয়ার কথা, এটা প্রমাণ করে দিয়ে পরীক্ষাটায় ফেল করেছে ও।

লী যান এখন থেকে ওর পিছনে ছায়ার মত লেগে থাকবে।

রানার কানে ফিসফিস করল বেলিন্ডা। 'শরীর অত বড় হওয়া ভাল নয়। উম্‌ম্‌, একটা কথা বলব?'

রানার মনে হলো বেলিন্ডার গলার সুরে কী যেন একটা আছে। 'কী?'

'লোকটার কি সত্যি ক্র্যাম্প হয়েছিল?' মাথা নাড়ল বেলিন্ডা। 'কেন যেন আমার ঠিক বিশ্বাস হয়নি।'

'ধ্যাত, অবিশ্বাস করার কী আছে?'

লী যানের পিছু নিয়ে দোতালার বিশাল লাউঞ্জে উঠে এল ওরা। এখানে, রিসেপশন ডেস্কের পাশে, ওদের জন্য রুম সার্ভিসের বারোজন ইউনিফর্ম পরা সদস্যা অপেক্ষা করছে।

দেখা গেল হোটেলের খাতায় বারোজন অতিথির নাম ইত্যাদি লেখার কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে, ওদেরকে শুধু খাতার নির্দিষ্ট জায়গায় সই করতে হলো। কেউ সাতদিন, আবার কেউ একদিনের জন্য স্যুইট ভাড়া করল, উপল ফারুক ওরফে রানা করল তিনদিনের জন্য।

রানার বাহাত্তর নম্বর স্যুইটটা চারতলায়, এলিভেটর আর সিঁড়ির পাশে।

চিফ রিসেপশনিস্ট মধ্যবয়স্ক ইউরোপিয়ান, চাবির গোছাটা

রানার হাতে ধরিয়ে দেওয়ার সময় উপস্থিত সবার উদ্দেশে সবিনয়ে বলল, 'একতলায় রিসেপশন, গ্যারেজ আর গোডাউন। দুই-তিন, এই দুটো ফ্লোর নিয়ে ক্যাসিনো। চার-পাঁচ-ছয়, এই তিনটেতে হোটেল ও রেস্তোরাঁ। সব মিলিয়ে এই ছ'টা ফ্লোরই শুধু সম্মানিত বোর্ডারদের জন্য উন্মুক্ত, বাকি আর সব ফ্লোর প্রাইভেট এরিয়া—প্রবেশ নিষেধ।' কথার শেষে, বিষয়টাকে হালকা করবার জন্য, সকৌতুকে একটা চোখ টিপল সে।

'কেন, প্রবেশ নিষেধ কেন?' মেয়েলি কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইল বেলিন্ডা, হাসছে। 'ওখানে বুঝি বাঘ-ভালুক ছেড়ে রাখা হয়েছে, ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে?'

অমায়িক হেসে জবাব দিল চিফ রিসেপশনিস্ট। 'সাত-আট-নয়, এই তিনটেতে বিল্ডিঙের মালিক মিস্টার তুং শানের অফিস। দশ আর এগারো ফ্যামিলি কোয়ার্টার।'

তাণ্ডব সিং গম্ভীর সুরে বলল, 'ফ্যামিলি কোয়ার্টারের প্রাইভেসি থাকতে হবে, উঁকি-ঝুঁকি না মারাই ভাল।'

নিট হোপ জানতে চাইল, 'ক্যাসিনো আর হোটেল ছাড়া আর কী ব্যবসা করেন তিনি যে এত বিশাল আকারের তিন-তিনটে ফ্লোর দরকার হয় তাঁর অফিস হিসাবে?'

'মিস্টার তুং শান শিপিং টাইকুন,' শান্ত স্বাভাবিক সুরে জবাব দিল চিফ রিসেপশনিস্ট। 'তবে প্রচারবিমুখ হওয়ায় খুব কম লোকই তাঁর নাম জানেন।'

'ভদ্রলোক বিয়ে করেছেন?' আবার প্রশ্ন করল বেলিন্ডা। 'কটা ছেলেমেয়ে?'

হেসে উঠে মাথা নাড়ল ফরাসি চিফ রিসেপশনিস্ট। 'ব্যবসায় সময় দিতে হওয়ায় এখনও বিয়ে করার সুযোগ তিনি পাননি।'

রানা ভাবল, যে লোক বিয়ে করেনি তার বসবাসের জন্য বিশাল দুটো ফ্লোর লাগবে কেন?

এই সময় রানাকে চমকে দিয়ে পিছন থেকে কেউ একজন

পরিষ্কার বাংলায় ফিসফিস করল, 'হঠাৎ তাকাবেন না। আমি বোধহয় ওদের চোখে ধরা পড়ে গেছি। আপনার সাহায্য দরকার হবে। দয়া করে সাড়ে ছ'টার সময় বেলিন্ডার স্যুইটে থাকবেন।'

মানা যখন করেছে, সঙ্গে সঙ্গে রানা তাকাল না। কিন্তু একটু পর ঘাড় ফেরাতে ওর সরাসরি পিছনে কাউকেই দেখতে পেল না। কাছাকাছি রয়েছে তাণ্ডব সিং আর পিট হোপ। দুজনের কারুরই বাংলা জানার কথা নয়। আরেকটু দূরে রয়েছে তিন আমিরাত শেখ; কী কারণে বলা মুশকিল তিনজনই তারা কটমট করে ইমন দর্জির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

তবে কি ইমন দর্জিই মেসেজটা দিয়ে দূরে সরে গেছে?

হঠাৎ করেই বর্তমান আলোচনার উপসংহার টানল চিফ রিসেপশনিস্ট। 'ছ'তলার ওপরে চেষ্টা করলেও আপনারা কেউ উঠতে পারবেন না, কারণ তালা দিয়ে বন্ধ করা আছে সিঁড়ির দরজা, দরজায় পাহারাও আছে। তবু পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করা হলো আপনারা যাতে কেউ বিব্রতকর অবস্থায় না পড়েন। ধন্যবাদ, রুম সার্ভিস এখন আপনাদেরকে যার যার স্যুইটে পৌঁছে দেবে।'

দশ

শুরু হলো ক্যাসিনো আন্দামানে উপল ফারুক ওরফে মাসুদ রানার প্রথম সান্ধ্য অভিযান।

চারতলার বাহাত্তর নম্বর স্যুইট থেকে বেরিয়ে বারান্দাগুলো

ভাল করে একবার দেখে নিল রানা। একই মাপের চার প্রস্থ বারান্দা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত, মাঝখানটা ফাঁকা, কিনারায় রেইলিং আছে, উঁকি দিয়ে নীচে তাকিয়ে সিঁড়ি, ল্যান্ডিং ও ধাপ ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না।

ডান ও বাম দিকে বারান্দা থেকে দুটো করিডর দুদিকে চলে গেছে; একটা আলোকিত, সেটার দু'পাশে বন্ধ দরজা দেখা যাচ্ছে; দ্বিতীয়টা অন্ধকার, তবে করিডরের মুখে একটা নিওনসাইন জ্বলছে, তাতে লেখা—রেস্তোরাঁ [আপাতত বন্ধ]। দুই করিডরের পাশেই আরও এক প্রস্থ করে সিঁড়ি আছে, তবে এগুলো সরু।

বারান্দার সঙ্গে কামরা আর স্যুইটগুলোর একটাতেও কোনও জানালা নেই। বারান্দায় কেউ ঘুরঘুর করছে না। সিলিং বা থামের মাথা, কোথাও গোপন ক্যামেরার লুকানো লেন্স নেই।

সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায় উঠল রানা। গন্তব্য ছয়তলা, তবে পাঁচতলাটাও ভাল করে দেখে নিল। এ-ও চারতলার মত, কোথাও কোনও ইলেকট্রনিক কিংবা চর্মচক্ষু নেই। দুটো করিডরই আলোকিত।

তবে ছয়তলাটা একটু অন্য রকম। এই ফ্লোরটা বোর্ডারদের জন্য শেষ সীমাও বটে।

ছয়তলার ফ্লোরে পা রেখেই সাততলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে ইস্পাতের পুরু পাত দিয়ে তৈরি একটা গেট দেখল রানা। গেটের গায়ে একটা কী হোল, এত বড় কী হোল জীবনে দেখেনি ও।

গেটের একপাশে একটা এলিভেটর। ওটার কী হোলও অদ্ভুত আকৃতির—পাশাপাশি দুটো চৌকো ফুটো। গেট ও এলিভেটরের সামনে দুজন সশস্ত্র চিনা গার্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাঁধে অটোমেটিক রাইফেল ছাড়াও হিপ হোলস্টারে ঝুলছে পিস্তল।

নাহ্, তালা দুটো খোলা ওর দ্বারা সম্ভব নয়!

ধাপ বেয়ে রানাকে ছয়তালায় উঠে আসতে দেখে সম্মান দেখাতে অ্যাটেনশন হলো তারা, তারপর আড়ষ্ট হেসে অতিরিক্ত বিনয়ের সঙ্গে একজন জানতে চাইল, 'জী, বলুন, সার? কোথায় যাবেন, প্লিজ?' ভাঙা ভাঙা ইংরেজি, তবে বুঝতে কোনও অসুবিধে হলো না।

অসন্তোষ প্রকাশ করবার সুযোগটা ছাড়ল না রানা। 'কোথায় যাব তোমাকে বলতে হবে কেন? হোটেল আন্দামানে কি কোনও প্রাইভেসি নেই?'

এরকম বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, নার্ভাস হয়ে চুপ করে থাকল দুই চিনা, বোকার মত পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে।

গার্ড দুজনকে পাশ কাটিয়ে একশ' বারো নম্বর স্যুইটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। সেটা এই একই বারান্দায়, গার্ডদের কাছ থেকে মাত্র পনের ফুট দূরে। দরজায় তিনবার নক করল ও। ভাবল, রহস্যময় ব্যক্তিটি কি এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে বেলিন্ডার স্যুইটে?

বারান্দার কোথায় কী আছে চোখ বুলিয়ে ভাল করে দেখে নিচ্ছে রানা। কয়েক প্রস্থ সিঁড়ি ও এলিভেটর দেখতে পাচ্ছে ও।

একদিকের সিঁড়ি আর এলিভেটর দিয়ে শুধু ছয়তলা থেকে উপরদিকে ওঠা-নামা করা যায়—সিঁড়িতে রয়েছে ইস্পাতের দরজা আর এলিভেটর, দুটোতেই তালা লাগানোর ব্যবস্থা আছে।

আরও কয়েক প্রস্থ সিঁড়ি ও এলিভেটর দিয়ে শুধু ছয়তলা থেকে নীচের দিকে ওঠা-নামা করা যায়। এই সিঁড়িগুলোয় কোনও দরজা নেই, কাজেই তালা দেয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তবে এলিভেটরে তালা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

জানত রানা আসছে, সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিল জার্মান সুন্দরী বেলিন্ডা ব্রুনো। 'হাই! কাম ইন।'

'এরা তোমাকে কোনও রকম ডিসটার্ব করে নাকি?' স্যুইটে

ঢোকার সময় ইশারায় গার্ড দুজনকে দেখিয়ে জানতে চাইল রানা। গলার আওয়াজ যথেষ্ট চড়া, তারাও যাতে শুনতে পায়।

'করে না মানে?' অস্বাভাবিক চড়া শোনাল বেলিন্ডার গলা, সন্দেহ নেই মেজাজটা কোনও কারণে তেতো হয়ে আছে। 'দরজা খুললেই জানতে চায় কোথায় যাব। ম্যানেজমেন্টকে অভিযোগ করা উচিত—'

রানা ভিতরে ঢুকতে দরজা বন্ধ করে দিল মেয়েটা। তারপর পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে সিটিং রুমের সোফায় বসাল। নিজে বসল ওর দিকে পিছন ফিরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে, তবে আয়নায় ওকে দেখতে পাচ্ছে। 'এখুনি হয়ে যাবে আমার, আর পাঁচ মিনিট।' ড্রেসিং টেবিলের উপর পড়ে থাকা হাতব্যাগটা টেনে নিয়ে খুলল, অত্যন্ত পুরানো ছোট্ট একটা পিস্তল বের করল ওটার ভিতর থেকে। 'কফি খাবে? খেলে ইন্টারকমে রুম সার্ভিসকে বলো।'

'না, অত সময় পাওয়া যাবে না,' সিটিং রুমের চারদিকে চোখ বুলিয়ে বলল রানা। কোথায়, ভাবল ও।

ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক সাড়ে ছ'টায় এখানে পৌঁছেছে ও। কিন্তু বাংলায় ফিসফিস করা রহস্যময় ব্যক্তিটি দেখা যাচ্ছে তার কথা রাখেনি।

অপেক্ষা করো। এক-আধটু তো দেরি হতেই পারে। আচ্ছা, বেলিন্ডাকে জিজ্ঞেস করে দেখবে নাকি, কোনও মেসেজ পেয়েছে কি না?

'ফারুক,' ডেসিং টেবিলের সামনে থেকে ডাকল বেলিন্ডা, আয়নার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। ছোট্ট পিস্তলটা শক্ত করে ধরে আছে, রানাকে সেটা দেখতে দিচ্ছে না।

'বলো,' উৎকর্ণ হলো রানা।

'একটা প্রশ্ন। তুমি আসলে কে? আমার...'

দ্রুত সিট ছেড়ে ওঠার সময় নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল

ঠেকিয়ে ওকে চুপ করিয়ে দিল রানা। বেলিন্ডা কী বলবে জানা নেই ওর, তবে সন্দেহ করছে এই স্যুইটেও যান্ত্রিক ছারপোকা থাকতে পারে। আধ ঘণ্টা সার্চ করে নিজের সিটিং রুমে তিনটে পেয়েছে ও।

কোথায় পাওয়া যাবে জানা থাকায় মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে এখান থেকেও তিনটে খুদে মাইক্রোফোন বের করে ফেলল রানা। বেডরুমে রেখে এল ওগুলো।

চোখ দুটো বড় বড় করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল বেলিন্ডা। তারপর নিজের বুকের মাঝখানে একটা আঙুল রেখে বলল, 'আমার স্বামী কার্ল আমাকে সন্দেহ করে? আমার পেছনে টিকটিকি লাগিয়েছে, এ-সব তার কাজ?' মাথা নাড়ছে, অর্থাৎ নিজেই এ-সব বিশ্বাস করে না।

রানাও মাথা নাড়ল। 'পরে বলছি। আগে তোমার কথা শুনব।'

'কে তুমি?' সরাসরি জানতে চাইল বেলিন্ডা।

'হঠাৎ জানতে চাইছ যে?'

'আমার তৃতীয় একটা চোখ আছে, জুয়াড়ি হওয়া সত্ত্বেও তোমার মধ্যে আশ্চর্য একটা শালীনতা বোধ, বিরল এক ধরনের সারল্য আর ঔদার্য দেখতে পেয়েছিলাম; তোমাকে এতটা কাছাকাছি আসতে দেয়ার সেটাই কারণ। কিন্তু তুমি যদি জঙ্গি হও, তোমার পেশা যদি হয় ধর্মের নামে মানুষ খুন করা, আমি খুবই হতাশ হব—নিজের অতিরিক্ত চোখটার প্রতিও আমার আর কোনও আস্থা থাকবে না।'

'এ-সব কথা কেন উঠছে তা কিন্তু তুমি বলছ না।'

'উঠছে এই জন্যে যে তুমি নক করার মিনিট পনের আগে একটা ফোন এসেছিল,' বলল বেলিন্ডা, তার চোখ-মুখ থমথম করছে। 'নিজের পরিচয় না দিয়ে এক লোক বলল, আজ সাড়ে ছয়টায় তোমার সঙ্গে তার দেখা করার কথা আছে, কিন্তু

নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় মুভ করতে পারছে না সে। আরও বলল, তার গাইডই বোধহয় তাকে ডোবাচ্ছে।'

গাইড ডোবাচ্ছে? চমকে উঠল রানা। এটা তো একটা সূত্র! তার মানে বেলিন্ডাকে ফোন করেছিল ইমন দর্জি!

এবং রিসেপশনেও নিশ্চয় সে-ই ওর কানের কাছে ফিসফিস করে বাংলায় কথা বলেছিল!

ইমন কি তা হলে ভারতীয় স্পাই? তুং শানের হেডকোয়ার্টার পেনিট্রেইট করবার জন্য তাণ্ডব সিঙের সাহায্য নিয়ে ফেঁসে গেছে? নিশ্চয়ই তাই। 'কোত্থেকে ফোন করছিল বলেছে?' বেলিন্ডাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না।'

'তারপর?' দ্রুত চিন্তা করছে রানা। ইমনের সাহায্য দরকার। কিন্তু শত্রুশিবিরের ভিতরে রয়েছে ওরা, যা কিছু করবার ভেবে-চিন্তে করতে হবে ওকে। হোটেলের কত নম্বর স্যুইটে ইমন আছে সেটা জানা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু যেহেতু বিপদের মধ্যে আছে সে, তাই প্রকাশ্যে তার খবর নিতে যাওয়াটা নেহাতই বোকামি হবে।

নিজেকে নোটিশ দিয়ে রাখল রানা, কাজটা করতে হবে গভীর রাতে, সবাই যখন থাকবে ঘুমিয়ে।

'তারপর বলল,' বলে চলেছে বেলিন্ডা, 'বাংলাদেশী জঙ্গিদের একটা টিম আজ হোটেল আন্দামানে উঠবে পরিস্থিতি বোঝার জন্যে। তারা গ্রিন সিগনাল দিলে কাল কি পরশু আসছে ওদের লিডার—সালাউদ্দিন শাহ কুতুব!'

'হায় খোদা!' বিড় বিড় করল রানা।

'আরও বলল—মিস্টার ফারুক যেন ওই লোককে ছুটি দিয়ে দেন।'

'স্ট্রেঞ্জ!'

'সালাউদ্দিন শাহ কুতুবের নাম সবাই জানে,' থমথমে গলায়

বলল সুরাইয়া। 'শুধু জার্মানি নয়, ইউরোপের প্রায় সব দেশ তাকে খুঁজছে। অন্তত ছয়টা রাজধানীর রেলস্টেশনে বোমা মেরে সাড়ে তিনশ' অচেনা, নিরপরাধ, নিরীহ মানুষকে খুন করেছে সে। আর তোমার বন্ধু তোমাকে অনুরোধ করেছে, ওই খুনিটাকে তুমি যেন ছুটি দাও! আমি এর ব্যাখ্যা চাই, ফারুক।'

'প্রথমে তোমার ভুলটা ভাঙা দরকার,' বলল রানা। 'আমি জঙ্গি নই, বরং উল্টোটা। কিছুটা পুলিশের মত বলতে পার। আমার অনেক কাজের মধ্যে একটা হলো জঙ্গি দমন।'

রানার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বেলিন্ডা। 'জঙ্গি ধরাই যদি তোমার কাজ হবে, তা হলে সালাউদ্দিন শাহ কুতুবকে ছুটি দেয়ার তুমি কে?'

'ছুটির আরেকটা মানে হচ্ছে—চিরবিদায়,' বলল রানা। 'মেসেজটা যে দিয়েছে সে ও-ই অর্থেই বলেছে। আর কী বলল?'

'বলল, সে মারা যেতে পারে; সেক্ষেত্রে, সম্ভব হলে, তার স্বজনদের যেন জানানো হয় কোথায় তাকে কবর দেওয়া হয়েছে,' বলল বেলিন্ডা। 'কে এই লোক?'

সত্যি কথাই বলল রানা। 'আমি জানি না। হয়তো একই কাজে আছি আমরা।'

সন্দেহের চোখে তাকাল বেলিন্ডা। 'এখানে তুমি জঙ্গি পাবে কোথায় যে ধরতে এসেছ? আমি তো কোনও দাড়ি-টুপি দেখছি না।'

'ও, তোমার বুঝি ধারণা শুধু দাড়ি-টুপিঅলারাই জঙ্গি?' হালকা সুরে জিজ্ঞেস করল রানা। 'চেঙ্গিস খান, জ্যাক দ্য রিপার, স্ট্যালিন, হিটলার, বুশ আর ব্লেয়ারদের কী বলবে? এদের কারও তো ও-সব ছিল না বা নেই।'

ঝাড়া তিন সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর বেলিন্ডা মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমি একমত, ওরাও জঙ্গি। দুঃখিত।'

কথা না বলে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

বেলিন্ডা জানতে চাইল, 'তুমি শ্রী লঙ্কান নও।'

'না। বাংলাদেশি।'

চোখে-মুখে সমীহের ভাব ফুটল, ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসির রেখাও, তারপর প্রশংসার সুরে বলল বেলিন্ডা, 'বাংলা ভাইকে ঝুলিয়ে দিয়েছ তোমরা। এই তো কদিন আগে ঘরে তুলেছ নোবেল প্রাইজ। এখন ধরছ, যারা দুর্নীতি, সন্ত্রাস আর ক্ষমতার অপব্যবহার করে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে, তাদের। গুড, ভেরি গুড। তোমরা সত্যি পারো!'

'তুমি অনেক খবর রাখো দেখছি!'

'আমি পলিটিকাল সাইন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছি না! তোমাদের ওপর একটা চোখ রেখেছে বাইরের দুনিয়া। এত সুন্দর সম্ভাবনাময় একটা দেশকে ধর্মান্ধ জঙ্গির আত্মঘাতী বোমা আর দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদের সীমাহীন লোভ ছারখার করে দিক, কোনও সভ্য মানুষ সেটা চাইতে পারে না।'

'সালাউদ্দিন শাহ কুতুব এখানে আসছে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য,' বলল রানা। দু'হাত পিছনে বেঁধে পায়চারি শুরু করল।

হাতব্যাগ টেনে নিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার পিস্তলটা তাতে ভরছে বেলিন্ডা, হঠাৎ আয়নায় চোখ পড়তে দেখে ফেলল রানা। 'পিস্তল! আরে, তোমার হাতে পিস্তল কেন?'

'আত্মরক্ষার জন্যে, আবার কেন! এখন যেহেতু বিশ্বাস হচ্ছে তুমি জঙ্গি নও, সরিয়ে রাখছি,' বলে হাসল বেলিন্ডা। 'চিন্তা কোরো না—লাইসেন্স, সঙ্গে রাখার অনুমতি, সবই আছে।' আবার সাজগোজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

রানাও আবার পায়চারি শুরু করল। কেউ একজন চাইছে পরস্পরকে ওরা সাহায্য করুক। কে সে?

তিন আমিরাত শেখদের কেউ ছদ্মবেশী স্পাই? ভারতীয় বাঙালী? ওর পিছন থেকে সে-ই বাংলায় কথা বলেছিল? অসম্ভব নয়।

রানা ভাবছে, আজ সন্ধেটা কীভাবে কাটাবে।

দ্বীপে থাকলে সন্ধ্যা ঠিক সাতটা থেকে সোয়া সাতটার মধ্যে এলিভেটরে করে তিনতলায় নামবে তুং শান, এই তথ্যটা রুম সার্ভিসকে প্রশ্ন করে জেনেছে ও। আরও কিছু তথ্য পাওয়া গেছে তার কাছ থেকে।

তিনতলায় রুলেত, টেনপিন বোউলিং, বিলিয়ার্ড ইত্যাদি খেলা হয়। তিনতলায় নেমে দেশি-বিদেশি প্লেয়ারদের সঙ্গে পরিচিত হয় তুং শান, নিজ খরচে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শ্যাম্পেন খাওয়ায়, তবে খেলতে বসে না সাধারণত, সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় দোতলায়।

দোতলাটা শুধু তাস খেলার জন্য আলাদা করা।

দুটো ফ্লোরে এক ঘণ্টার মত থাকে সে, তারপর পাঁচ কি ছ'তলায় উঠে ডিনার খেতে বসে—সাধারণত নতুন কোনও গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে।

বেলিন্ডার সঙ্গ দেওয়ার প্রস্তাবটা লুফে নিয়েছে রানা। নিঃসঙ্গ একজন তরুণকে দেখামাত্র প্রতিপক্ষ অ্যালার্ট হয়ে যায়; কিন্তু যদি দেখা যায় একটা মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে সে, তার ব্যাপারে আর ততটা মাথা ঘামায় না।

পাঁচ মিনিটের কথা বলে সাজগোজ করতে পঁচিশ মিনিট লাগিয়ে দিল বেলিন্ডা। পুরোটা সময় সমান তালে চালিয়ে গেল স্বামীর প্রশংসা আর নিন্দা। দুটোর মাত্রা একই রকম হওয়ায় রানা বুঝতে পারল না স্বামীকে মেয়েটা ভালবাসে, না ঘৃণা করে।

সময় পাঁচগুণ বেশি নিলেও ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে নিজেকে নিখুঁত অপ্সরা বানিয়ে ছাড়ল মেয়েটা। এখন অনেকটা সুরাইয়ার কাছাকাছি লাগছে ওকে।

অবশেষে ড্রেসিং টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রানার সামনে পোজ দিল বেলিন্ডা। স্কার্টটা গাঢ় সবুজ সিল্ক, হাঁটুর ঠিক নীচে শেষ হয়েছে, মারাত্মক আঁটসাঁট; সাদা সিল্ক ব্লাউজের বুক, পিঠ,

বাহু ইত্যাদি বহু জায়গা শিল্পসম্মতভাবে চেরা, সব মিলিয়ে ওর উর্ধ্বাঙ্গ বোধহয় মাত্র কয়েক ইঞ্চি ঢাকা পড়েছে; মাথায় কারনিস সহ সোনালি একটা হ্যাট। জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে বলো তো?'

রানার বলতে ইচ্ছে করল, 'ডিলিশাস!' তবে পরস্ত্রীকে এ-ধরনের কিছু বলা উচিত নয়, তাই বলল, 'দারুণ!'

বেলিন্ডাকে নিয়ে স্যুইট থেকে বেরিয়ে এল ও। দরজায় তালা দিচ্ছে মেয়েটা, দ্রুত একবার চার প্রস্থ বারান্দার উপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা।

তিনটে বারান্দা খালি পড়ে আছে। শুধু একদিকে, সাততলায় ওঠার সিঁড়ির গোড়ায়, বন্ধ গেটের সামনে আর্মস-অ্যামিউনিশনের ডিপো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই দুই গার্ড।

রানার বাহু ধরল বেলিন্ডা, তারপর কার্পেটের উপর দিয়ে এলিভেটরের দিকে এগোল। তিনতলায়, রুলেত হলে নামবে ওরা।

ওদেরকে দেখে গার্ড দুজন এবার শুধু অ্যাটেনশন হলো না, রীতিমত কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে স্যালুট করল। তারপর একজন বলল, 'একটা কথা, সার। আমরা যদি কোনও অন্যায় করে থাকি, প্লিজ, দয়া করে মাফ করে দেবেন।'

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, দ্রুত চিন্তা চলছে মাথার ভিতর। সুরাইয়ার খবর পেতে হলে সাত থেকে এগারোতলা পর্যন্ত সার্চ করতে হবে ওকে। প্রথম বাধা এই দুজন চিনা। চেষ্টা করে দেখা দরকার হইচই বাধিয়ে দিয়ে এদেরকে এখান থেকে সরানো যায় কি না।

'কিন্তু তার আগে বলো,' নিজেকে বেলিন্ডার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লোকটাকে বলল রানা, 'এখানে কী করছ তোমরা।'

'জী?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল গার্ড। 'এই তো, সার,

মনিবের অফিস পাহারা দিচ্ছি।'

'সেটা কি এখানে, ছ'তলায়?' রীতিমত জেরা শুরু করল রানা।

'জী-না; সাত, আট আর নয় তলায়।'

'তা হলে এখানে দাঁড়িয়ে বোর্ডারদের ভয় দেখাচ্ছ কেন?' গলার সুর আরও কঠিন করল রানা।

'জী? কই, না, ছি-ছি, ভয় দেখাব কেন!'

'তোমাদের মনিব বুঝি ভয় পান, এরকম মজবুত গেট ভেঙে তার অফিসে ঢুকে পড়বে কেউ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সেটাকে আপনি অসম্ভব ভাবছেন কেন?' রানার পিছন থেকে জানতে চাইল কেউ।

ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল রানা। দেখল লী যানের সঙ্গী দৈত্যটা কখন যেন নিঃশব্দ পায়ে ছয়তলা বারান্দায় উঠে এসেছে। 'তুমি?' চোখের দৃষ্টি প্রশ্ন বোধক করে তুলল ও. 'তুমি কে?'

'আমি কুয়ামিন চুয়ান, হোটেল সিকিউরিটি-ইন-চার্জ, সার,' শান্ত ধৈর্যের সঙ্গে বলল লোকটা, কর্তৃত্বের সুরে। 'আপনার প্রশ্নের জবাবে জানাচ্ছি, মিস্টার তুং শানের অনেক ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। তারা স্যাবটাজ করার সুযোগ পেলে ছাড়বে না। সেজন্যেই এত সতর্কতা আর কড়াকড়ি।'

'কিন্তু তাতে যে বোর্ডারদের প্রাইভেসি নষ্ট হচ্ছে, তার কী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তা যদি হয়ে থাকে, সত্যি আমরা দুঃখিত, মিস্টার উপল ফারুক,' সবিনয়ে বলল কুয়ামিন চুয়ান, এই সুযোগে জানিয়ে দিল ওর সম্পর্কে জানা আছে তার। 'ঠিক আছে, বসের সঙ্গে কথা বলে দেখি এ-ব্যাপারে কিছু করা যায় কি না।'

'ধন্যবাদ,' বলে বেলিন্ডাকে নিজের বাহুটা আবার ধরতে দিল রানা। একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে সোজা এলিভেটরে এসে উঠল ওরা।

*

তিনতলায় পৌঁছে এলিভেটরের দরজা খুলে যেতেই বেলিন্ডার হাত ধরে কার্পেট মোড়া ক্যাসিনো হল-এ বেরিয়ে এল রানা।

হল ভর্তি সুবেশী নারী-পুরুষ বিরাট সব ক্যাসিনো টেবিলকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, গমগম করছে পরিবেশটা। যারা খেলছে, মোটা অঙ্কের দান ধরেছে, আশা-নিরাশার দোলা আর রোমাঞ্চের ছোঁয়ায় তাদের প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে উঠেছে উপভোগ্য। বাতাসে পারফিউম, শ্যাম্পেন আর চুরুটের গন্ধ, সব মিলিয়ে ভাল লাগার একটা অনুভূতি জাগায় মনে।

আর ঠিক ওই একই সময়ে বিশ ফুট সামনের অপর একটা এলিভেটরের দরজাও খুলে গেল; সেটা থেকে সুরাইয়ার হাত ধরে বেরিয়ে এল তুং শান।

দীর্ঘদেহী তুং শানের বাহুলগ্ন হয়ে রয়েছে সুরাইয়া। কিছু একটা বলে হাসি চাপার চেষ্টা করছে সুদর্শন, স্মার্ট চিনা তরুণ, কিন্তু এক মুহূর্ত পর সুরাইয়ার সংক্রামক হাসিতে সে-ও আক্রান্ত হলো।

সুরাইয়াকে বহাল তবিয়তে দেখে ধীরে ধীরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। তবে অবচেতন মনে থাকা একটা প্রশ্ন সচেতন মনে উঠে আসতে সময় নিল না: এত কেন খুশি সুরাইয়া? ওর এই স্বতঃস্ফূর্ত হাসির অর্থ কী? এই হাসি একজন ডাবল এজেন্টের নয় তো?

চিন্তাটা আপাতত মন থেকে ঝেড়ে ফেলল রানা।

তুং শান আর সুরাইয়া, দুজনেই রানা আর বেলিন্ডাকে দেখতে পেল। ওকে দেখে সুরাইয়ার কোনও প্রতিক্রিয়া না হওয়ায় খুশি রানা।

লক্ষ করল, মালয়েশিয়ান সুন্দরীর দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে জার্মান সুন্দরী। দুই তরুণী পরস্পরকে অপলক চোখে দেখছে; তবে কার মনে কী চলছে সেটা বোঝা সহজ নয়। ওরা হয়তো

কেউ কাউকে পছন্দ করছে না।

তারপর তুং শান রানাকে সতর্ক ও বিস্মিত করে দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সোজা এগিয়ে এল, ওর সামনে দাঁড়িয়ে বলল: 'আমার যদি ভুল না হয়, আপনিই আমাদের সেই সম্মানিত শ্রীলঙ্কান অতিথি—সাইয়িদ উপল ফারুক।' হলুদ হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। 'আমি তুং শান।'

হাতটা ধরল রানা। শক্ত মুঠো, শুকনো আর খসখসে; চাপ বাড়িয়ে ব্যথা দিতে যাচ্ছিল, তবে রানাও পাল্টা চাপ দিতে শুরু করায় ঢিল দিল পেশিতে। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল রানা, ইঙ্গিতে সঙ্গিনীকে দেখাল। 'আমার বান্ধবী, বেলিন্ডা।'

'হাই, বেলিন্ডা ব্রুনো!' চিনা কেতা অনুসরণ করে বেলিন্ডার উদ্দেশে মাথা নোয়াল তুং শান, তারপর ইঙ্গিতে নিজের সঙ্গিনীকে দেখিয়ে বলল, 'আমার বাগদত্তা, সুরাইয়া জেবিন।'

রানা আর বেলিন্ডা পালা করে সুরাইয়ার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল।

পরিচয় ও কুশলাদি বিনিময় শেষ হতে তুং শান ওদেরকে পথ দেখিয়ে একটা রুলেত টেবিলের দিকে নিয়ে চলল। ট্রে হাতে একজন বেয়ারাকে হেঁটে যেতে দেখে চোখ ইশারায় তাকে থামাল সে, তারপর ওদের সবার হাতে শ্যাম্পেন ভর্তি একটা করে গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা ক্যাসিনোর তরফ থেকে, প্লিজ।'

তুং শানের বাছাই করা রুলেত টেবিলের চারপাশে আগে থেকেই ভিড় জমে উঠেছে। তাদের মধ্যে পাঁচজনকে চিনতে পারল রানা। ওর দিকে পিছন ফিরে খেলায় মগ্ন আরব আমিরাতের তিন শেখ জালাল ইবনে আসাদ, শেখ ফাহাদ ইবনে কাবিল, শেখ কালাম ইবনে উমর।

টেবিলটায় আরও রয়েছে সাবেক এয়ার ভাইস মার্শাল

থাকিন মাউং আর নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট থান বানডুলা। ওদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে ওই টেবিলের অনেকেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। তুং শানকে চিনতে পেরে খেলা ছেড়ে দিল তিন শেখ।

প্রকাণ্ড সাদা বাদুড়ের মত আলখেল্লা উড়িয়ে ছুটে এল তারা। আবেগ আর উচ্ছ্বাস দেখে বোঝা গেল, তুং শানকে তারা শুধু চেনে না, তার সঙ্গে রীতিমত ঘনিষ্ঠতা আছে। আরবী ভাষায় কুশলাদি বিনিময় শুরু হলো।

অথচ, ভাবছে রানা, সবাই জানে যে ক্যাসিনোর মালিককে অপছন্দ করাটাই জুয়াড়িদের স্বাভাবিক প্রবণতা। এর সহজবোধ্য কারণ হলো, যে-কোনও জুয়ায় শেষ পর্যন্ত জুয়াড়ি হারে, ক্যাসিনো জেতে।

ছুটে এসে তুং শানকে আলিঙ্গন করল শেখ সাহেবদের লিডার শেখ জালাল ইবনে আসাদ। প্রৌঢ় আসাদের পিঠে সাদরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তুং শান।

এরপর আলিঙ্গনের জন্য ফাহাদ ইবনে কাবিল ও কালাম ইবনে উমরকেও বুক পেতে দিল তুং শান। রানা লক্ষ করল, তার এরকম আনস্মার্ট আচরণ নতুন বান্ধবী সকাইয়াকেও বিস্মিত করেছে।

সবশেষে সাবেক এয়ার ভাইস মার্শাল থাকিন মাউং আর নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট থান বানডুলার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল তুং শান অত্যন্ত আগ্রহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে। হাসিমুখে জায়গা ছেড়ে দিল মধ্যপ্রাচ্যের তিন ধনকুবের।

হঠাৎ করেই খেয়াল করল রানা, ওদের চারপাশে একদল সশস্ত্র চিনা চলে এসেছে। দাঁড়ানোর ভঙ্গি আর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে বোঝা গেল ওদের গ্রুপটাকে ঘিরে ফেলেছে তারা, তবে ভদ্রোচিত দূরত্ব বজায় রেখেই।

তুং শানও দেখল তাদেরকে; ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে কোনও ব্যাপারে যেন একটা সবুজ সংকেত দিল সে, কিংবা

হয়তো বোঝাতে চাইল তাদের সশস্ত্র উপস্থিতির প্রতি তার সমর্থন আছে।

এগারো

তিন আমিরাত শেখ আর দুই সাবেক বার্মিজ এয়ার ফোর্স অফিসারকে নিয়ে একটু দূরে সরে গেছে তুং শান। রানা লক্ষ করল, পাঁচজনকেই বিশেষ খাতির করছে ক্যাসিনো মালিক, এই মুহূর্তে এমনকী তার বোধহয় সুরাইয়ার কথাও মনে নেই।

একজন ওয়েটারকে ডেকে থাকিন মাউং আর থান বানডুলাকে শ্যাম্পেন দিতে বলল তুং শান; তবে তিন শেখের জন্য চাইল কোল্ড ড্রিঙ্কস।

সদ্য পরিচিতা সুরাইয়ার সঙ্গে লেটেস্ট ফ্যাশন নিয়ে অন্তরঙ্গ আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়েছে বেলিন্ডা; কথা বলতে বলতে দুজনেই তারা রানার পিছু নিল।

রুলেত টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। মানিব্যাগ থেকে নগদ এক হাজার ডলার বের করে রুলেত অপারেটরের কাছ থেকে চিপস কিনল।

এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে ওরা, ওদের দৃষ্টিসীমার ভিতরই তুং শান, তিন আমিরাত শেখ ও দুই সাবেক এয়ার ফোর্স অফিসারকে হাঁটাচলা করতে দেখতে পাচ্ছে।

ফ্যাশন ডিজাইন সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে ওর দু'পাশে জায়গা করে নিল দুই পরমাসুন্দরী, দর্শক ও শুভানুধ্যায়ী হিসাবে

উৎসাহ আর পরামর্শ দিচ্ছে ওকে। বেলিন্ডা বলল, 'কালো সব সময় এড়িয়ে চলা উচিত, তুমি লালে বাজি ধরো।'

'কিন্তু সংখ্যাটা কী হবে?' মৃদুকণ্ঠে জানতে চাইল সুরাইয়া।

'তুমি বলো কী হবে,' হেসে উঠে আহ্বান জানাল বেলিন্ডা, কাউকে আপন করে নিতে এক মুহূর্ত সময়ও লাগে না ওর। 'দেখি দুজনের বুদ্ধিতে মিস্টার ফারুকের কপালটা ফেভার করে কি না।'

'সব যদি আমরাই ঠিক করে দিই, খেলাটা তা হলে তো আর ওঁর থাকে না,' কিছুটা কৌতুক, কিছুটা প্রতিবাদের সুরে বলল সুরাইয়া।

'না-না, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আমি তো সব টাকা এক দানেই খেলে ফেলছি না। প্লিজ, একটা সাজেশন দিন।'

'তবু, এভাবে—' ইতস্তত করছে সুরাইয়া।

'ঠিক আছে—যদি হারি, ওখানেই শেষ,' বলল রানা। 'জিতলে চালিয়ে যাওয়া হবে। সময় পার করা আর কী। লাভের টাকা দিয়ে কিছু একটা কিনব আমরা।'

'এক-এ খেলুন। আমার প্রিয় সংখ্যা।'

একশ' ডলার বাজি ধরল রানা, এবং জিতল। চোখ তুলে তাকাতে দেখতে পেল পাঁচ বন্ধুকে নিয়ে অলস পায়ে হলরুমের আরেক দিকে সরে যাচ্ছে তুং শান, জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে কী যেন খুঁজছে সে।

কাজ হয়েছে, তাই আবারও ওদের পরামর্শে বাজি ধরা হলো—এবার লাল ঘরের পাঁচে। আবার জিতল রানা। চোরা চোখে তাকাতেই দেখল, পকেট থেকে রিঙ সহ একটা চাবি বের করল তুং শান, সেটা লিডার জালাল ইবনে আসাদের হাতে ধরিয়ে দিল।

তৃতীয় বার শুধু বেলিন্ডার ভাগ্য পরীক্ষা করা হলো। ওর

কথা অনুসারে লাল ঘরের ছয়-এ খেলল রানা। একশ' ডলার হারল।

দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হনহন করে এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে জালাল ইবনে আসাদ।

'আপনি বলেছেন হারলে আর কন্টিনিউ করা হবে না,' রানাকে স্মরণ করিয়ে দিল সুরাইয়া।

'কিন্তু আপনি তো হারেননি, কাজেই আপনার কন্টিনিউ করা চলে,' বলল রানা, তারপর হঠাৎ জ্যাকেটের পকেট হাতড়াতে শুরু করল ও। চেহারায় হতাশ একটা ভাব ফুটল। বেলিন্ডার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ধ্যাত, একটা ভুল হয়ে গেছে!'

'কী ভুল?' উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল বেলিন্ডা।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'না, মারাত্মক কিছু নয়। আমার চুরুটের প্যাকেট আর লাইটারটা বোধহয় তোমার বেডরুমে ফেলে এসেছি।'

'বেডরুমে?' বলল বেলিন্ডা, সুরাইয়ার কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি বোধ করছে। 'তুমি আবার কখন আমার বেডরুমে ঢুকলে? বলো সিটিং রুমে!'

'হ্যাঁ, বোধহয় তাই হবে,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'চলো, দেখে আসি একবার।'

'তোমাকে যেতে হবে না,' তাড়াতাড়ি বলল বেলিন্ডা। 'আমি নিয়ে আসছি।' মনে মনে রানা চাইছেও তা-ই।

টেবিল ছেড়ে দ্রুত পায়ে এগোল বেলিন্ডা, যাচ্ছে জালাল ইবনে আসাদ যেদিকে গেছে তার উল্টোদিকে। ওদিকেও একটা এলিভেটর রয়েছে।

কাছাকাছি যারা আছে তারা যে যার খেলা, নয়তো সঙ্গিনীকে নিয়ে ব্যস্ত; তুং শান আর তার চার সঙ্গীও যথেষ্ট দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে, এই ফাঁকে ঝুঁকিটা নিল রানা।

ঝুঁকি এই জন্য যে সুরাইয়া যদি ডাবল এজেন্ট হয়, তার

কাছে নিজের পরিচয় ফাঁস করবার খেসারত অবশ্যই দিতে হবে ওকে।

রুলেত টেবিলের মাঝখানে ঘুরছে ধাতব হাত, সেটার দিকে চোখ রেখে আঙুল দিয়ে টেবিলের কিনারায় ড্রাম বাজাচ্ছে সুরাইয়া।

'ওটা সম্ভবত ফাইবারগ্লাস দিয়ে বানানো,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

অকস্মাৎ কাঠ হয়ে গেল সুরাইয়া। চেহারায় বিস্ময়, অবিশ্বাস আর সচকিত একটা ভাব—ফুটে উঠেই এক নিমেষে মিলিয়ে গেল আবার। নিজেকে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারায় মনে মনে মেয়েটার প্রশংসা করল রানা।

ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সুরাইয়া। 'তুমি ট্রেনের সেই ফরহাদ!'

'হ্যাঁ।'

'তখন পরিচয় দাওনি কেন?'

'প্রয়োজন হয়নি,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা, তারপর কাজের কথা পাড়ল। 'তোমাকে ওরা সন্দেহ করেনি?'

'একটুও না,' একটা ঢোক গিলে ফিসফিস করল সুরাইয়া। 'তবে বলেছে আমার পিছু নিয়েছিল দুটো দল। ওই দু'দলের লোকজনই মিলেমিশে ব্যাং চি, জিনান আর দেং পিকে খুন করেছে।'

'কীভাবে বুঝল দুটো দল?'

'তুং শানের ধারণা, কোনও একজন লোকের পক্ষে নাকি এই কাজ অসম্ভব। একটা দলকে আমার ভক্তদের ভাড়া করা খুনি বলে সন্দেহ করছে, সেই কুয়ালালামপুর থেকে পিছু নিয়ে এসেছে তারা। আরেকটা দলকে তার ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীরা কেউ পাঠিয়েছে। এই দলের অন্তত একজন নাকি ছদ্ম-পরিচয়ে হোটেলেও ঢুকে পড়েছে।'

রানা ঠিক বুঝতে পারছে না কার কথা বোঝাতে চেয়েছে তুং শান—ওর, নাকি আর কারও? একটা ব্যাপার পরিষ্কার, তুং শানের প্রতিপক্ষ আরও কেউ একজন আছে এখানে। তার ভারতীয় কোনও এজেন্ট হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা। এদিকের জলসীমায় ওদের মিসাইল সাবমেরিন নিখোঁজ হয়েছে, কাজেই চর পাঠিয়ে নিশ্চয়ই ওরা খোঁজ-খবর নিতেই পারে।

'কিন্তু,' আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল রানা। 'তোমাকে ওরা সন্দেহ করছে না কেন?'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল সুরাইয়া, ঠোঁটে রহস্যময় এক চিলতে হাসি। 'বললে হয়তো তোমার বিশ্বাস হবে না।'

'বলে দেখো।'

'তুং শান আসলেই আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে,' বিড়বিড় করল সুরাইয়া। 'দুনিয়ার প্যাঁচ-ঘোঁচ কিছুই আমি বুঝি না, আমাকে কোনও রকম কলুষতা স্পর্শ করতে পারে না। এর মধ্যে সবচেয়ে যেটা ভয়ঙ্কর, আমাকে সত্যি সে বিয়ে করতে চায়।'

'সেরেছে!'

'লাগামটা আমার হাতে,' বলল সুরাইয়া। 'ওর কাছ থেকে আমি সময় চেয়ে নিতে পারব।' তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'বেলিন্ডা মেয়েটা—?'

'ও কেউ নয়,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'কী জানতে পেরেছ বলো।' আড়চোখে দেখল দূর থেকে ওদের দিকে চেয়ে রয়েছে তুং শান।

'জানতে পেরেছি কী কারণে কুয়ালালামপুরে গিয়েছিল তুং শান,' রানার দিকে নয়, অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলছে সুরাইয়া। 'ওখানে তিনজন বাংলাদেশী মাওলানার সঙ্গে পাঁচ হাজার কোটি টাকার একটা ব্যবসায়িক চুক্তি হয়েছে তার। এক মাওলানার নাম সালাউদ্দিন শাহ কুতুব, সে-ই লিডার। পরে

চেকটা সিঙ্গাপুরের একটা ব্যাং . নিজের অ্যাকাউন্টে জমা করেছে তুং শান।'

'তথ্যটা মিলে যাচ্ছে,' বিড়বিড় করল রানা।

'অ্যালার্ট থেকো,' অস্ফুটে বলল সুরাইয়া।

'কেন?' খেয়াল রাখছে রানা, আশপাশ থেকে কেউ ওদের কথা শুনতে চেষ্টা করছে কি না।

'ওই তিন মাওলানা আজ তুং শানের সঙ্গে দেখা করতে আসবে।' সুরাইয়াও চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে।

'কিন্তু আমার কাছে তথ্য আছে আজ তাদের সিকিউরিটি অফিসাররা আসবে। গ্রিন সিগনাল পেলে কাল আসবে মওলানা সালাউদ্দিন শাহ কুতুব।'

মাথা নাড়ল সুরাইয়া। 'তুং শান নিজে আমাকে বলেছে, আজই আসবে।'

'তাই নাকি!' রানা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

'কী হলো?'

'ওই লোকগুলো নয়তো?' ফিসফিস করল রানা। 'তিন আমিরাত শেখ?'

আবার এক সেকেন্ডের জন্য স্থির হয়ে গেল সুরাইয়া। 'অসম্ভব নয়! কিন্তু দেখে তো বাঙালী বলে মনে হলো না'

'ছদ্মবেশ নিয়ে আছে,' বলল রানা, চিন্তিত। সময়ের অভাব, দ্রুত অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'ভাল কথা, তোমাকে ওরা রেখেছে কোথায়?'

'এগারোতলার ফ্ল্যাটে আমাকে একা রাখা হয়েছে,' বলল সুরাইয়া। 'তুং শান থাকে দশতলায়। আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করছে সে, বলছে আমি নাকি সত্যিকার একজন লেডি—'

আবার ওকে থামিয়ে দিল রানা। 'বাকি তিনটে ফ্লোরে কী কাজ হয়?'

মাথা নাড়ল সুরাইয়া। 'সব ফ্লোরে আমার এখনও যাওয়া হয়নি।'

'শক্তিশালী কমিউনিকেশন আর ডিটেকশন সিস্টেমে লাগতে পারে এরকম কিছু ইকুইপমেন্ট আছে ছাদে—'

'তুমি জানলে কীভাবে!' বিস্মিত দেখাল সুরাইয়াকে।

'সেটা বড় কথা নয়,' বলল রানা। 'তুমি কিছু জানতে পেরেছ কি না বলো।'

'হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা জেনেছি আমি,' বলল সুরাইয়া। 'আমাকে নিয়ে ছাদে উঠেছিল তুং শান। ওখানে জটিল সব ইকুইপমেন্ট দেখে আমি তাকে প্রশ্ন করি। সে-ই আমাকে ব্যাখ্যা করে বলল সব।'

'কী?'

'তাইওয়ানিজ বিজ্ঞানীদের সাহায্যে আমেরিকা সহ আরও বহু দেশের স্যাটেলাইট কৌশলে ব্যবহার করছে তুং শান। চারদিকে দু'শ' মাইল পর্যন্ত রয়েছে তার নখ-দর্পণে।'

'তা কী করে সম্ভব?' বিশ্বাস করতে পারছে না রানা। 'বিনা অনুমতিতে স্যাটেলাইট থেকে কারও কোনও তথ্য নিতে পারার কথা নয়। যদি নেয়ও, ধরা পড়ে যেতে বাধ্য।'

'ওই ধরা পড়ার ভয়েই তো কোনও স্যাটেলাইট একটানা বেশিক্ষণ ব্যবহার করে না ওরা,' বলল সুরাইয়া।

'ইয়াল্লা!'

'আরও শোনো! দক্ষ তাইওয়ানিজ বিজ্ঞানীরা বাধা সৃষ্টি করায় যাদের স্যাটেলাইট তারাও অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য পায় না, অথচ তুং শান ঠিকই পায়।'

'কিন্তু কেন, কী উদ্দেশ্যে?'

'তুং শান বলছে, শিপিং লাইন-এর ব্যবসা করতে হলে এই স্যাটেলাইট ফ্যাসিলিটি তার না হলে চলবেই না,' বলল সুরাইয়া। 'ব্যবহার করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিল, না

পেয়ে শেষে এভাবে চুরি করছে।'

'তোমার কী মনে হয়?' জানতে চাইল রানা। 'তুং শান সত্যি কথা বলছে?'

মাথা নাড়ল সুরাইয়া। 'না। আমার ধারণা, এই ফ্যাসিলিটি অন্য কোনও বেআইনী কাজে ব্যবহার করছে।' হঠাৎ ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আরেকটা ব্যাপার জানতে পেরেছি, ফারুক।'

'কী?'

'বঙ্গোপসাগরের তলায় কিছু একটা করছে ওরা,' বলল সুরাইয়া। 'কী করছে তা বলতে পারব না। তুং শানকে আমি টেলিফোনে অনেকের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছি: "আরও ওয়েটসুট আনাও...সাবমারসিবল ব্যবহার করো...লংগিচিউড-ল্যাটিচিউড যেন নিখুঁত হয়, নকশাটা শুধু আমার কাছে থাকবে..." ইত্যাদি।'

একজন ওয়েটারকে ডেকে খানিকটা শ্যাম্পেন আর একবাক্স চুরুট নিল রানা।

'ওপরের ফ্লোরগুলো সার্চ করা দরকার,' সুরাইয়াকে বলল ও। 'তোমার পক্ষে কাজটা সম্ভব বলে মনে করো?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল সুরাইয়া, তারপর মাথা নাড়ল। 'তুং শান আমাকে একা ঘোরাফেরা করতে মানা করেছে।'

'সেক্ষেত্রে আমাকেই ওপরে উঠতে হবে,' বলল রানা। 'সাততলায় ওঠার দরজা আর এলিভেটরের তালা চাবি ছাড়া খোলা যাবে না। যোগাড় করতে পারবে, কারও মনে সন্দেহ না জাগিয়ে? যে-কোনও একটা হলেই চলবে।'

'চেষ্টা করে দেখব। আর কী?'

'চোখ-কান খোলা রাখো। তুং শানের দুর্বলতাকে কাজে লাগাও, দেখো গোপন কিছু জানা যায় কি না।'

'ঠিক আছে।'

বেলিন্ডাকে ফিরে আসতে দেখে চুপ করে গেল ওরা।

'কোথাও আর খুঁজতে বাকি রাখিনি,' রানার সামনে এসে বলল বেলিন্ডা। 'এ কী, তুমি চুরুট পেলে কোথেকে?'

'সরি, তোমা শুধু শুধু কষ্ট দিলাম,' বলল রানা। 'বাক্সটা আসলে এই টেবিলেই ছিল।'

'ও, আচ্ছা। এই শোনো!' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল বেলিন্ডার চোখ-মুখ। 'ছয়তলায় নেই ওরা!'

'মানে?'

'গার্ড দুজনের কথা বলছি,' বলল বেলিন্ডা। 'ওদেরকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। দেখলাম নিজেই এলিভেটরের তালা খুলে সাততলায় উঠে গেলেন আলখেল্লা পরা এক অ্যারাবিয়ান ভদ্রলোক—'

রানা আর সুরাইয়া চট করে একবার দৃষ্টি বিনিময় করল।

'আরে, কী ব্যাপার, তোমরা খেলছ না কেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল বেলিন্ডা।

'তুমি নেই, তাই জমছে না,' বলে আবার টেবিলের দিকে ফিরল রানা।

এরপর একা শুধু সুরাইয়ার ভাগ্য পরীক্ষা। বেজোড় সংখ্যা এগারো পছন্দ করল ও, কালো। জিতল রানা।

মন খারাপ করে আছে দেখে আরেকবার বেলিন্ডার ভাগ্য পরীক্ষা করা হলো। হারল রানা।

'আজ আমি কুফা, তবে শুধু রুলেতে,' ম্লান সুরে ঘোষণা করল বেলিন্ডা, তারপর রানাকে সান্ত্বনা দিল, 'দেখো, কার্ড খেলার সময় নিশ্চয়ই পুষিয়ে নিতে পারবে।'

বাজি ধরবার পরিমাণ বাড়িয়ে দিল রানা, পদ্ধতিও বদলাল। সুরাইয়ার হাতে পাঁচটা একশ' ডলারের নোট ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'প্লিজ, এবারের বাজিটা আপনি নিজের হাতে ধরুন।'

আড়ষ্ট হয়ে উঠল সুরাইয়া, আপত্তি করতে গেল, তবে শেষ

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত ব ল মাথা ঝাঁকাল। রানার হাত থেকে টাকাটা নিল ও, বাজি ধরল বেজোড় সংখ্যা নয়-এ, কালো ঘরে।

সংখ্যা বসানো গোলাকার চাকতির মাঝখানে ধাতব হাতটা এত জোরে ঘুরতে শুরু করল, চোখ দিয়ে সেটাকে অনুসরণ করা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে কমে এল গতি। তারপর একসময় সবাই দেখল তীরচিহ্ন আকৃতির ওটার মাথা স্থির হতে যাচ্ছে আট-এর ঘরে। অর্থাৎ হারল রানা। কিন্তু ধাতব তীরচিহ্ন থামতে গিয়েও থামেনি, যেন যাদুবলে আর একটু এগিয়ে গেল, তারপর কালো ঘরের মাঝখানে পৌঁছে থামল। ওখানে নয় সংখ্যাটা লেখা রয়েছে।

শ্রাগ করল সুরাইয়া, বিড়বিড় করে বলল, 'জানি না কী করে সম্ভব হচ্ছে।'

তবে বেলিন্ডা উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠায় তার কথা চাপা পড়ে গেল। 'আবার! আবার!' রানার কাঁধ খামচে ধরে ঝাঁকাচ্ছে সে।

কেউ জানে না কখন ওদের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে তুং শান। আর কেউ শুনতে না পেলেও, সুরাইয়ার কথাটা ঠিকই তার কানে গেছে। 'মিস্টার উপল ফারুক,' সরাসরি রানাকে লক্ষ্য করে সহাস্যে বলল সে। 'আপনি দেখা যাচ্ছে অন্যায় ফায়দা লুঠছেন।'

খেলা ছেড়ে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'এক্সপ্লেইন ইওরসেলফ, মিস্টার শান।' হলরুমের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দুই শেখ আর দুই সাবেক সামরিক কর্মকর্তাকে কোথাও দেখতে পেল না ও।

বারো

'ওহ্, শিওর!' রানার আহ্বানে উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিল তুং শান। 'দেখা যাচ্ছে আমার বাগদত্তা এক্সট্রাঅর্ডিনারিলি লাকি। জানা কথা, ওর এই গুণটাকে ব্যক্তিগত পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করব আমি, বিনিয়োগ করব আমার নিজের ব্যবসাতে।' খুক করে কেশে কণ্ঠস্বর আরও ধারাল করল সে। 'নিশ্চয় আপনি আশা করেন না ওর ওই গুণ থেকে আপনাকে আমি লাভবান হতে দেব?'

'অবান্তর প্রশ্ন,' বলল রানা। 'আপনি ওঁর যে গুণটাকে পুঁজি বলছেন সেটা বড় বেশি চঞ্চল, এই আছে এই নেই। তা ছাড়া, আপনার বাগদত্তার প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, জুয়া আমি অন্যের ভাগ্যে খেলি না।'

'কিন্তু আমি তো পরিষ্কার দেখলাম খেলছিলেন!'

হেসে উঠল রানা। 'আমরা সময় পার করছিলাম মাত্র।'

'ও, আচ্ছা।' বারবার উপর-নীচে মাথা দোলাল তুং শান। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'আমি শুনেছি তাস খেলাতেই আপনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।'

তুং শানের দিকে পাশ ফিরে দাঁড়াল রানা, চিপগুলো রুলেত-অপারেটরকে ফেরত দিয়ে নগদ টাকা চেয়ে নিচ্ছে। 'ঠিক শুনেছেন,' বলল ও, তারপর একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল, 'আমার সঙ্গে খেলবেন নাকি?'

'এত ছোটখাট জুয়া আমাকে টানে না,' গোপন কী যেন মনে পড়ে যাওয়ায় মুচকি একটু হাসল তুং শান। 'আমি আরও অনেক বড় দানে খেলি। তবে আপনার চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম। চলুন, দোতলায় নামি, ওখানে আমার প্রতিনিধি হিসেবে আপনার সঙ্গে সুরাইয়া খেলবে।'

'বেশ, চলুন।'

সুরাইয়া শুরু করল, 'কিন্তু তাস আমি খুব একটা ভাল—'

ওকে থামিয়ে দিয়ে তুং শান বলল, 'আরে, তিন তাস আবার কে না খেলতে জানে। তা ছাড়া, আমি তোমার পাশে আছি না!'

তার দিকে সহাস্যে কটাক্ষ হেনে বেলিন্ডা বলল, 'ঠিক আছে, দেখা যাবে, আমিও আছি মিস্টার ফারুকের পাশে।'

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, ম্যাডাম,' বলল তুং শান।

দোতলার কার্ড রুম।

এইমাত্র ব্যাংক থেকে ক্রেডিট কার্ড ভাঙিয়ে নগদ পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার আনিয়েছে তুং শান। পুরো টাকাটা দিয়েই চিপ কিনেছে সুরাইয়া।

ওদেরকে এভাবে প্রস্তুতি নিতে দেখে একটু বোধহয় ঘাবড়েই গেল বেলিন্ডা। রানার কানে ফিসফিস করল ও, 'চিন্তা কোরো না, একদম খালি হাতে আসিনি আমি—ঠেকে গেলে চালিয়ে নিতে পারব।'

কিন্তু দেখা গেল শ্রী লঙ্কান বিজনেস ম্যাগনেট উপল ফারুকও প্রস্তুত হয়েই এসেছে। ব্যাংক থেকে চেক ভাঙিয়ে ও-ও পঞ্চাশ হাজার ডলার ক্যাশ করল, তারপর ওই টাকা দিয়ে চিপ কিনল।

পাঁচজনের জন্য টেবিল সাজানো হলো। রানা আর সুরাইয়া মুখোমুখি বসেছে। বাকি তিনজন বসেছে ওদের ডানে ও বাঁয়ে। তিনজনই প্রবীণ বার্মিজ—টিন উ, মো হো ও থিন পি।

অন্য টেবিলে খেলছিল তারা তিনজন, তুং শানকে দেখে কুশল বিনিময়ের জন্য উঠে এসেছে। রানার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় শুধু বলা হয়েছে সবাই তারা সরকারী চাকুরে ছিল, অবসর নেওয়ার পর শিপ ব্রেকিং ব্যবসা শুরু করেছে, তিনজন প্রায়ই ক্যাসিনো আন্দামানে খেলতে আসে।

শিপ ব্রেকিং-এর ব্যবসা করতে বিরাট পুঁজি লাগে, ভাবল রানা, নিশ্চয়ই ঘুষ খেয়ে পুঁজি যোগাড় করেছে।

তুং শানের বাগদত্তা আর শ্রী লঙ্কান ধনকুবের বড় স্টেকে তিন তাস খেলবে শুনে ওদের সঙ্গে একই টেবিলে বসবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে তারা। তুং শান সম্মতি দিয়েছে, জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে উপল ফারুকেরও কোনও আপত্তি নেই।

আরও অন্তত বিশটা টেবিলে জমে উঠেছে খেলা। পরস্পরের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে ফেলা হয়েছে ওগুলো, প্লেয়ারদের মনোসংযোগে যাতে বিঘ্ন না ঘটে।

আগেই বলেছে তুং শান, হাই স্টেইক-এ খেলা হবে। কী নিয়মে, তাও জানিয়ে দিচ্ছে সে।

'ব্লাইন্ড পঞ্চাশ ডলার। কার্ড দেখার পর একশ' ডলার। যে-কোনও দুজনের মধ্যে খেলা চললে যত খুশি বাড়ানো যাবে, স্কাই ইজ দ্য লিমিট। কোনও অবজেকশন, মিস্টার উপল ফারুক?' সুরাইয়ার ডান পাশের চেয়ার থেকে জিজ্ঞেস করল সে।

'নো অবজেকশন,' বলে সদ্য প্যাকেট খোলা তাস বাঁটার জন্য সুরাইয়ার দিকে ঠেলে দিল রানা। 'প্লিজ।'

মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে তাস ফাটতে শুরু করল সুরাইয়া। তীক্ষ্ণ চোখে ওর হাতের মুভমেন্ট লক্ষ করছে রানা, কারণ যে-কোনও ভাল একজন এসপিওনাজ এজেন্ট জানে তাস খেলায় কীভাবে চুরি করতে হয়।

ফাটার পর কাটার জন্য বাঁ পাশে বসা থিন পি-র সামনে তাসের বান্ডিলটা রাখল সুরাইয়া। ঠিক মাঝখান থেকে বান্ডিলটা

দু'ভাগ করল থিন পি, উপরের অর্ধেক টেবিলের মাঝখানে রেখে দিল সে।

নীচের অংশটা তুলে নিয়ে ডানদিক থেকে বাঁটতে শুরু করল সুরাইয়া। ওর ডান পাশে রয়েছে তুং শান, তাকে বাদ দিয়ে টিন উ, রানা, মো হো আর থিন পিকে তাস দিল, সবশেষে নিজে নিল।

সবার সামনে এখন তিনটে করে তাস।

শুরু হলো খেলা। কেউ কোনও কথা বলছে না। প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ ব্লাইন্ড খেলল সবাই, যান্ত্রিক আড়ষ্টতার সঙ্গে টেবিলের মাঝখানে ছুঁড়ে দিচ্ছে সাদা চিপ, একেকটার মান পঞ্চাশ মার্কিন ডলার।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল, তাস তোলার নাম করছে না কেউ। খেলাটা যে উত্তেজনাকর হতে যাচ্ছে এটা তারই লক্ষণ।

বোর্ডে আড়াই হাজার ডলার জমে গেল, অর্থাৎ প্রত্যেকে পাঁচশ' ডলার করে খেলেছে। রানা বুঝে নিল, টাকা এদের কাছে খোলামকুচির চেয়েও সস্তা, ব্লাইন্ড খেলে ঝুঁকি নিতে পরোয়া করছে না।

অগত্যা নিজের তাস তুলে দেখল রানা। প্রথমটা স্পেড-এর দুই, তারপর হার্ট-এর টেক্কা, শেষ কার্ড ডায়মন্ড-এর আরেকটা দুই। ব্লাইন্ডে দুই-এর জোড়া খারাপ কার্ড নয়, বোর্ডে একটা কালো চিপ রাখল রানা—প্রতিটির মূল্যমান একশ' ডলার। মো হো ব্লাইন্ড খেলল, কাজেই নিজের তাস দেখতে হলো থিন পিকে। কার্ড দেখে বসে পড়ল সে। এবার সুরাইয়ার পালা, নিজের কার্ড দেখতে বাধ্য ও। কার্ড দেখছে, ওর মাথার সঙ্গে তুং শানের মাথা সেঁটে এল, দুজন একসঙ্গে দেখছে।

দেখা শেষ হতে কার্ডটা নিজের সামনে নামিয়ে রাখল সুরাইয়া। তার হয়ে বোর্ডে একটা কালো চিপ রাখল তুং শান, চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনা।

কার্ড দেখে বসে পড়ল টিন উ। খেলা চলল তিনজনের মধ্যে। রানা ও সুরাইয়া নিজেদের কার্ড দেখেছে, তাই ওদেরকে একশ' ডলার করে দিতে হচ্ছে বোর্ডে, আর মো হো নিজের কার্ড না দেখায় তাকে দিতে হচ্ছে মাত্র পঞ্চাশ ডলার।

তবে এভাবে তিনবার খেলতে পারল সে। তারপর তাকেও নিজের কার্ড দেখতে হলো।

ভাল কার্ড পায়নি, কাজেই নিঃশব্দে বসে পড়ল মো হো, অর্থাৎ অফ হয়ে গেল।

খেলা এখন সুরাইয়া আর রানার মধ্যে। সুরাইয়ার ভাব দেখে মনে হলো, শো দিতে রাজি নয়। তার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে কিছু বলল তুং শান। স্টেইক বাড়িয়ে দিল সুরাইয়া, বোর্ডে একজোড়া কালো চিপ রাখল।

এত ছোট কার্ড নিয়ে খেলা চালিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না, বোঝে রানা, তবে জানা দরকার সুরাইয়া ধোঁকা দিচ্ছে কি না। জানতে হলে দুশ' ডলার ছাড়তে হবে ওকে। তা হোক, বোর্ডে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ডলার জমেছে।

কিন্তু কী এক অজ্ঞাত কারণে তা জানবার কোনও চেষ্টাই করল না রানা, টেবিলে পড়ে থাকা তাসের সঙ্গে নিজের তাস মিলিয়ে ফেলে বলল, 'শুধু একটা টেক্কা নিয়ে শো দেয়া যায় না।'

ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল বেলিন্ডা। তবে মুখে কুলুপ এঁটে রাখল, ধরে নিল এরকম বোকার মত হারবার পিছনে নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে ওর। ভাবল, আফটারঅল একজন পুলিশ অফিসার না!

'নতুন কথা শোনালেন দেখছি, মিস্টার ফারুক! এমন কেউ আছে নাকি যে টেক্কা পেলে শো দেয় না?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল তুং শান। 'আপনি সম্ভবত লোভে পড়ে জ্যাক-ট্যাক নিয়ে চলে এসেছিলেন।'

কথা না বলে সামান্য একটু মুচকি হাসল রানা।

জিতল সুরাইয়া, তবে কী কার্ড পেয়েছিল তা কাউকে দেখাল না—যেহেতু রানা শো-র টাকা দেয়নি।

অন্যান্য টেবিলের মত ওদের টেবিলেও তেমন কোনও শব্দ নেই। খেলায় কেউ কারচুপি করছে না, করলেও তা ধরবার সাধ্য নেই কারও। এবং রুলেতের মত তাসেও বারবার শুধু সুরাইয়াই জিতছে।

'আরে, এটা তো কাকতালীয় কিছু নয়! শুধু মোস্ট বিউটিফুল গার্ল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড নয়, একই সঙ্গে সত্যি সত্যি একটা পরশপাথরও পেয়ে গেছি আমি!' উল্লাসে অধীর হয়ে উঠল তুং শান।

শুনে মিটিমিটি হাসল রানা, কোনও মন্তব্য করল না।

'ভাব দেখে মনে হচ্ছে,' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল তুং শান, 'মিস্টার ফারুক আজ হয়তো খুব বড় ধরনের একটা অ্যাক্সিডেন্ট করবেন—'

'সরি, একটু বুঝিয়ে বলবেন?' চোখ তুলে জানতে চাইল রানা, বোঝার চেষ্টা করছে লোকটা ওকে হুমকি দিচ্ছে কি না; তবে মৃদু হাসিটা এখনও ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখেছে।

'আই মিন,' বলল তুং শান, 'আজ আপনি এতই বড় অঙ্কের টাকা হারবেন, যেটাকে বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া আর কোনওভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না।'

'দেখা যাক।'

মুখে যাই বলুক, জুয়া খেলার কোনও নিয়মই মানছে না রানা। একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ব্লাইন্ড খেলছে ও, খারাপ কার্ড পেলেও স্টেইক বাড়িয়ে দিচ্ছে, তারপর হয়তো দেখা গেল শুধু একটা কুইন নিয়ে শো দিয়েছে।

সবাই বুঝতে পারছে, এভাবে খেললে হেরে ভূত হয়ে যাবে ও, তবে কেউ কিছু বলছে না, শুধু বেলিন্ডা ছাড়া।

'তোমার পাশে থাকাই আমার উচিত হয়নি,' বিড়বিড় করছে

সে। 'কোনও পাগলেও তো এভাবে খেলে না।'

যারা মোটামুটি ভাল কার্ড পাচ্ছে, ওর খেলার একগুঁয়ে ধরন দেখে, সাহস করে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারছে না। প্রায় প্রতি দানেই দেখা গেল শুধু রানা আর সুরাইয়াই চালিয়ে যাচ্ছে, বাকি তিনজন বসে গেছে অনেক আগেই।

একঘণ্টা বিশ মিনিটের মাথায় পঞ্চাশ হাজার ডলার হেরে গেল রানা। তারপরেও ওর মধ্যে কোনও বিকার নেই। আগের মতই মিটি মিটি হাসছে।

সেটা লক্ষ করে কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করল তুং শান। 'এতগুলো টাকা হেরে আপনি শোকে কাতর হয়ে পড়েননি, এ-কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলবেন না, প্লিজ!'

তার কথা শুনতে না পাওয়ার ভান করে মানিব্যাগ থেকে ক্রেডিট কার্ড বের করে একজন অ্যাটেনড্যান্টকে দিল রানা, বলল, 'এবার এক লাখ ডলারের চিপ নিয়ে খেলব। অন্তত ঘণ্টা দুয়েক তো চলবে।'

আবার খেলা শুরু হলো। মাত্র দু'দানে বিশ হাজার ডলার হেরে গেল রানা। দু'বারই কী কার্ড পেয়েছিল তা কাউকে না দেখিয়ে অফ হয়ে গেছে, দশ হাজার ডলার ব্লাইন্ড খেলার পর।

'আপনি তো খেলতেই জানেন না,' এক সময়, যেন আর সহ্য করতে না পেরে, ঝাঁঝের সঙ্গে বলল সুরাইয়া। 'টাকাগুলো এভাবে পানিতে ফেলার কোনও মানে হয়?'

'আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত আমি,' হিসহিস করে বলল বেলিন্ডা।

হেসে উঠল তুং শান, তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'কী বলছ তুমি, সুরাই-য়া! এটা আমাদের ব্যবসা, আমাদের নীতি হওয়া উচিত প্রয়োজনে গলার ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে হলেও টাকা বের করে আনা। খেলতে বসে যে যত হারবে, আমাদের তো ততই লাভ।'

'জানি, তুং শান,' নীরস গলায় বলল সুরাইয়া। 'কিন্তু আরেকটা দিক ভেবে দেখেছ?'

'আরেকটা দিক, মাই ডিয়ার?'

'খেলতে বসেছি রোমাঞ্চিত হবার জন্যে,' অভিযোগের সুরে বলল সুরাইয়া। 'কিন্তু কোনও চ্যালেঞ্জ না থাকলে রোমাঞ্চ কি বাতাস থেকে গজাবে?'

'তা তো ঠিকই।' মাথা ঝাঁকাল তুং শান। 'মিস্টার রানা, প্লিজ, খেলাটায় প্রাণ দেয়ার জন্যে দয়া করে দু'একবার জিতুন আপনি! একটা মেয়ে আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছে!'

'আপনি বলছেন?' মিটিমিটি হাসছে রানা। 'আমি জিতলে আপনি খুশি হন?' ওর ভাবটা এমন, যেন ইচ্ছে করলেই জিততে পারে ও।

'না, আমি খুশি হব না,' স্পষ্ট করেই বলল তুং শান। 'সুরাইয়া খুশি হবে। আমি খুশি হব আপনি যদি আরও টাকা হারেন—মায়ামিতে ঠিক আপনার মত আরেকজন যেমন পঞ্চাশ লাখ ডলার হেরেছে। তবে আমিও চাই খেলাটায় চ্যালেঞ্জ থাকুক, আমরা সবাই রোমাঞ্চিত হই।'

মাথাটা রানার চক্কর দিয়ে উঠল। উপল ফারুক মায়ামিতে জুয়া খেলতে গেছে, জানে ও। তুং শান কি তার প্রসঙ্গে কিছু বলল, নাকি শুনতে ভুল হয়েছে ওর? 'ঠিক আছে,' বলল ও। 'দেখি চেষ্টা করে।' সিদ্ধান্ত নিয়েছে, না বোঝার ভান করবে। দেখা যাক আর কিছু বলে কি না তুং শান।

'দেখুন,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল তুং শান।

যেন জিদের বশে স্টেইক বাড়িয়ে দিয়ে খেলছে রানা, বোকার মত প্রতিবার ধরে নিচ্ছে প্রতিপক্ষ ওর চেয়ে খারাপ কার্ড পেয়েছে। সুরাইয়া ওর কার্ড দেখতে চাইলে দশ কিংবা জ্যাকের উপর কোনও কার্ড দেখাতে পারছে না।

'আমি আমার কথাটা ফিরিয়ে নিচ্ছি,' রানাকে বলল

বেলিন্ডা। 'তোমাকে আমি কোনও টাকা ধার দেব না।'

কীসের চেষ্টা কীসের কী, আগের চেয়েও খারাপ হয়ে গেছে ওর খেলা। এভাবে হারলে রাজার ভাণ্ডার শেষ হতেও বেশি সময় লাগবে না।

সেটা লক্ষ করে লোভে চকচক করে উঠল তুং শানের চোখ দুটো। তার প্রত্যাশা আকাশচুম্বি হয়ে উঠছে। রানা চাইছেও তাই, লোকটা যাতে শুধু জেতার কথা ছাড়া আর কিচ্ছু না ভাবে।

সুরাইয়া একবার বলল, এই নীরস খেলায় তার কোনও আগ্রহ নেই। অমনি তার কানে ফিসফিস শুরু করল তুং শান।

তার দু'একটা কথা রানার কানেও এল: 'টাকা যখন কারও কাছে নিজে থেকে আসে, ধরে নিতে হবে ওটা ঈশ্বরের দান; আর ঈশ্বরের ওই স্রোতের পথে বাধা সৃষ্টি করাটা পাপ।'

এরপর খেলায় একটা পরিবর্তন দেখা গেল। বিশ মিনিটের মধ্যে বেশ কিছু টাকা জিতল রানা। অন্তত তিনবার তুং শানের পরামর্শে বাজে তাস নিয়ে খেলা চালিয়ে গেল সুরাইয়া, আশা করল বরাবরের মত শো না দিয়ে বসে যাবে রানা; কিন্তু শো দিল রানা, এবং খুব একটা ভাল কার্ড না থাকা সত্ত্বেও জিতল। ভাল কার্ড পেয়েও জিতল তিন কি চারবার।

আবারও তাস বাঁটার সুযোগ পেল রানা। কার্ডগুলো খুব ভাল করে ফাটল ও, তারপর দ্রুত বেঁটে দিল। সবাই যথারীতি তিনটে করে তাস পেয়েছে, কিন্তু সুরাইয়া পেয়েছে চারটে।

ভুল করে নয়, একটা কার্ড ওকে ইচ্ছে করেই বেশি দিয়েছে রানা। ও চাইছে মোটামুটি ভাল তাস পাক সুরাইয়া, কারণ ফাটার সময় কৌশল করে নিজে খুব ভাল তাস নিয়েছে।

সুরাইয়া একটু ভাল তাস পেলে তুং শান ওকে মোটা টাকা খেলতে উৎসাহ দেবে।

তাস যে চারটে, সেটা সুরাইয়া বুঝতে পারল খেলার শেষদিকে, যখন কার্ড তোলার সময় হলো। কথাটা বলতে

যাচ্ছে, ইশারায় ওকে মানা করল তুং শান—তার অপরাধপ্রবণ মন লোভী হয়ে উঠেছে।

ফ্ল্যাশ খেলায় অতিরিক্ত একটা তাস বিরাট ব্যাপার, ভাল কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা একশ' গুণ বেড়ে যায়। হলোও তাই, চারটের মধ্যে তিনটেই ডায়মন্ড—পাঁচ, আট আর নয়—ফ্ল্যাশ।

তুং শানের পরামর্শে তাসগুলো এমনভাবে সাজিয়ে রাখল সুরাইয়া, যেন ওখানে তিনটে তাসই আছে।

সবাই বসে গেল, থাকল শুধু দুজন।

এরপর শুরু হলো দম-বন্ধ-করা উত্তেজনা। রানা কার্ড তুলছে না, মিনিটের পর মিনিট ব্লাইন্ড খেলে যাচ্ছে, যেমনটি আগেও খেলেছে ও।

খেলা থামিয়ে শো দিতে চাইছে সুরাইয়া, কিন্তু তুং শান বাধা দিচ্ছে। তার জিদের কাছে হার মেনে স্টেইক বাড়াতে শুরু করল সুরাইয়া। একশ' ডলারের জায়গায় দুশ' ডলার, তারপর চারশো, আটশো, ষোলোশো!

কার্ড না দেখেই রানাকে দিতে হচ্ছে আটশ' ডলার।

বিশ মিনিট পর বোর্ডে প্রায় আশি হাজার ডলার জমে গেল। অথচ এখনও ব্লাইন্ড খেলে যাচ্ছে রানা।

আরও কয়েক মিনিট পার হলো। অবশেষে তুং শানের কথা অগ্রাহ্য করে বোর্ডে ষোলোশ' ডলারের চিপস রেখে সুরাইয়া স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'শো!' হাতের তাস ছাড়ল না ও, ফাঁক করে মাত্র তিনটে দেখাল—অতিরিক্ত কার্ডটা ওগুলোর ভিতরেই লুকানো আছে। কী তাস দেখতে পাচ্ছে সবাই, তারপরও বলল, 'ফ্ল্যাশ!'

ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে, নিজের কার্ড দেখল রানা। ধীরে ধীরেই নিভল মুখের হাসি, যেন এর চেয়ে খারাপ কার্ড আর হতে পারে না। রাগের সঙ্গে উল্টো করা তাসগুলো বোর্ডে ফেলল ও, চোখে-মুখে নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে চুরুট ধরাচ্ছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হেসে উঠল তুং শান। 'আমার কথাই ঠিক,' বলল সে। 'মিস্টার ফারুক আজ একটা অ্যাক্সিডেন্ট করতে যাচ্ছেন।' এরপর সুরাইয়াকে সাহায্য করবার ভঙ্গিতে বোর্ডের দিকে ঝুঁকে চিপগুলো টেনে নিতে গেল।

এতক্ষণে মুখ খুলল রানা। 'অ্যাক্সিডেন্টটা বোধহয় আপনিই করে বসলেন, তুং শান।' এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল ও। 'আমার কার্ড না দেখেই বোর্ডের টাকায় হাত দিয়ে। তাস খেলায় এই আচরণ নিজেকে অপমান করা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

তুং শানের হলুদ হাত দুটো স্থির হয়ে গেল। ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে তার মুখের আলো। সরু চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টি রানার অন্তর পর্যন্ত ভেদ করতে চাইছে। 'তার মানে?' বেসুরো গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

'একটু কষ্ট করে আমার তাসগুলো দেখুন, তা হলেই মানেটা বুঝতে পারবেন,' বলে হাত বাড়িয়ে বোর্ডের সমস্ত চিপ নিজের দিকে টেনে নিল রানা।

'এক মিনিট, দেখি তো,' বলে রানার তাসগুলো তুলে নিয়ে দেখল সুরাইয়া। তিন রঙের তিনটে তাস পেয়েছে রানা—দুই, তিন, চার।

'রান্!' বিড়বিড় করল সুরাইয়া। সবই ওর জানা আছে, তা সত্ত্বেও চোখে-মুখে বিমূঢ় একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল।

'সরি,' ম্লান সুরে বলল তুং শান, ধাক্কাটা সামলে নেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। দ্রুত হাত চালিয়ে সুরাইয়া আর রানার তাস এক করে মূল ফেটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল, কেউ যাতে বুঝে না ফেলে যে এতক্ষণ চারটে তাস নিয়ে খেলছিল সুরাইয়া।

আবার তাস বাঁটছে রানা। ওর হাতের দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তুং শান। প্রচুর টাকা জিতেছিল তারা, সব আবার রানা জিতে নেয়ায় মেজাজ এখন সপ্তমে।

রানা জানে কিছু টের না পেলেও তুং শানের মনে সন্দেহ

জেগেছে, কাজেই তাস বাঁটার সময় চুরি করা যাবে না। তার অবশ্য দরকারও নেই, কারণ ইতিমধ্যে লাভসহই নিজের পুঁজি ফিরে পেয়েছে ও।

স্বাভাবিক খেলে এবারও জিতল রানা। পর পর দু'বার।

টকটকে লাল হয়ে উঠেছে তুং শানের হলুদ মুখ। ঘামে চকচক করছে কপালটা।

'ডিনারের সময় হলো,' হঠাৎ মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে বলল সুরাইয়া। পরিষ্কার বুঝতে পারছে ও, বারবার অনায়াসে জেতাটা এমন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তুং শানের, পরাজয় মেনে নেওয়ার কোনও প্রস্তুতিই নেই তার। অকারণ রাগ আর আক্রোশের লাগাম টেনে রাখতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে সে।

'ইয়েস, অভকোর্স, মাই ডিয়ার!' বেসুরো গলায় হেসে উঠে সুরাইয়ার কথায় সায় দিল তুং শান। ঝুঁকে ওর ঠোঁটে একটা চুমো খেল সে। 'ডিনারের পর, যদি তোমার ভাল লাগে, আবার না হয় ফেরা যাবে খেলার টেবিলে,' ফিসফিস করছে, কথার সুরে মিনতি। টাকার শোক, পরাজয়ের অপমান, দুটোই দগ্ধাচ্ছে তাকে। 'তুমি কি বলো, ডার্লিং?'

নিজের চিপগুলো গুণে একজন অ্যাটেনডান্টকে বুঝিয়ে দিচ্ছে রানা।

সুরাইয়ার ভয় হচ্ছে খেলাটা আবার চলতে দিলে যে-কোনও মুহূর্তে মারাত্মক কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। রানাকে তো আর স্বেচ্ছায় হারতে বলতে পারে না ও। ওর জিদও তো তুং শানের চেয়ে কম হবে না। 'আজ আবার?' ক্লান্ত সুরে বলল। 'না, প্লিজ! আমার ভাল লাগবে না।'

'ওকে, ঠিক আছে,' বলল তুং শান। তারপর রানার দিকে ফিরল সে। 'ওস্তাদের মার শেষ রাতে বলে একটা কথা আছে, জানেন তো, মিস্টার উপল ফারুক?'

'জানি,' বলল রানা। 'তবে নিজেকে আমি কোনও কাজেরই

ওস্তাদ বলে মনে করি না।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

হেসে উঠল তুং শান। 'উচিতও নয়, বিশেষ করে আমি যেখানে উপস্থিত আছি।' নিজের বুকে তর্জনী ঠেকাল সে। 'কাল বা পরশু আমার সঙ্গে খেলবেন আপনি, তখন দেখবেন তিন তাস কাকে বলে।'

'যারা চুরি করতে জানে তারাই সাধরণত তিন তাস নিয়ে বড়াই করে,' বলল রানা। 'কিন্তু আপনাকে খুব বড় চোর বলে মেনে নিতে রাজি নই আমি।' প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল তুং শান, তাকে সুযোগ না দিয়ে নিজের কথাটা শেষ করল ও, 'কারণ, বড় চোরের একটা লক্ষণ হলো, প্রতিপক্ষ চুরি করলে সে ঠিক ধরে ফেলবে।'

হতচকিত দেখাচ্ছে তুং শানকে। 'ঠিক কী বলতে চান আপনি?'

'খেলাটায় আমি চুরি করেছি, কিন্তু আপনি তা ধরতে পারেননি,' বলে অ্যাটেনডান্টের পিছু নিয়ে ব্যাঙ্কের দিকে রওনা হলো রানা। ওর পাশেই রয়েছে বেলিন্ডা।

তেরো

চেয়ার ছেড়ে ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল তুং শান। রানার ঘাড়ের পিছনটায় স্থির হয়ে আছে তার দৃষ্টি। খুব কাছে রয়েছে বলে সুরাইয়ার চোখে ধরা পড়ল ব্যাপারটা, একটু একটু কাঁপছে তাইওয়ানিজ ক্যাসিনো মালিক।

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে সুরাইয়ার দিকে তাকাল সে। 'মিস্টার ফারুককে তুমি কি এখানে আসার আগে থেকেই চিনতে?' চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছে, তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে ওকে।

'হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছ যে?' জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল সুরাইয়া।

'না, মানে, খেলা শুরুর আগে দুজনকে বেশ জমিয়ে আলাপ করতে দেখলাম তো, তাই কৌতূহল হচ্ছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল সুরাইয়া। 'মেয়েদের সম্পর্কে, বিশেষ করে সুন্দরী মেয়েদের সম্পর্কে, এ-ধরনের কৌতূহল না দেখানোই বুদ্ধিমানের কাজ। ওরা সাধারণত সত্যি কথা বলে না।'

কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কাটল।

'দুঃখিত,' অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল তুং শান। 'আমি বোধহয় তোমার সন্ধেটা মাটি করে দিলাম—'

'সন্ধের পর থেকে যা কিছু ঘটেছে সব ভুলে যাও, তারপর আমাকে ডিনার খাওয়াও—ব্যস, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিছুই ঠিক হবে না,' মাথা নেড়ে বলল তুং শান। 'কারণ আমার কাছে খবর আছে ওই লোকটা উপল ফারুক নয়।'

'কী বললে?' সুরাইয়ার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল।

'ওকে সম্ভবত আমার ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীরা স্যাবোটাজ করার জন্যে এখানে পাঠিয়েছে,' শক্ত হাতে সুরাইয়ার একটা কবজি ধরে এলিভেটরের দিকে এগোল তুং শান।

'ওহ্, খোদা!' আঁতকে উঠল সুরাইয়া। 'এ-সব তুমি জানছ কীভাবে?'

'স্যাটেলাইট ফ্যাসিলিটি কীভাবে আমরা ব্যবহার করি তোমাকে কাল বলেছি,' বলল তুং শান। 'আজ দুপুরে একটা মার্কিন চ্যানেল খুলেছি, দেখি, খবরে বলা হচ্ছে শ্রী লঙ্কান ব্যবসায়ী সাইয়িদ উপল ফারুক মায়ামির বিখ্যাত ক্যাসিনো

ফরচুনে রুলেত খেলতে গিয়ে পঞ্চাশ লাখ ডলার হেরে গেছে।'

'কী বলছ!' সুরাইয়ার উদ্বেগ নির্ভেজাল।

'হাতে সময় না থাকায় স্যাটেলাইটের সঙ্গে কানেকশন বিচ্ছিন্ন করে দেয় আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা, ফলে নিউজটা ঠিক শুনলাম কি না নিশ্চিত হতে পারিনি আমি।' হাতঘড়ি দেখল তুং শান। 'বিকেলে টেলিফোন করেছি মায়ামিতে, আশা করছি এখন থেকে যে-কোনও মুহূর্তে খবরটা সত্যি কি না কনফার্ম করা হবে আমাকে।'

'তারপর?' দম আটকে জিজ্ঞেস করল সুরাইয়া।

এলিভেটরের সামনে থামল তুং শান, ছয়তলায় ওঠার জন্য চাপ দিল বোতামে। 'তুমিই বলো, তারপর আমার কী করা উচিত?'

'আমি মনে করি অহেতুক কোনও ঝুঁকি নেয়া তোমার উচিত হবে না,' বলল সুরাইয়া; সাবধানে, ভেবেচিন্তে কথা বলছে ও। 'যে লোক স্যাবটাজ করতে এসেছে, পুলিশ ডেকে এখনই ওকে তাদের হাতে তুলে দাও।' ও আসলে বুঝতে চাইছে, রানাকে নিয়ে কী করবে বলে ভাবছে তুং শান। মাথায় এটাও খেলছে যে পুলিশের সামনে রানাকে অন্তত খুন করতে পারবে না সে।

এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। সুরাইয়ার পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকল তুং শান। হাসছে সে।

'তুমি হাসছ কেন?'

'তোমার কথা শুনে,' বলল তুং শান। 'এই এলাকায় পুলিশের কোনও ক্ষমতা নেই। কোন্ কেসটা কীভাবে সাজাবে, কীভাবে চার্জশিট তৈরি করবে, ফোন করে আমার লোকদের কাছ থেকে জেনে নিতে হয় ওদেরকে।'

'বুঝলাম না।'

'আস্তে ধীরে বুঝবে, মাই ডিয়ার,' মুখের কাছে তুলে সুরাইয়ার হাতে আলতো করে একটা চুমো খেল তুং শান।

'আমি তো এত ব্যস্ততার কিছু দেখি না।'

হিসাব করে রানা দেখল সব মিলিয়ে ষাট হাজার ডলার জিতেছে।

সময় নষ্ট করছে না, ব্যাঙ্ক থেকে সোজা নেমে এল একতলায়। লাউঞ্জের এক কোণে বসে প্রথমে কফি খেলো ওরা।

কাপে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে সিঁড়ি আর দরজা দিয়ে কারা আসা-যাওয়া করছে লক্ষ রাখছে রানা। বেলিন্ডার অবশ্য অন্য কোনওদিকে খেয়াল নেই, পরিবেশ ইত্যাদি ভুলে সারাক্ষণ রানার চেহারায় কী যেন খুঁজছে।

'তোমার মত রহস্যময় মানুষ দুনিয়ায় বোধহয় দ্বিতীয়টি নেই,' চাপা গলায় বলল ও। 'ভয় হচ্ছে কার্ল ক্রুনোর না কপাল পোড়ে!'

'মানে?' প্রশ্ন করল রানা।

'ওকে আমি ভালবেসে বিয়ে করেছি,' বলল বেলিন্ডা। 'তোমাকে যতই দেখছি ততই ভয় হচ্ছে, আমি না দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়ি!'

হেসে ফেলল রানা। 'তা যাতে না পড়ো, তার ব্যবস্থাই করতে যাচ্ছি আমি,' বলল ও।

বিস্মিত হলো মেয়েটা। 'মানে?'

'বলব, তবে একটু ধৈর্য ধরতে হবে।'

কফি শেষ করে বেলিন্ডাকে নিয়ে লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এল রানা, একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকে সাত হাজার ডলার দিয়ে একটা ব্রেসলেট, আর এক প্যাকেট দামী চুরুট কিনল।

'ব্রেসলেটটা কার জন্যে?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল বেলিন্ডা।

'পরে বলছি,' বলে ওকে নিয়ে আবার লাউঞ্জে ফিরে এল রানা, দাঁড়াল রিসেপশন ডেস্কের সামনে। 'আমার বন্ধু ইমন

দর্জির সঙ্গে কথা বলতে চাই,' রিসেপশনিস্ট তরুণীকে বলল ও। 'ওর নম্বরটা যদি বলো।'

খাতা খুলে চোখ বুলাল মেয়েটি। 'ছয়তলা, একশ' বাহাত্তর নম্বর স্যুইট।'

'উঁহুঁ, ওর ফোন নম্বরটা দরকার আমার,' বলল রানা, না চাইতেই দর্জির স্যুইট নম্বর পেয়ে মনে মনে খুশি।

'টু-ফাইভ-ফাইভ,' বলল রিসেপশনিস্ট।

'আরেকটা উপকার করো, প্লিজ,' মিষ্টি হেসে বলল রানা। 'দ্বীপটা একটু ঘুরে দেখতে চাই আমরা। সৈকতে বসে একটু হাওয়াও খাব।'

'ইয়েস?' উৎসাহ দিয়ে অপেক্ষা করছে মেয়েটি।

'রেন্ট-আ-কার থেকে একটা গাড়ি আনিয়ে দাও,' বলল রানা। 'যদি একটা ম্যাপ পাওয়া যায়, ভাল। তবে কোনও ড্রাইভার দরকার নেই।'

'ইয়েস, সার! কখন চাই আপনার, প্লিজ?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,' বলল রানা।

'ঠিক আছে, এখনই ব্যবস্থা করছি।'

'ধন্যবাদ।'

বেলিন্ডাকে দাঁড়াতে বলে টেলিফোন বুদে গিয়ে ঢুকল রানা। তিন মিনিট পর বেরিয়ে এল বুদ থেকে। শুধু রিংই হয়েছে, ইমন দর্জির টেলিফোন কেউ ধরেনি। খোঁজ নিতে হলে তার স্যুইটে যেতে হবে ওকে।

ঝুঁকি আছে, তবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাবে। কেউ বিপদে পড়ে সাহায্য চাইলে ওর পক্ষে নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব নয়।

'আপনার জন্যে একটা লাল মার্সিডিজ পাঠাচ্ছে ওরা, সার,' রিসেপশনিস্ট মেয়েটা বলল ওকে।

মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর বেলিন্ডার হাত ধরে এলিভেটরের দিকে এগোল।

সোজা ছয়তলায় উঠে এল ওরা। বারান্দায় পা রাখতেই দেখতে পেল সাততলায় ওঠার সিঁড়ির দরজা ফাঁকা পড়ে আছে, গার্ড দুজন সত্যি সত্যি নেই। বেলিন্ডাকে নিয়ে ওর স্যুইটে ঢুকল রানা।

দরজা বন্ধ করে বেলিন্ডার একটা হাত ধরল ও, টেনে নিয়ে এসে নিজের পাশে ডিভানে বসাল। বাক্স খুলে ব্রেসলেটটা ওর কনুইয়ের উপর পরিয়ে দিচ্ছে। 'আপাতত বিদায় নিচ্ছি আমরা,' কণ্ঠস্বর নরম, অথচ দৃঢ়। 'আমাদের নির্মল বন্ধুত্বের স্মৃতি হিসেবে এটা থাকল তোমার কাছে।'

'মানে?' রানার কথা বুঝতে না পেরে রেগে যাচ্ছে বেলিন্ডা। 'কী যা-তা বকছ।'

'যা-তা নয়,' দ্রুত বলল রানা। 'খেলার সময় তুং শান কি বলল শোনোনি? মায়ামিতে ঠিক আমার মত আরেকজন পঞ্চাশ লাখ ডলার হেরেছে! এর মানে জানো? আমি যে অন্য লোকের পরিচয় নিয়ে তার ক্ষতি করতে এসেছি, ধরে ফেলেছে সে।'

'তাতে আমার কী?'

'মুখ খোলার জন্যে আমার ওপর টরচার করবে ওরা,' বলল রানা। 'আমার ঘনিষ্ঠ মানুষদেরও ছাড়বে না। তাই এখন আমি তোমাকে এই দ্বীপ থেকে মেইনল্যান্ডে পাঠিয়ে দেব। সৈকতে, পরিত্যক্ত একটা জেটিতে বোট নিয়ে আমার লোক অপেক্ষা করছে, তারাই তোমাকে নিয়ে যাবে।'

'কিন্তু মেইনল্যান্ডে কোথায় থাকব আমি? কার্ল এখানে এসে আমাকে না পেলে...'

'আমার লোকেরা মেইনল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে তোমাকে একটা সেফ হাউসে তুলবে। ওখান থেকে তুমি কার্লকে ফোন করো, কাল সে যাতে ওই সেফ হাউসে চলে যায়।'

প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল বেলিন্ডা, চাপা গলায় ধমক দিল রানা, 'যা বলছি করো, এটা তর্ক করার সময় নয়।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্যুটকেসটা গুছিয়ে নাও, তারপর গ্যারেজে নেমে লাল মার্সিডিজে বসে আমার জন্যে অপেক্ষা করো।'

'আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছ, কিন্তু তোমার কী হবে?' জানতে চাইল বেলিন্ডা।

'আমি একটা কাজ নিয়ে এসেছি,' বলল রানা। 'সেটা শেষ করার জন্যে এখানে আবার আমাকে ফিরে আসতে হবে।'

'কী সেই কাজ?'

'তা তোমার না জানাই ভাল,' বলল রানা, বেলিন্ডার সামনে একটা হাত পাতল। 'তোমার পিস্তলটা ধার দাও আমাকে। আর দাও স্যুইটের চাবিটা।'

'পিস্তল ছাড়াই ঢুকে পড়েছ বাঘের খাঁচায়?'

'আমার জন্যে না,' বলল রানা। নিজেরটা বের করে দেখাল, 'ওটা সুরাইয়ার জন্যে। ও-ও আমাদের লোক।'

হাঁ হয়ে গেল বেলিন্ডার মুখ। আর একটি কথাও না বলে হাতব্যাগ খুলে নিজের পিস্তলটা বের করে দিল ও। 'আমি কি তোমার এই বিপদে কোনও সাহায্যেই আসতে পারি না?'

পিস্তল আর চাবির রিংটা নিল রানা। 'এটা কী, সাহায্য নয়?'

'অস্ত্রটা আমি তোমাকে প্রেজেন্ট করলাম,' বলল বেলিন্ডা। 'ওই পিস্তল দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিদের মারা হয়েছে, আমি চাই ওটা দিয়ে এখন ধর্মান্ধ জঙ্গি মারা হোক।'

বেলিন্ডাকে গ্যারেজে পাঠিয়ে দিয়ে টুফাইভফাইভ-এ আবার রিং করল রানা। এবার রিসিভার তুলল কেউ। 'হ্যালো?'

পরিষ্কার বুঝল রানা, গলার আওয়াজ ইমন দর্জির নয়। 'মিস্টার দর্জিকে দিন, প্লিজ।'

'সরি, আপনি কে বলছেন?'

'সরি মানে?'

'সরি মানে, মিস্টার দর্জি এই মুহূর্তে কথা বলার মত অবস্থায় নেই। সম্ভবত ফুড-পয়জনিঙে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি,'

বলল লোকটা। 'অ্যামবুলেন্স এসেছে, আমরা তাকে ক্লিনিকে নিয়ে যাচ্ছি।'

যোগাযোগ কেটে দিয়ে চিন্তা করছে রানা। তারপর আবার রিসিভার তুলল, গাইড খুলে ডায়াল করল গ্যারেজের নম্বরে। বেশ কয়েক বার রিং হওয়ার পর একজন গার্ড চিনা উচ্চারণে বলল, 'ইয়েস, সার?'

রানাও তার উচ্চারণ নকল করে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যামবুলেন্সটা চলে যায়নি তো?' নিশ্চিত হতে চাইছে সত্যি কোনও অ্যামবুলেন্স এসেছে কি না।

'না, সার!'

রিসিভার নামিয়ে রেখে বেলিন্ডার স্যুইট থেকে খোলা বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। বেরুতেই দেখতে পেল তিন-চারজন লোক একটা স্ট্রেচার নিয়ে বেরিয়ে আসছে ডান দিকের করিডর থেকে। স্ট্রেচারের উপরটা চাদর দিয়ে ঢাকা।

মনে মনে একটা হিসাব করল রানা, একশ' বাহাত্তর নম্বর স্যুইটটা ওদিকেই হওয়ার কথা; তার মানে স্ট্রেচারে শুইয়ে ইমন দর্জিকেই নিয়ে আসছে লোকগুলো।

তাদের কাউকে রানা চিনতে পারছে না। ভাবল, দর্জির গাইড তাণ্ডব সিং কোথায়? কিংবা সেই দৈত্যটা, হোটেলের সিকিউরিটি ইনচার্জ কুয়ামিন চুয়ান?

স্ট্রেচারের পিছু নিয়ে এলিভেটরে ঢুকল রানা। একেবারে শেষ মুহূর্তে টের পেল ওর পিছু নিয়ে আরও দুজন ঢুকছে ভিতরে। ঘাড় ফেরাতেই তাণ্ডব সিং আর দৈত্যটাকে দেখতে পেল ও। কটমট করে ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে তারা।

এলিভেটর্রের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।'

সম্ভবত জায়গার অভাবেই এলিভেটরের মেঝেতে নামানো হয়নি স্ট্রেচার, চারজন লোক ওটাকে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দৈত্য আর তাণ্ডব সিং এক কোণে জায়গা করে নিল।

'কে?' এলিভেটরের আরেক কোণে পিছিয়ে এসে চুয়ানকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কী হয়েছে?' স্ট্রেচারের চাদর সরে যাওয়ায় রোগীর একটা হাত দেখতে পাচ্ছে ও। রক্তাক্ত পাঁচটা আঙুলের একটাতেও কোনও নখ নেই, প্লায়ার্স দিয়ে তুলে ফেলা হয়েছে।

'আমাদের একজন গেস্ট, সার,' জবাব দিল চুয়ান। 'মিস্টার ইমন দর্জি। ফুডপয়জনিং হয়েছে। আমাদের এখানে নয়, ভদ্রলোক বাইরের কোনও রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ করেছিলেন।' প্রকাণ্ড কাঁধটা অসহায় ভঙ্গিতে ঝাঁকাল সে।

পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা, ফুডপয়জনিং নয়, টরচার করা হয়েছে ইমন দর্জিকে। মেরে ফেলেছে কি না তাই বা কে জানে! অ্যামবুলেন্স, ক্লিনিক, এ-সবও হয়তো তাদের নিজেদের; চিকিৎসার নাম করে সৈকতে পুঁতে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছে—জ্যান্ত হোক বা মরা।

রানার ধারণা, ছেলেটা ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট ছিল। সত্যি যদি গাইড তাণ্ডব সিংই ওকে ডুবিয়ে থাকে, ধরে নিতে হবে লোকটা তুং শানের চাকরি করে।

'অবস্থা কতটা খারাপ?' কারও চোখে ধরা না পড়ে ইমনের পালস্ দেখছে রানা।

'ভাল, ভাল,' হেসে উঠে বলল চুয়ান। 'খুব বেশি হলে একটা দিন থাকতে হবে ক্লিনিকে।'

কিন্তু রানা কোনও পালস্ পেল না।

চোদ্দো

গ্যারেজে নেমে এসে লাল মার্সিডিজে চড়ল রানা। শুকনো মুখে সামনের সিটে বসে আছে বেলিন্ডা, ওকে দেখে কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না।

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছাড়ল রানা, আপনাআপনি খুলে গেল ফটক। ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে, কারণ ঠিক ওই সময় রেইডার-ভ্যানটা বাঁক নিয়ে ক্যাসিনো আন্দামানের পিছন দিকে চলে যাচ্ছে। দালানটা থেকে বেরিয়ে এসে দু'মিনিট মেইন রোডে থাকল রানা, তারপর একটা সাইড রোডে ঢুকে সব আলো নিভিয়ে দিল।

'কী হলো?'

'অ্যামবুলেন্সটাকে ফলো করব,' বলল রানা। 'তারপর সুযোগ মত সৈকতের দিকে যাব।'

'কেন একটা অ্যামবুলেন্সকে ফলো করতে হবে, কার কী হয়েছে ইত্যাদি আমার না জানাই ভাল—জানলেই বিপদে জড়িয়ে পড়ব!' বেলিন্ডার গলায় অভিমান আর অসন্তোষ।

কিছু না বলে চুপ করে থাকল রানা। একটু পরেই দেখল মেইন রোড ধরে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে অ্যামবুলেন্সটা। বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে ওটার পিছু নিল ও।

খানিক পর মেইন রোড ছেড়ে সৈকতের পাশের একটা রাস্তা ধরল অ্যামবুলেন্স। এলাকাটা অন্ধকার, নির্জন ও ফাঁকা; এদিকে

কোনও ক্লিনিক থাকার কথা নয়।

তারপর একটা জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে এগোল অ্যামবুলেন্স। রানার মনে পড়ল ক্যাসিনো আন্দামানের পিছনে একটা গভীর জঙ্গল আছে; এটা বোধহয় সেটারই শেষ অংশ।

মার্সিডিজের আলো আগেই নিভিয়ে দিয়েছে রানা, বেলিন্ডাকে বলল, 'গ্লাভ কমপার্টমেন্টে ম্যাপ থাকলে দাও আমাকে।'

একটু পর বেলিন্ডা বলল, 'নাও, ধরো।'

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সৈকত ঘেঁষে এগোচ্ছে অ্যামবুলেন্স। একটু পর থামল। প্রায় একশ' গজ পিছনের রাস্তায় মার্সিডিজও দাঁড়াল; তারার আলোয় নির্জন একটা জেটির কাঠামো দেখতে পাচ্ছে রানা। শেষ মাথায় একটা মোটর লঞ্চ ঢেউয়ের দোলায় অলস ভঙ্গিতে দুলছে।

পেন্সিল-টর্চ বের করে জ্বালল ও। দেখল ম্যাপ আসলে একটা নয়, দুটো। একটায় দেখানো হয়েছে ক্যাকটাস দ্বীপে কী কী আছে: আরেকটায় ক্যাকটাস দ্বীপের চারপাশে কী আছে। দ্বিতীয়টার ভাঁজ খুলল ও।

ক্যাকটাস দ্বীপের কাছাকাছি ছোট আকৃতির আরও বেশ কয়েকটা দ্বীপ রয়েছে। সবচেয়ে কাছের দ্বীপটার নাম বোন-ইয়ার্ড। নামের পাশে ব্রাকেটে লেখা—ওনলি ফর খ্রিশ্চানস।

বোন-ইয়ার্ড মানে কবরস্থান।

জেটি থেকে রওনা হলো মোটর লঞ্চ। তবে অ্যামবুলেন্সটা ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। একটু পর লঞ্চের আলো বাঁক নিতে শুরু করল।

ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে রানা দেখল, বোন-ইয়ার্ড দ্বীপের দিকেই যাচ্ছে।

কী হচ্ছে আন্দাজ করতে পারছে রানা। মাঝ সাগরে ফেলে দেওয়া হবে ইমনের লাশ, কিংবা হয়তো খ্রিশ্চানদের কবরস্থানে

নিয়ে গিয়ে পুঁতে ফেলবে। কুয়ামিন চুয়ান আর তাণ্ডব সিং কাজটা তদারক করবে। তাদেরকে আবার হোটেল আন্দামানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যামবুলেন্সটা দাঁড়িয়ে আছে।

অচেনা এক তরুণের এরকম মর্মান্তিক অকালমৃত্যুতে মনটা বিষণ্ন হয়ে আছে, নিজেকে রানা বলে রাখল, সময়-সুযোগ পেলে বোন-ইয়ার্ড আইল্যান্ডে একবার যেতে হবে ওকে। সদ্য খোঁড়া মাটি দেখলেই বোঝা যাবে ঠিক কোথায় ওকে তারা পুঁতেছে।

কারও মাধ্যমে কোনওভাবে যদি ছেলেটার প্রিয়জনদের কাছে খবরটা পৌঁছে দেওয়া যায়। এটুকু তো করতে না পারার কিছু নেই।

দ্বীপের অন্য একদিকের সৈকতে এসে পরিত্যক্ত জেটির মুখে শাহিন সিরাজকে দেখতে পেল রানা। একটা লঞ্চ, আউটবোর্ড মোটর সহ ছোট দুটো বোট নিয়ে অপেক্ষা করছে, সঙ্গে আছে এজেন্সির বেশ কয়েকজন অপারেটর। প্রয়োজনীয় নির্দেশসহ বেলিন্ডাকে ওদের হাতে তুলে দিল রানা।

চারজন অপারেটরকে দায়িত্ব দেওয়া হলো, তারাই বেলিন্ডাকে মেইনল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে সেফ হাউসে তুলবে। ছোট একটা বোটে চড়ে রওনা হয়ে গেল ওরা পাঁচজন।

মার্সিডিজ নিয়ে ফেরার পথে, ফাইভ স্টার হোটেল টাকলা মাকান ইন-কে পাশ কাটাচ্ছে, হঠাৎ একটা পাজেরো নিয়ে হোটেলটার ভিতর এয়ার ভাইস মার্শাল থাকিন মাউংকে ঢুকতে দেখল রানা। গাড়িটা থামিয়ে রাস্তা পেরুল ও, তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে পিছু নিল সাবেক বার্মিজ এয়ার ফোর্স অফিসারের।

একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকলেন এয়ার ভাইস মার্শাল। ডান্স ফ্লোর সংলগ্ন রেস্তোরাঁ, ট্যুরিস্টরা প্রায় সবাই বিদেশি।

একটা টেবিল দখল করে আগে থেকেই বসে আছেন ওখানে নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট থান বানডুলা, তাঁর পাশে গিয়ে

বসলেন থাকিন মাউং। ওঁদের টেবিলটার কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে রানাও একটা টেবিলে বসল, এই ফাঁকে ডিনারটা সেরে নেবে।

ওর ডিনার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই সময় থাকিন মাউং আর থান বানডুলার সঙ্গে যোগ দিল দুই আমিরাত শেখ—ফাহাদ ইবনে কাবিল আর কালাম ইবনে উমর।

ডান্স ফ্লোর থেকে ওদের টেবিল অনেকটা দূরে হওয়ায় রানাকে তারা দেখতে পাচ্ছে না।

একটু পরেই বোঝা গেল এত থাকতে টাকলা মাকান ইন-এর ডান্স ফ্লোরে কেন এসেছে তারা। অ্যাড্রেস সিস্টেমে ঘোষণা করা হলো, এরপর শুরু হবে মিশর থেকে বিশেষ দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসা বেলি ডান্সার প্রিন্সেস লায়লা-র নাচ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার ফিগার ও অঢেল রূপ-লাবণ্য নিয়ে মঞ্চে আগমন ঘটল প্রিন্সেস লায়লার। ওর নাচ শুরু হতেই স্থির হয়ে গেল দর্শকরা, মুগ্ধ নয়নে উপভোগ করছে। সেজন্যই রানার চোখের কোণে নড়াচড়াটা ধরা পড়ল।

কে জানে কী নিয়ে দুই আমিরাত শেখ ঘন ঘন হাত নেড়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। তাদেরকে থামানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছেন এয়ার ভাইস মার্শাল আর নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট। সেটা লক্ষ করে হোটেল সিকিউরিটির দুজন অফিসার দ্রুত পায়ে সেদিকে এগোল।

ডিনার আগেই শেষ হয়েছে, বিলও মিটিয়ে দিয়েছে রানা, অত্যন্ত সাবধানে টেবিল ছাড়ল ও।

সিকিউরিটি অফিসারদের পিছু নিয়ে এগোচ্ছে রানা, ওকে যাতে তারা দেখতে না পায়। টেবিলটার কাছাকাছি পৌঁছেছে, এই সময় দুই শেখের কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, চট্টগ্রাম জেলার আঞ্চলিক ভাষায় নিজেদের মধ্যে তর্ক করছে আরব আমিরাতের দুজন শেখ। তর্কের বিষয় আর কিছু নয়, প্রিন্সেস লায়লাকে আজ রাতের জন্য

ভাড়া করে হোটেল আন্দামানে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে কি হবে না।

সাবধানে সরে গেল রানা। এখান থেকে আর কিছু জানবার নেই ওর।

রাত এগারোটা। হোটেল আন্দামান। ছয়তলা, বেলিন্ডার স্যুইট।

অনেকক্ষণ হলো কী হোলে চোখ রেখে বাইরের বারান্দা আর সিঁড়ির উপর নজর রাখছে রানা, কিন্তু এখন পর্যন্ত কাউকে আসা-যাওয়া করতে দেখেনি।

শত্রুর শিবিরে ঢুকে পড়েছে, অথচ কাজে কোনও অগ্রগতি না হওয়ায় অস্থিরতা বোধ করছে ও; সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুরাইয়া কখন চাবি এনে দেবে তার অপেক্ষায় না থেকে নিজেই চেষ্টা করে দেখবে সাততলায় ওঠা যায় কি না।

সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, যে-কোনও মুহূর্তে ওকে ধরে ইমনের মত টরচার করা হতে পারে, এই উদ্বেগটা আরও বেশি অস্থির করে তুলছে ওকে।

এটা যদি তুং শানের নিরাপদ ঘাঁটি হয়, সার্চ করলে এখানে নিশ্চয়ই এমন কিছু পাওয়া যাবে, যা দেখে বুঝতে অসুবিধে হবে না কী তার পেশা, কী ধরনের ক্রাইমের সঙ্গে জড়িত সে, বাংলাদেশী জঙ্গিরা কী কারণে তাকে পাঁচ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে।

সঙ্গে ইস্পাতের সরু একটা কাঠি আছে, ওটা দিয়ে আধুনিক ও জটিল অনেক তালা খোলা যায়; এখন চেষ্টা করে দেখতে হবে এই এগারো তলা উঁচু দালানটার প্রতিটি ফ্লোরে ঢু মারা সম্ভব কি না।

এরকম বিপজ্জনক কাজে যে হাত দেয় তার জানা আছে, মৃত্যুর সঙ্গে খেলতে চলেছে সে। কাজেই শুধু আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নয়, পালানোর প্রস্তুতিও নিয়ে রাখতে হয় তাকে। সেরকম

প্রস্তুতি নেওয়ার সরঞ্জাম ওর ব্রিফকেসের ফলস্ বটমে থাকে।

নিঃশব্দে দরজা খুলে চওড়া, নির্জন বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। বারান্দা আর করিডর আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। দু'দিকের করিডরে যতদূর দৃষ্টি যায় কেউ কোথাও নেই। কয়েক পা হেঁটে দেয়ালে আটকানো সুইচবোর্ডের সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েকটা বোতামে চাপ দিয়ে বন্ধ করে দিল আলোর কয়েকটা উৎস।

প্রায় অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, প্রথমে সাততলায় ওঠার চেষ্টা করবে, নাকি দেখবে বেলি ডান্স দেখে ফাহাদ ইবনে কাবিল ও কালাম ইবনে উমর হোটেলে ফিরেছে কি না।

টাকনা মাকান ইন থেকে হোটেলে ফিরে রিসেপশনে থেমেছে রানা, কৌশলে প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছে দুই ছদ্মবেশী আমিরাত শেখ ছয়তলার দুটো স্যুইটে থাকে। তবে তাদের লিডার জালাল ইবনে আসাদ কোথায় থাকে তা জানতে পারেনি।

ওর প্রশ্ন শুনে রিসেপশনিস্ট মেয়েটা শুধু বলেছে, 'তিনি মিস্টার তুং শানের ব্যক্তিগত গেস্ট। আমি এর বেশি কিছু জানি না।'

রানার অবশ্য মনে আছে আজ সন্ধ্যার দিকে জালাল ইবনে আসাদকে সাততলায় উঠতে দেখেছে বেলিন্ডা।

সাততলায় ওঠার দরজা আর এলিভেটরের তালা দুটো নাগালের মধ্যে, দেখতে পাচ্ছে রানা; কাজেই প্রথমে চেষ্টা করা উচিত ওগুলো খোলা যায় কি না।

এলিভেটরের কী হোল দুটো, তাও চৌকো আকৃতির; রানার কাছে এমন কিছু নেই যে একসঙ্গে দুটো গর্তে ঢোকাতে পারবে। তবু ইস্পাতের সরু কাঠিটা পালা করে দুই গর্তে ঢুকিয়ে কিছু করা যায় কি না দেখল ও।

দু'মিনিট পর বুঝল, পণ্ডশ্রম হচ্ছে। ওটাকে ছেড়ে দরজার

কী হোল নিয়ে পড়ল। এবার হার মানতে তিন মিনিট সময় নিল রানা।

তারপর একসঙ্গে হাজির হলো আশার আলো ও সমূহ বিপদ।

আশার আলোটা জ্বলছে একটু দূরে, দ্বিতীয় এলিভেটরের মাথায়—গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে ছয় তলায় উঠে আসছে কেউ। আর বিপদটা হলো, রানার লুকাবার জায়গা নেই!

তারপর বিদ্যুৎ চমকের মত একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। লুকাবে কেন, বিশিষ্ট একজন গেস্ট হিসাবে স্বাভাবিক আচরণ করবে: ও-ও সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে ছয়তলায়! হোটেলের কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, বান্ধবী বেলিন্ডার স্যুইটে যাচ্ছে।

উঠতে হলে নামতে হয়, তাই দ্রুত কয়েকটা ধাপ নেমে গেল রানা। ওখানে দাঁড়িয়ে কান পেতে আছে। হিস্স্ করে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। কার্পেটের উপর জুতো পরা পায়ের মৃদু নরম শব্দকে ছাপিয়ে উঠল একটা খসখসে আওয়াজ, যেন সিল্ক কাপড়ে ঘষা লাগছে।

ছদ্মবেশী শেখদের কেউ?

ঠিক সময় মত ধাপ বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল রানা। সিঁড়ির মুখটাকে পাশ কাটাচ্ছে সদ্য এলিভেটর থেকে নামা লোকটা, রানাও একটা চুরুট ধরাবার ফাঁকে অলসভঙ্গিতে শেষ ধাপ টপকে বারান্দার কার্পেটে পা দিল।

একযোগে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা।

সাদা আলখেল্লা পরা শেখ ফাহাদ ইবনে কাবিলকে চিনতে পারছে রানা। একা সে, সঙ্গে না আছে সঙ্গী কালাম ইবনে উমর, না আছে মিশরীয় বেলি ডান্সার প্রিন্সেস লায়লা। তার মানে টসে হার হয়েছে লোকটার। হোটেল আন্দামানে নিয়ে আসা যায়নি প্রিন্সেস লায়লাকে।

কোনও হোটেলের দুজন মুখ চেনা বোর্ডার হঠাৎ মুখোমুখি

হলে কুশল বিনিময় হতেই পারে। কাবিলের সঙ্গে চোখাচোখি হতে মৃদু হাসল রানা, বলল, 'আসসালামু আলায়কুম!'

মেজাজ ভাল নয়, কর্কশ সুরে জবাব দিল ছদ্মবেশী জঙ্গি, 'ওয়ালাইকুম সালাম।' ক্লান্ত সে, বারান্দা থেকে আলোকিত করিডরের দিকে এগোচ্ছে।

তার পিছু নিল রানা।

একটা বাঁক ঘুরল ফাহাদ ইবনে কাবিল। প্রথম দরজার সামনে থামল সে। আলখেল্লার পকেট থেকে চাবি বের করে কী হোলে ঢোকাল। তবে চাবিটা ঘোরাল না, এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখছে রানাও বাঁক ঘোরে কি না।

আলখেল্লার খসখস আওয়াজ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁক না ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। শরীরটাকে দেয়ালের সঙ্গে সাঁটিয়ে শুধু একটা চোখ বের করল বাঁকের ওদিকটায়। ফাহাদকে ইতস্তত করতে দেখে মাথাটা টেনে নিল আবার, একটা আওয়াজ শোনার অপেক্ষায় আছে।

অপেক্ষা সার্থক হলো, কী হোলে চাবি ঘোরাতে ভেসে এল আওয়াজটা—ক্লিক! আরও এক সেকেন্ড দিল রানা ফাহাদকে। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে।

দরজার কবাট সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে স্যুইটের ভিতর পা ফেলেছে ফাহাদ, এই সময় শিকারি চিতাবাঘের মত ওর ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল রানা। দুটো শরীর অন্ধকার কামরার ভিতর ছিটকে পড়ল।

রানার নীচে মোচড় খাচ্ছে লোকটার উপুড় হয়ে পড়া শরীর, তবে তাকে ছাড়ল না ও। এক হাতে তার ঘাড় চেপে ধরল, আরেক হাত দিয়ে দমাদম ঘুসি মারল কানের পাশে। চোয়ালে মারল ভাঁজ করা কনুইয়ের নির্দয় গুঁতো।

ভালমত দুরমুশ করে যখন টের পেল ধস্তাধস্তির মাত্রা কমে আসছে, লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা, দরজা লাগিয়ে দিয়ে

দেয়ালের বিশেষ জায়গায় হাত ঝাপটা মেরে আলো জ্বালল।

হাঁপিয়ে গেছে রানা, তারপরও বাঁকা হাসি ফুটল ঠোঁটে। মার খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেছে ফাহাদ, একটা চোখ ফুলে আলু হয়ে উঠেছে, চোয়ালের উপরের মাংস ঝুলে পড়েছে ইঞ্চিখানেক। তারপরও যেন কিছু হয়নি ফাহাদের। ক্ষিপ্রভঙ্গিতে সিধে হচ্ছে সে, ডান হাতে বেরিয়ে এসেছে লম্বা একটা ছুরি।

তবে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে জানে লোকটা। দু'বার বলতে হলো না, ছুরিটা ফেলে দিল; একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার হাতে ধরা পিস্তলের দিকে।

সিটিং রুম সার্চ করে ক্যামেরার লুকানো লেন্স বা গোপন মাইক্রোফোন, কিছুই পায়নি রানা।

সার্চ করেছে ফাহাদকেও। আরেকটা ছুরি পাওয়া গেছে তার কোমরের বেল্টে। আর পাওয়া গেছে দুটো চাবি—একটা সম্ভবত সাততলায় ওঠার সিঁড়ির দরজার, আকারে ঢাউস; আরেকটার মাথা চেরা, দুটো গর্তে ঢোকানোর জন্য দু'ভাগ করা—নিশ্চয়ই প্রাইভেট এলিভেটরের তালায় ঢুকবে।

লোকটার নকল দাড়ি আর পরচুলা আগেই খসে পড়েছে। প্রৌঢ় নয়, খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হবে।

কোনও কারণ না দেখিয়ে প্রথমে ফালি করে ছেঁড়া আলখেল্লা দিয়ে তার হাত ও পা একটা চেয়ারের সঙ্গে বেঁধেছে রানা, তারপর মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে জ্বলন্ত চুরুট চেপে ধরেছে গলায়, বগলের খাঁজে আর চোখের নীচে।

প্রচণ্ড ব্যথায় এমনই খিঁচুনি উঠে গেল যে, তিন-চারবার চেয়ারসহ উল্টে পড়তে গেল ফাহাদ। প্রতিবার চেয়ারটা সিধে করে নিজের কাজ করে গেল রানা। আরও দশ মিনিট ছ্যাকা খেল ফাহাদ। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

তার চোখে-মুখে পানির ছিটা দিল রান্না। জ্ঞান ফেরার পর গোঙাতে শুরু করল লোকটা। ইতিমধ্যে তার মুখের ভিতর থেকে কাপড়ের বলটা বের করে নেওয়া হয়েছে। তবে হাত-পায়ের বাঁধনগুলো খোলা হয়নি।

'নাম?' কোনও ভূমিকা নয়, সরাসরি বাংলায় জেরা শুরু করল রানা, তার আগে একটা টান দিয়ে চুরুটের আগুন উস্কে নিয়েছে।

'মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান খান,' চুরুটটার দিকে চোখ রেখে বলল লোকটা, ফোঁপাচ্ছে। 'আপনি কে? হিন্দুস্তানের গুপ্তচর? ইসলামের শত্রু?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মাথা নাড়ল সে। 'আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবেন না!'

'কী করে জানলে আমি ভারতের চর?' অভিযোগটা অস্বীকার না করে লোকটাকে রানা ধারণা দিতে চাইছে তার অনুমান অমূলক নয়।

'কানাঘুষো চলছে, চর পাঠাবে ওরা।'

'পেশা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কোনও পেশা নাই। আল্লাহর পথে চলি, কাফের মারি, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জিহাদ করি।'

'পেট চলে কীভাবে?'

'আল্লাহ চালায়।'

'তা হলে তুং শানকে পাঁচ হাজার কোটি টাকা দিলে কীভাবে?' রানার ধারণা তথ্যটা অস্বীকার করবে ইমরান।

কিন্তু না, তা করল না সে। 'এক হাত পেয়েছে, আরেক হাত দিয়েছে।'

টাকাটা কোত্থেকে এসেছে, কারা দিয়েছে জানে রানা, তাই এ প্রসঙ্গে আর কোনও প্রশ্ন করল না। 'শেখ জালাল ইবনে আসাদ ওরফে সালাউদ্দিন শাহ কুতুব, তাই না?' জানতে চাইল ও। 'আসলে কে সে?'

'হ্যাঁ। আমরা সাত সংগঠন এক হয়েছি, তিনি আমাদের সবার লিডার।'

'কী চায় সে?'

তাঁর নিজের কোনও খায়েশ বা স্বপ্ন নাই। আমাদের সবার একটাই চাওয়া—সত্যিকার ইসলাম কায়েম করে দুনিয়ার বুক থেকে কাফেরের বংশ নির্মূল করা।'

'কিন্তু কাফেররাও তো মানুষ। তারা তো তোমাদের কোনও ক্ষতি করছে না। আল্লাহ পাক বলেছেন: লা কুম দীন কুম ওলিয়া দীন—তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার; কোরান পড়োনি? একথা জানা নেই তোমাদের? তা ছাড়া, তোমরা তো নির্বিচারে মোমিন মুসলমানদেরকেও মারছ। জানো না, কত ভয়ঙ্কর গোনার কাজ করছ?'

এর জবাব এড়িয়ে গেল ইমরান, ধর্মান্ধদের বুলি কপচে গেল:

'মুসলমান হয়েও যে কোরান পাক আর পবিত্র হাদিসের বিধি-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন না করে, সে-ই তো ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন, তাদেরকে তো সবার আগে কতল করতেই হবে।'

'কেউ যদি কাফের হয়, নবি রসুল ও কোরানে পাকের প্রতি ঈমান না আনে; ঠকবে সে, শেষ বিচারে শাস্তি হবে তার; সে-সব আল্লাহই দেখবেন। তুমি কে?'

'সাচ্চা একজন মুসলমান হিসাবে আমার উপর ইসলাম কায়েমের দায়িত্ব বর্তায়, আমাকে জিহাদ করতে হবে, তা না হলে আমিও মুসলমান থাকব না।'

'কোথায় লেখা আছে কথাটা?'

'আমার অন্তরে।'

ফ্যানাটিকরা যুক্তি বুঝবে না, জানে রানা, তাই প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল, 'শেখ কালাম ইবনে উমরের আসল নাম বলো।'

'আলহাজ্ব মাওলানা তকদির হুসেন,' জবাব দিল ইমরান।

হাতের চাবিদুটো দেখাল রানা। 'এগুলো ওপরে যাওয়ার চাবি?'

মাথা ঝাঁকাল ইমরান। 'তবে নামার চাবি আলাদা।'

'এ-চাবি তোমার কাছে কেন?'

'আমাদের তিনজনকেই দেওয়া হয়েছে। আরও চারজন পৌঁছে গেলে তারাও পাবে। একজন একজন করে উঠে যাব সাততলায়। গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হবে আজ গভীর রাতে।'

'তারপর নামবে কী করে?'

'এগুলো রেখে দিয়ে অন্য এক সেট করে চাবি দেয়া হবে আমাদেরকে। ওগুলোর সাহায্যে নামা যাবে, কিন্তু ওঠা যাবে না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। চট্ করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল। 'আর তুং শান? তার সম্পর্কে কী জানো বলো।'

ধীরে ধীরে শুরু করল ফাহাদ ওরফে ইমরান। অনেক কথাই বলল সে, সংক্ষেপে এরকম: তুং শানের আদি ও অকৃত্রিম পরিচয় হলো সে আসলে একজন কুখ্যাত বোম্বেটে—জলদস্যু।

তার উত্থানের ইতিহাস যেমন চমকপ্রদ, তেমনি রোমহর্ষক। প্রথম জীবনে তাইওয়ানের বন্দর এলাকার ভাড়াটে খুনি ছিল সে। এক সময় উপলব্ধি করল, খুন করে ধনী হওয়া যায় না, ডাকাতি করে হওয়া যায়।

ব্যস, তাণ্ডব সিং নামে এক তরুণ ভারতীয় শিখের বোট ভাড়া নিয়ে হয়ে গেল তাইওয়ান প্রণালীর নিষ্ঠুরতম জলদস্যু। তাণ্ডব সিংও পাঞ্জাবের কুখ্যাত খুনি, পুলিশের ভয়ে পালিয়ে এসে তাইওয়ানে লুকিয়ে ছিল। মাত্র দু'বছরেই জলদস্যু হিসাবে কুখ্যাতি অর্জন করল তুং শান। নিঃসঙ্গ লঞ্চ বা স্টিমার ছিল তার টার্গেট।

প্রথমে সব কিছু কেড়ে নিয়ে যাত্রীদেরকে ছেড়ে দিত তুং

শান। তার মধ্যে স্যাডিস্টিক কিছু একটা দেখে তাণ্ডব সিং তাকে বুদ্ধি দিল, বস্, এমন কিছু করো যাতে তোমার নাম শুনলেই আতঙ্কে নীল হয়ে ওঠে মানুষ।

কথাটা মনে ধরল তুং শানের। সেই থেকে শুরু হলো তার নৃশংসতা। লঞ্চে কোনও তরুণী থাকলে ধর্ষণের পর তার স্তন কেটে নিল, তরুণ থাকলে তার পুরুষাঙ্গ। বুড়ো-বুড়িদের ছুঁড়ে ফেলে দিল গভীর সাগরে।

তাইওয়ান প্রণালীতে একটানা তেরো বছর ডাকাতি করল তুং শান। কেউ তার বিরুদ্ধে কখনোওই কোনও পদক্ষেপ নেয়নি, কারণ কুখ্যাতি অর্জনের আগেই পুলিশ ও আর্মির কয়েকটা মাথা কিনে নিয়েছে সে, নিয়মিত বখরা দিয়েছে তাদেরকে এবং তাদের মাধ্যমে জনাকয়েক প্রভাবশালী রাজনীতিককেও। সবাই জানে তুং শানের মূল ব্যবসা বিভিন্ন ধরনের ড্রাগস ও আর্মস স্মাগলিং, কিন্তু কেউ একটা আঙুলও নাড়েনি ওর বিরুদ্ধে।

এভাবে কয়েক শো কোটি মার্কিন ডলার জমানোর পর হাজার কোটি কামানোর দিকে মন দিল তুং শান। তাইওয়ান বিজ্ঞান সমিতিতে মোটা টাকা ডোনেশন দেওয়ার সুবাদে মেধাবি কিছু বিজ্ঞানীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাদেরকে সে তার মনের একটা সাধের কথা খুলে বলল। উন্নত বিশ্বের স্যাটেলাইট ফ্যাসিলিটি দরকার তুং শানের।

তারপর নব্বুই বছরের লিজ নিয়ে দেশী-বিদেশি ট্যুরিস্টদের জন্য ক্যাকটাস দ্বীপে আধুনিক রিসর্ট সেন্টার গড়ে তুলল মায়ানমারের একজন ব্যবসায়ী। ওই ব্যবসায়ীকে সামনে রেখে এই তাইওয়ানিজ জলদস্যু তুং শান গোপনে এখানে তার দুর্ভেদ্য আস্তানা গড়ে তুলেছে।

বিভিন্ন দেশের স্যাটেলাইটের সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা করেছে সে, তার টেকনিশিয়ানরা প্রতি মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছে কোন্ দেশের জাহাজ কী কার্গো নিয়ে কোথায় যাচ্ছে। কোনও

জাহাজে নিষিদ্ধ পণ্য থাকলে, নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি পণ্য বহন করা হলে, কিংবা সমুদ্রপথে চলাচলের যে-কোনও আইন অমান্য করা হলে সংশ্লিষ্ট জাহাজকে তুং শানের লোকেরা মাঝসাগরে থামিয়ে মোটা টাকা চাঁদা আদায় করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে ডাকাতি করে, কিংবা মাঝ সাগরে ডুবিয়ে দেয়। ওই ডুবিয়ে দেওয়া জাহাজ পরে উদ্ধার করা হয়।

ঝট্ করে আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল রানা। 'পাঁচ হাজার কোটির বিনিময়ে কী পাচ্ছ তোমরা?'

বেশ বড় হলো উত্তরটা। সংক্ষেপে এরকম:

মাস চারেক আগের কথা। বাংলাদেশ ও মায়ানমার জলসীমার কাছাকাছি ডুবিয়ে দেয়া একটা জাহাজ উদ্ধারের প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছিল তুং শানের টেকনিশিয়ানরা, ঠিক সেই সময়ে শুরু হয় সুনামি। তোবড়ানো একটা ভারতীয় সাবমেরিনকে ডুবতে দেখেছে তারা—ডিটেকশন ইকুইপমেন্টের সাহায্যে।

পরে তাদের গাইগার কাউন্টারে দেখা গেছে সাগরের তলায় পড়ে থাকা সাবমেরিন থেকে রেডিওঅ্যাকটিভ বিকিরণ হচ্ছে।

অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ওর টেকনিশিয়ানরা জেনে নিয়েছে কী আছে সাবমেরিনে। ওয়াটারপ্রুফ ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে ওটার ছবিও তুলেছে।

'কী আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা, যেন কিছুই জানে না।

'আটটা দূরপাল্লার মিসাইল,' গাল ফোলাল ইমরান, তারপর থোক্ করে থুথু ফেলল—লাল রক্ত মেশানো থুতুর সঙ্গে একটা দাঁত ছিটকে পড়ল কার্পেটে। 'প্রতিটিতে একটা করে পারমাণবিক বোমা ফিট করা।'

'ভাগ্যিস তোমার দাঁতেও নেই!'

'ব্যঙ্গ করছ? করো। তবে শুধু একটা কথা মনে রাখতে বলি—সালাউদ্দিন শাহ কুতুব যখন দায়িত্ব নিয়েছেন, এবার আর

রক্ষা নাই! কী ভেবেছ আমাদেরকে তোমরা? কয়েকজনকে ফাঁসী দিয়েই পার পেয়ে যাবে? প্রথমে বাংলাদেশকে কাফের-মুক্ত করা হবে, তারপর ধরা হবে তোমাদের হিন্দুস্তানকে। এই উপমহাদেশকে কাফেরমুক্ত করে ইসলামি হুকুমাত কায়েম করে ছাড়ব আমরা, ইনশাল্লাহ্! তারপর ধরব...' রানার চেহারা বদলে যাচ্ছে দেখে বুঝে নিল জঙ্গি, যে-কোনও মুহূর্তে ওর ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। একটা ঢোক গিলল সে।

'ঢাকা থেকে তোমরা আত্মীয়স্বজন নিয়ে গ্রামের দিকে সরে যাচ্ছ,' বলল রানা, 'এর সঙ্গে কি ওই আটটা নিউক্লিয়ার ওঅরহেডের সম্পর্ক আছে?'

'ইন্ডিয়ার ওই আটটা মিসাইল আমরা কিনছি,' বলল ইমরান।

'কেন?'

'এর উত্তর আমার জানা নেই।'

সোফা ছেড়ে ইমরানের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। 'তা হলে যে বললে, বাংলাদেশকে কাফের-মুক্ত করে ছাড়বে?'

'মাওলানা শাহ কুতুব যা বলেন, শুনে আমরাও তা-ই বলি।'

'ঠিক আছে, অনুমান করো—আটটা মিসাইল নিয়ে কী করা হবে।' জানতে চাইল রানা।

'আমার কল্পনাশক্তি তেমন ভাল নয়।'

হঠাৎ হাতের পিস্তলটা বিদ্যুৎ বেগে নামিয়ে আনল রানা ইমরানের নাকের ঠিক নীচে।

'বাবা রে! মা রে!' বলে চিৎকার জুড়ে দিল ইমরান। তার মুখের ভিতর থেকে আরও দুটো দাঁত ছিটকে পড়ল কার্পেটের উপর।

রানাকে নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরাতে দেখে চিৎকার থামাল সে। গোঙাতে শুরু করল, তারই ফাঁকে জবাব দিচ্ছে, 'আল্লাহর কসম বলছি, মিসাইল আরও বেশি দামে বিক্রি করা হবে, নাকি

যাদের জিনিস সেই কাফেরদের দেশেই ছোঁড়া হবে. আমি জানি না—'

'সত্যি কথা বলো. তা না হলে একই জায়গায় বারবার মারব।'

অসহ্য যন্ত্রণায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে ইমরান এবার বলল. 'আমার সন্দেহ হয়েছে. প্রথমে একটা বোমা ফাটিয়ে বাংলাদেশকে ভয় দেখানো হবে: গদি ছেড়ে সরে যেতে বলা হবে সরকারকে. অস্ত্র সমর্পণ করতে বলা হবে সামরিক বাহিনীকেও। কিন্তু নির্দেশ যদি মানা না হয়. দ্বিতীয় মিসাইল মেরে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। কিন্তু এটা তো অবাস্তব চিন্তা।'

'কেন?' পিছু হটে সোফায় বসল রানা।

'দেড় কোটি লোকের বাস এই ঢাকা শহরে। দেশের সব সম্পদও তো জড়ো হয়েছে এখানেই। রাজধানী ঢাকা ধ্বংস হয়ে গেলে, এত মানুষকে খুন করে ফেললে, ইসলাম কায়েম হবে কী করে? কোথায় পাব আমরা শিক্ষিত. উপযুক্ত লোক. যাদের পিঠে বন্দুক ধরে হুকুমত চালাবার কাজটা করিয়ে নেয়া যাবে?' মুখ দিয়ে সারাক্ষণ কাতর শব্দ করবার ফাঁকে কথা বলছে সে। 'আমরা তো জানি শুধু...' থেমে গেল সে রানা নড়ে উঠতেই।

রানা হাসছে না। 'ও. আচ্ছা. তুমি চাইছ তোমার সবগুলো দাঁত মাঢ়ী থেকে খসিয়ে দিই!' হাতের পিস্তলটা উল্টো করে ধরল ও. তারপর সোফা ছেড়ে এগিয়ে এল।

'আল্লাহ সাক্ষী. সত্যিই আমি জানি না!' মিনতির সুরে বলল ইমরান। 'সবাইকে সব কথা বলা হয় না। আমাদের লিডার সালাউদ্দিন শাহ কুতুবকে জিজ্ঞেস করুন. তিনি সব জানেন। তবে. কানাঘুষায় শুনেছি পরের দুটো মিসাইল মারা হবে নয়াদিল্লি আর কোলকাতা লক্ষ্য করে: পাঁচ নম্বরটা...' হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল ইমরান। 'এসব আপনাকে বলে দিয়ে কী

গোনার কাজ যে করছি...' রানা উঠে দাঁড়াচ্ছে দেখে চট্ করে বলল, 'বলছি, বলছি... আল্লার ওয়াস্তে আর মারবেন না!'

'বেশ, বলে যাও। পঞ্চমটা?'

'ওটা ফাটানো হবে লন্ডনে, আমেরিকার চামচাগিরি আর আফগানিস্তান ও ইরাকে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মুসলমানকে খুন করার অপরাধে। ছয় নম্বরটা ফেলা হবে ইজরায়েলের রাজধানী জেরুজালেমে। আর ইরাক-আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে, সেইসঙ্গে ওসামা বিন লাদেনের নির্দেশ অনুযায়ী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে প্রাণ বাঁচানোর একটা সুযোগ দেয়া হবে আমেরিকাকে, কথা অমান্য করলে শেষ দুটো বোমা ফেলা হবে নিউ ইয়র্ক আর ওয়াশিংটন শহরে। এসবই করা হবে আল-কায়দার পক্ষ থেকে। এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন আমাদের লিডার সালাউদ্দিন আল...'

লোকটার কথা বিশ্বাস করছে রানা। 'কোথায় পাব তাকে?'

'আজ রাতে তুং শানের সঙ্গে থাকার কথা তাঁর,' বলল ইমরান। 'ওঁরা বোন-ইয়ার্ডে যেতে পারেন, আবার সাগরে ডুব দিয়ে সাইট দেখতেও যেতে পারেন, আমি ঠিক জানি না।'

'সাইট?' জানতে চাইল রানা।

'যেখানে সাবমেরিনটা ডুবেছে।' ইমরানের ঠোঁটের কোণ বেয়ে রক্ত আর লালা গড়াচ্ছে। 'প্রথম মিসাইলটা তোলার জন্যে দিনরাত কাজ হচ্ছে ওখানে।'

'আর বোন-ইয়ার্ডে কী?'

'টাগবোট নিয়ে প্রায় রোজ রাতেই ওখানে যায় ওরা, ব্যস, আল্লাহর কসম, এর বেশি আমি কিছু জানি না,' বলল ইমরান।

'ওরা মানে কারা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তুং শান আর তার টেকনিশিয়ানরা,' বলল ইমরান।

'টাগবোট নিয়ে কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওটা আসলে একটা ইয়ট,' বলল ইমরান খান, 'ভেঙেচুরে

টাগবোটের আদল দেয়া হয়েছে, ঘন ঘন আসা-যাওয়া করতে দেখলেও কেউ যাতে কিছু সন্দেহ না করে। ইন্ডিয়ান নেভির গানবোট তো সারাক্ষণই গোটা এলাকায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।' একটু দম নিল সে, তারপর জানতে চাইল, 'আচ্ছা, আমাকে নিয়ে কী করা হবে?'

'মানুষের সমাজে হিংস্র জানোয়ার ঢুকে পড়লে তাকে কী করা হয়?' জিজ্ঞেস করল রানা, তারপর উল্টো করে ধরা পিস্তলটা আবার সজোরে নামিয়ে আনল জঙ্গি লোকটার মাথায়। এবার সোজা চাঁদি বরাবর।

পনেরো

মাথা চেরা চাবিটা প্রাইভেট এলিভেটরের চৌকো কী হোলে অনায়াসে ঢুকে গেল, মোচড় দিতেই নীরবে খুলে যাচ্ছে দরজা। দু'পাশের বারান্দা আর করিডর ভাল করে দেখে নিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা।

সোজা এগারোতলায় উঠছে, ওর ইচ্ছে ফ্লোরগুলোয় সার্চ শুরুর আগে সম্ভব হলে সুরাইয়ার সঙ্গে একবার কথা বলবে। হয়তো নতুন কিছু জানতে পেরেছে ও।

নিজের বেশভূষার কথা ভেবে মনে মনে হাসল রানা। হঠাৎ ওকে এভাবে দেখে সুরাইয়া না ভয় পেয়ে যায়!

মাওলানা ইমরানের সৌদি দাড়ি-গোঁফ ও পরচুলা ওর মুখ আর মাথায় ভালই খাপ খেয়ে গেছে। তার ওয়ার্ড্রোবে ইস্ত্রি করা

এক সেট আলখেল্লা পেয়ে সেটাও পরে নিয়েছে ও।

এলিভেটর এগারোতলায় থামল। দরজা খুলে যেতে গাঢ় অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না রানা। পেন্সিল টর্চ জ্বেলে সামনের করিডরে বেরোল ও।

বারোতলায় ছাদ, সেখানে ওঠার জন্য শুধু একটা সিঁড়ি আছে, তবে তাতে ইস্পাতের ভারী দরজা লাগানো, কী হোল দেখেই বোঝা যাচ্ছে মাওলানা ইমরানের কাছ থেকে পাওয়া চাবিটা ভিতরে ঢুকবে না, এটার আকৃতি অন্য রকম। নিজেকে রানা বলে রাখল, সুযোগ পেলে ছাদের কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্টগুলো ধ্বংস করতে হবে।

চার প্রস্থ বারান্দায় চারটে দরজা। যথাসম্ভব কম আওয়াজ করে প্রথমটার তালা খুলে ভিতরে ঢুকল ও। এই দালানের বারান্দা, করিডর আর স্যুইটের মত ফ্ল্যাটেও কোনও জানালা নেই। গোটা বিল্ডিং শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত।

ফ্ল্যাটটা চারহাজার বর্গফুটের বেশি হবে তো কম নয়। সব মিলিয়ে ছয়টা বেডরুম, আটটা বাথরুম; লিভিং রুমটা এত বড় যেন ফুটবল খেলা যাবে। রানা আন্দাজ করল এই ফ্ল্যাট থেকে বাইরের চার প্রস্থ বারান্দার যে-কোনওটায় বেরুনো যায়।

ফ্ল্যাটে সুরাইয়া নেই। তার মানে নিশ্চয় তুং শানের ফ্ল্যাটে পাওয়া যাবে ওকে।

অন্য একটা দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরুল রানা। দু'দিকের করিডরও অন্ধকার। দশতলার ফ্ল্যাটে ঢোকার আগে এই ফ্লোরের করিডরগুলো একবার দেখা দরকার।

দুটো করিডরই ইংরেজি বড়হাতের 'এল' আকৃতির। দুটোরই কয়েকটা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল রানা। এই ফ্লোরে মানুষজন থাকে বলে মনে হলো না। কমিউনিকেশন বা ডিটেকশন ইকুইপমেন্টও নেই। ঘরগুলো সব খালি পড়ে আছে।

দশতলায় নেমে এল রানা। এখানেও কোনও আলো জ্বলছে

না। অত্যন্ত সাবধানে তুং শানের ফ্ল্যাটে ঢুকল ও। তবে ওদের দুজনের কাউকে পাওয়া গেল না।

হয়তো মাওলানা ইমরানের কথাই ঠিক—তুং শান হয় বোন-ইয়ার্ডে গেছে, নয়তো মিসাইল উদ্ধার অপারেশন দেখতে সাগরের তলায় নেমেছে।

সেটা হলে তো ভালই হয়, ভাবল রানা। সম্ভব হলে তুং শানের অনুপস্থিতিতে তার সমস্ত কমিউনিকেশন ও ডিটেকশন ফ্যাসিলিটি ধ্বংস করবে ও।

নয় আর আট নম্বর ফ্লোরেও কিছু নেই। ইতিমধ্যে রানার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, কোনও ফ্লোরে জানালা আর ভেন্টিলেটার না থাকায় তুং শানের এই আস্তানা থেকে চুপিসারে পালানো অসম্ভব। পালাতে হলে ইস্পাতের দরজা খোলার জন্য চাবি দরকার, নয়তো ভাঙার জন্য বিস্ফোরক; তারপর ঠেকাতে হবে গার্ডদের অবিরাম গুলিবর্ষণ।

রানার চোখ-মুখ থমথমে হয়ে উঠল, ভাবল, দেখা যাচ্ছে নাইলন রশির কয়েল দুটো শুধু শুধুই সঙ্গে রেখেছে ও।

তবে সাত নম্বর ফ্লোর সম্পূর্ণ অন্য কাহিনি।

এলিভেটরের দরজা খুলতেই সাদা আলোর বন্যা অন্ধ করে দিল রানাকে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়ে খানিক পর আবার যখন ভাল করে তাকাল, বুকের সামনে অটোমেটিক রাইফেলের মাজল্ ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। সেটা ঠিক স্থির নয়, ইতস্তত ভঙ্গিতে নড়াচড়া করছে।

ইউনিফর্ম পরা এই চিনা গার্ডকে রানা চেনে না। এটুকু পরিষ্কার যে ওর বেশভূষা তার কাছ থেকে বিশেষ সম্মান আদায় করতে পারছে না। তবে ওকে দেখে যে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেছে লোকটা, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই।

গার্ড ভাবছে—মাওলানা উপরতলায় কোথাও ছিল, এটা অসম্ভব একটা ব্যাপার, অথচ নামল তো ওদিক থেকেই! চোর-

ডাকাত বলেও মনে হচ্ছে না, হাতে অস্ত্র নেই। সম্পূর্ণ শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন একজন মানুষ। রাইফেলটা নামিয়ে নিল গার্ড। ওকে পকেটে হাত ঢোকাতে দেখেও বাধা দিল না।

আলখেল্লার ভিতর বেল্টে আটকানো খাপে রয়েছে ছুরিটা, হাতলের স্পর্শ নিল রানা। বিপদ যদি একান্তই এড়ানো না যায়, যা কিছু করবার নিঃশব্দে করতে হবে; গুলি করলে সিকিউরিটি গার্ডদের ডাকা হবে, সে ঝুঁকি নেবে না ও।

পকেট থেকে তসবি বের করল, বিড়বিড় করে কিছু পড়ছে।

'কোথায়, কার কাছে ছিলেন? কীভাবে এলেন?' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল সে। 'মাফ করবেন, সার, আপনাকে আমি চিনতে পারছি না!'

'চিনবে কীভাবে, আগে দেখলে তো! মিস্টার তুং শানের মেহমান আমরা,' হাসিমুখে বলল রানা, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ধীর পায়ে হাঁটছে। সাবধানে পিছিয়ে যাচ্ছে গার্ড। 'আমরা কয়েকজন বন্ধু তাঁর সঙ্গেই আছি। আমার এক বন্ধু এই মুহূর্তে মিস্টার শানের সঙ্গে মিটিং করছেন।' আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছে ও। বারান্দার প্রথম দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভিতর থেকে গলার আওয়াজ ভেসে আসছে, তবে বুঝতে পারছে না কার গলা।

'কিন্তু আমি তো জানি আপনারা দুজন টাকলা মাকান ইনে গেছেন নাচ দেখতে,' বলল গার্ড; রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে রাখলেও, খাপে ভরা ছুরির হাতলে আঙুল বুলাচ্ছে সে, বেল্টের সঙ্গে আটকানো সেটা। 'আপনাদের মাত্র একজন মিস্টার তুং শানের সঙ্গে থাকছেন রাতে।'

হেসে উঠল রানা। 'তা-ই যদি হবে, আমি কি আকাশ থেকে পড়লাম? চাবি পেলাম কোথায়?'

অসহায় দেখাল গার্ডকে। 'সেটাই তো বুঝতে পারছি না! এত রাতে আপনি এখানে...কী মনে করে, সার?' জিজ্ঞেস করল গার্ড।

'টেলিফোনে ওঁরা আমাকে ডেকে পাঠালেন।'

'কী যেন নাম আপনার বন্ধুর?'

'শেখ ইবনে আসাদ।'

'না-না, যাঁর সঙ্গে আপনি টাকলা মাকান ইনে নাচ দেখতে গিয়েছিলেন?'

'তার নাম শেখ ফাহাদ ইবনে কাবিল,' বলল রানা, চোখে-মুখে অসন্তোষ। 'তুমি দেখছি মেহমানকে অপমান করছ! মিস্টার তুং শানের কাছে নিয়ে চলো আমাকে, তিনিই তোমাকে যা বলার বলবেন—'

'ওঁরা জরুরি কাজে ব্যস্ত, একান্ত বাধ্য না হলে এমনকী আমারও ওখানে ঢোকা বারণ,' বলল গার্ড। 'এবার আপনার নামটা বলুন, প্লিজ।'

'আমার নাম শেখ কালাম ইবনে উমর।'

'না-না, আপনার আসল নামটা বলুন।'

ওরে শালা, ভাবল রানা, তা-ও জানিস তুই! ফেঁসে গেছে বুঝতে পেরে যে-কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি হয়ে গেল ও। এতটুকু ইতস্তত না করে বলল, 'মাওলানা ইনসাফ আলি।'

একটানে খাপ থেকে ছুরিটা বের করে রানার পেট লক্ষ্য করে চালিয়ে দিল গার্ড। ফলাটা মাত্র মাঝপথে পৌঁছেছে, এই সময় একটা ঝাঁকি খেয়ে চোখ নামাল সে—নিজের বুকের বামদিকে গাঁথা অন্য একটা ছুরির হাতল দেখছে।

তৈরি ছিল রানা। যেই দেখল অস্ত্র বের করতে যাচ্ছে গার্ড, নিজের ছুরিটা ঘ্যাচ করে ঢুকিয়ে দিয়েছে তার বুকে।

হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছুরি বের করবার আগে মিনিটখানেক গার্ডের কাঁধটা বাম হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে রাখল রানা, তারপর দেহ থেকে প্রাণের কম্পন সম্পূর্ণ থেমে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল লাশটা কার্পেটের উপর। চাবির রিঙটা গার্ডের

বেল্ট থেকে খুলে নিল. নির্দিষ্ট একটা চাবি খুঁজে নিয়ে কী হোলে ঢুকিয়ে ঘোরাল। ভিতরে তাকাল কবাট সামান্য একটু ফাঁক করে।

ভিতরে হাজার রকম ইকুইপমেন্ট. কনসোল, কন্ট্রোল প্যানেল, মনিটর স্ক্রিন ইত্যাদি নিয়ে অত্যাধুনিক কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটি। জায়গাটা ইনডোর স্টেডিয়ামের মত বড়সড়। টেকনিশিয়ান আর বিজ্ঞানীরা সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত. মুখ তুলে তাকাবার পর্যন্ত সময় নেই কারও সন্দেহ নেই এখান থেকেই কুখ্যাত জলদস্যু তুং শান তার অপারেশন পরিচালনা করে।

ডজন ডজন কালার মনিটরে সাগরের সারফেস, সাগরের তলা, বিভিন্ন আকারের সচল সওদাগরী জাহাজ, যাত্রীবাহী স্টিমার, ট্রলার, বার্জ. সামুদ্রিক বন্দর ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। চারপাশের দুশ' মাইল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের কোথায় কী হচ্ছে সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে তুং শানের টেকনিশিয়ানরা।

কয়েকটা স্ক্রিনে স্যাটেলাইট থেকে তোলা আবহাওয়ার ছবি ফুটে উঠেছে—রানা দেখল. বঙ্গোপসাগরে একটা নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে। আরেকটা স্ক্রিনে দেখানো হয়েছে সাইক্লোনটার সম্ভাব্য ভ্রমণপথ।

দরজার কাছ থেকে ত্রিশ ফুট দূরে সত্তর ইঞ্চি একটা কালার মনিটর বসানো হয়েছে. সেটার সামনে তিনটে চেয়ারে বসে রয়েছে তুং শান. সুরাইয়া আর সালাউদ্দিন শাহ কুতুব। স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে ওয়েটসুট পরা একদল ডাইভার সাগরের নীচে কী যেন করছে।

তুং শানের সামনে একটা নিচু টেবিল. তাতে ভাঁজ খোলা একটা কাগজ। সেটার দিকে ঝুঁকে মাওলানা শাহ কুতুবকে কী যেন বোঝাচ্ছে সে।

দরজাটা সিকিভাগ খুলে ভিতরে ঢুকল রানা. নিঃশব্দে বন্ধ

করল, তারপর হেঁটে এসে দাঁড়াল তুং শানের পিছনে। একহাতে তার গলাটা পেঁচাল ও, অপর হাতে ধরা ছুরির ফলা ঠেকাল সরাসরি কণ্ঠনালীর উপর।

'কী হচ্ছে এখানে?' হিসহিস করে জানতে চাইল ও।

হেসে উঠল তুং শান। 'আরে, করেন কী! আপনি উপল ফারুক না? গলা ছাড়েন, মিস্টার উপল ফারুক! জুয়ায় জিতে আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

মাওলানা শাহ কুতুব সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত এদিক-ওদিক তাকিয়ে পালাবার পথ খুঁজছে।

আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে সুরাইয়া, যেন নড়ার শক্তিও নেই।

'আমার কথার জবাব দাও, কী হচ্ছে এখানে?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা, হাতের ভাঁজে আটকানো তুং শানের গলায় চাপ আর একটু বাড়াল।

'কই, কিচ্ছু না!' নিরীহ ভঙ্গিতে বলল তুং শান। 'আমরা তো সিনেমা দেখছি। বসুন, ইচ্ছে হলে আপনিও দেখতে পারেন।'

রানা দেখল আলখেল্লার ভিতর হাত গলিয়ে দিয়েছে শাহ কুতুব। ও কিছু বলবার আগে তুং শানই ধমকে উঠল, 'মাওলানা, কী করছেন! আপনি চান আমি খুন হয়ে যাই? ফেলে দিন ওটা! ফেলে দিন বলছি!'

কিছু একটা ছেড়ে দিল শাহ কুতুব, কার্পেটের উপর পড়ল সেটা। কিন্তু সেদিকে রানার খেয়াল নেই।

তুং শানের জুতোর দিকে চোখ গেল ওর। শাহ কুতুবকে ধমক দেওয়ার সময় নিচু টেবিলটার পায়ায় ওই জুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা মেরেছে সে। ওই পায়ায় একটা বোতাম রয়েছে। একই সঙ্গে চোখের কোণে দেখতে পেল টেবিলের উপর থেকে সবার অলক্ষে একটা কাগজ তুলে নিল সুরাইয়া।

ক্ষীণ হলেও শুনতে পাচ্ছে রানা, কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটির বাইরে অ্যালার্ম বাজছে।

বিদ্যুৎবেগে চিন্তা চলছে ওর মাথার ভিতর—ও একা, সুরাইয়াকে ধরলে দুজন; আটকা পড়েছে শত্রুর দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে—কোথাও কোনও জানালা নেই, দরজা ও এলিভেটরে তালা।

সশস্ত্র শত্রুরা সংখ্যায় কয়েক ডজনও হতে পারে।

পালাবার কোনও পথ বের করতে না পারলে মৃত্যু অনিবার্য।

তারপরেও চেষ্টা করে দেখতে হবে ওকে।

'খবরদার, কেউ নিজের জায়গা ছেড়ে নড়বে না!' গর্জে উঠল রানা, তারপর পিঠে কষে এক লাথি মেরে তুং শানকে ফেলে দিল মেঝেতে। একহাত দিয়ে সুরাইয়ার গলাটা পেঁচিয়ে ধরেছে ও। 'কেউ নড়লেই তুং শানের বাগদত্তা খুন হয়ে যাবে।' সুরাইয়ার কণ্ঠনালীর উপর ছুরির ডগা ঠেকিয়ে চাইল মেঝেতে শোয়া তুং শানের দিকে, 'নীচে নামার চাবি দাও!'

মাথা নাড়ল তুং শান। রানাকে এক পা এগোতে দেখে তাড়াতাড়ি বলল, 'ওগুলো সেফের ভেতর আটকানো। রাত দুটোর সময় আপনা আপনি খুলে যাবে কমবিনেশন লক। তার আগে হাজার চেষ্টা করেও কেউ খুলতে পারবে না সেফের তালা—আমিও না।'

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল রানা।

হাসছে জলদস্যু। মাথা নাড়ল দুঃখিত ভঙ্গিতে। 'ততক্ষণ পর্যন্ত নীচে নামার উপায় নেই আমাদের কারও।'

অর্থাৎ, কেবল উঠতে পারবে!

ভয়ে ফুঁপিয়ে উঠল সুরাইয়া, চেয়ার ছাড়ল, রানার টানে দরজার দিকে পিছু হটছে। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে রানা দরজার দিকে।

'সাবধান!' সবার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল তুং শান, নিজের গলায় হাত বুলাচ্ছে। 'সুরাইয়ার যেন কোনও ক্ষতি না হয়। শুধু লক্ষ রাখো লোকটা যেন এখান থেকে বেরুতে না পারে।'

দরজা খুলল রানা, সুরাইয়াকে জিম্মি করে বেরিয়ে এল বারান্দায়। চাবিটা ঘুরিয়ে বাঁকা অবস্থায় রেখে দিল কি-হোলে, যাতে ঘর থেকে কেউ বেরোতে না পারে—অন্তত ওই পথে। খাপে ভরে রাখল ছুরিটা, হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। গার্ডের লাশ টপকে সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল দুজন।

সাততলা থেকে নীচে নামবার সিঁড়ি একটা আছে বটে, কিন্তু শেষ ধাপের সামনে পড়বে ইস্পাতের দরজা, ওটার তালা খোলা সম্ভব নয়।

সম্ভব। চাবি থাকলে। যার কাছে আছে সে খুলছে। অ্যালার্ম শুনে নীচ থেকে উঠে আসছে সে। সিঁড়ির ধাপে পায়ের শব্দ। একজন নয়, অনেক লোকের।

রানা আর সুরাইয়া এখন শুধু উপরে উঠতে পারবে, সিঁড়ি বেয়ে কিংবা এলিভেটরে চড়ে। তাও মাত্র এগারোতলা পর্যন্ত, ছাদ পর্যন্ত নয়, কারণ ছাদে ওঠার সিঁড়িতেও ইস্পাতের ভারী দরজা আছে।

লুকানো যায় এমন কোনও জায়গা নেই। যেখানেই লুকাক না কেন, সার্চ করলেই ধরা পড়বে।

বেলিন্ডার পিস্তলটা সুরাইয়ার হাতে ধরিয়ে দিল রানা।

'থ্যাঙ্ক ইউ!' ধাপ বেয়ে উঠতে উঠতেই অভ্যস্ত হাতে ওটার মেকানিজম চেক করল সুরাইয়া। 'এটা রাখো,' বলে রানার হাতে ভাঁজ করা একটা কাগজ ধরিয়ে দিল ও। 'তোমার কাছেই নিরাপদে থাকবে।'

পকেটে রাখবার সময় জানতে চাইল রানা। 'কী?'

'মনিটরে আমরা দেখছিলাম নিখোঁজ ভারতীয় সাবমেরিনটা। অর্জুন। ওটা থেকে মিসাইল বের করে আনার অপারেশন চলছে। সাবমেরিনের কাছে পৌঁছাতে হলে তোমার পকেটের ওই নকশাটা লাগবে।'

সাত আর আটতলার মাঝখানের ল্যান্ডিঙে পৌঁছাতেই রানার কান খাড়া হয়ে উঠল। সেই দৈত্যটার গলা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে।

সিঁড়ি সংলগ্ন রেলিঙের দিকে সরে এসে সাবধানে উঁকি দিয়ে নীচে তাকাল ও। ছয়তলার দরজা খুলে সাততলায় উঠে এসেছে ওরা, পাঁচ-সাতজনের কম নয়, এই মুহূর্তে ছয় আর সাততলার মাঝখানের ল্যান্ডিঙে থেমে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র রয়েছে—হয় পিস্তল নয়তো সাব-মেশিনগান। একটা জিনিস সবার কাছেই আছে—টর্চ।

টর্চ কেন?

দৈত্য কুয়ামিন চুয়ান এইমাত্র কারও সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলল। তারপর গলা চড়িয়ে চিনা ভাষায় জিজ্ঞেস করল, 'পিয়াও, সানি, থোয়াং, মুয়ে, ইয়েনি...কী আশ্চর্য, কোথায় তারা? তাণ্ডব সিংকেও তো দেখছি না!'

'এই তো আমি!' ভিড়ের মধ্যে থেকে বলল তাণ্ডব সিং।

'দশজন করে দুটো টিম দরকার আমার,' বলল হোটেল আন্দামানের সিকিউরিটি ইনচার্জ চুয়ান। 'প্রতিটি ফ্লোরের প্রতিটি কামরা সার্চ করতে হবে। দু'বার করে, যাতে কিছুই চোখ এড়িয়ে না যায়। তুমি একটা টিমের নেতৃত্বে থাকো, তাণ্ডব সিং।'

'যাদের ঘুম ভাঙানো হয়েছে তাদেরই একটু দেরি হচ্ছে আসতে,' বলল তাণ্ডব সিং।

'ঘুমাচ্ছিল, না মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করছিল?' কর্কশ কণ্ঠে বলল চুয়ান।

'ও-সব এখন থাক, বস্। ঠিক আছে, আপনি যান, দশজনকে নিয়ে কাজ শুরু করুন। আমি দ্বিতীয় টিম নিয়ে একটু পরে আসছি।'

সঙ্গীদের মাথা গুণল চুয়ান। 'সাতজন।'

'ওই তো, আরও কয়েকজন উঠে আসছে।'

সুরাইয়ার হাত ধরে আবার ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' আটতলায় উঠে এসে জিজ্ঞেস করল সুরাইয়া, উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। 'ছাদে উঠতে হলে দরজা খুলতে হবে। আমার কাছে চাবি নেই।'

'আমার কাছে আছে একটা, তবে সেটা অন্য তালার,' বলল রানা। 'চলো, আগে এগারোতলায় উঠি।'

'থামো সবাই!' নীচ থেকে দৈত্য চুয়ানের বেসুরো গলা ভেসে এল। 'কী করতে হবে ভাল করে শুনে নাও।'

আটতলার রেলিং থেকে উঁকি দিয়ে আবার নীচে তাকাল রানা। ঠিক এই সময় সবগুলো সিঁড়ি আর বারান্দার আলো নিভে গেল।

টর্চের আলো আর কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল চুয়ানের নেতৃত্বে সাততলায় উঠে এসেছে প্রথম সার্চ পার্টি।

'প্রতিটি ফ্লোরের সামনে ও পিছনে সার্চ করব আমরা,' বলে যাচ্ছে চুয়ান। 'এখানে আমরা দশজন আছি, দুই প্রান্ত থেকে সার্চ শুরু করব, পাঁচজনের দুটো গ্রুপ পরস্পরের দিকে এগোব।'

'ওদের কথা শুনে লাভ কী, চলো ওপরে উঠি,' তাগাদা দিল সুরাইয়া।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' আওয়াজ করতে নিষেধ করল রানা।

'মিস্টার তুং শানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে,' বলে চলেছে চুয়ান। 'বস্‌ আমাকে কী নির্দেশ দিয়েছেন শোনো। লোকটাকে কোণঠাসা করতে হবে। প্রয়োজনে আটচল্লিশ ঘণ্টা, বাহাত্তর ঘণ্টা ওদেরকে ঘিরে রাখব আমরা।'

আর কোথাও না থেমে এক ছুটে এগারোতলায় উঠে এল রানা ও সুরাইয়া। ইতিমধ্যে পালাবার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছে ওরা, কারণ জানে তা সম্ভব নয়। একমাত্র বিকল্প

গোলাগুলি। শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করতে হবে ওদেরকে।

দুটো পিস্তল আর একটা ছুরি সম্বল।

জানা কথা এরকম অসম যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত দুজনেই মারা যাবে ওরা। অথচ তুং শান, এমনকী জঙ্গিদের লিডার সালাউদ্দিন শাহ কুতুবকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে না। তারা তো কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটি থেকে বাইরেই বেরোয়নি।

এখনও দম ফিরে পায়নি, পেন্সিল টর্চের আলোয় চারদিকটা দেখে ভাল একটা ডিফেনসিভ পজিশন খুঁজছে রানা।

এক প্রস্থ বারান্দার মাঝামাঝি জায়গার দরজাটা পছন্দ হলো ওর, দু'দিকের সিঁড়ি ও করিডর থেকে সমান দূরত্বে।

গার্ডরা যদি দু'দলে ভাগ হয়ে উপরে ওঠে, এই দোরগোড়া থেকে তাদেরকে অন্তত কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে। নরম সুরে কথা বলে দেখা যেতে পারে দু'এক মিনিট আয়ু বাড়ে কি না। নিজের পরিচয় জানাবে, বলবে, তুং শানকে গিয়ে বলো আমি বিসিআই-এর এজেন্ট মাসুদ রানা।

মাসুদ রানা টপ সিক্রেট ইনফরমেশনের ডিপো, তুং শানের মত ক্রিমিনাল এটা নিশ্চয় বুঝবে। ওর কাছ থেকে পাওয়া সে-সব ইনফরমেশন চড়া দামে বিক্রি করে ভাল পয়সা কামাবার কথা ভাবলেও ভাবতে পারে সে। তাতে ওর কপালে আরও কিছু সময় জুটে যেতেও পারে।

নীচ থেকে উঁচু গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। কান পাতল রানা। আটতলায় সার্চ শেষ করেছে তারা। দু'দলে ভাগ হয়ে নয়তলায় উঠছে।

মাথায় একটা চিন্তা আসতে নিজেকে তিরস্কার করল রানা। ধ্যাত, কী হয়েছে ওর! কথাটা আরও আগে ভাবা উচিত ছিল। পেন্সিল টর্চটা আবার জ্বেলে বারান্দার সিলিঙে তাক করল। গোটা বিল্ডিংকে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে ভাল কথা, কিন্তু

তাই বলে কোনও ভেন্টিলেশন ডাক্ট থাকবে না, তা কি হয়?

উপরে তাকাতেই নেচে উঠল মনটা, যদিও কোনও ধারণা নেই কী দেখছে ওটা। উঁচু সিলিঙের গায়ে কালো একটা গর্ত, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে চারফুট হবে। মুখ খোলা চোরাকুঠরি?

অন্ধকারে সুরাইয়ার গলা শোনা গেল, 'ট্র্যাপডোর মনে হচ্ছে!'

কিন্তু, রানা ভাবল, মাথা থেকে চার ফুট উপরে ওটা, নাগাল পাব কীভাবে! 'চাবি আছে? একটা টুল কিংবা চেয়ার দরকার।'

'না,' বলল সুরাইয়া। 'হাতব্যাগটা ফেলে এসেছি।'

সরু ইস্পাতের কাঠিটা দিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খোলার চেষ্টা করল রানা। তুং শান অত্যন্ত সতর্ক লোক, একটা তালাও বাজার থেকে কেনেনি, নিজের ডিজাইন অনুসারে সব অর্ডার দিয়ে বানিয়েছে—সেজন্যই খুলতে পারছে না ও।

পিস্তলটা হোলস্টারে গুঁজে রেখে কার্পেটের উপর হাঁটু গাড়ল রানা, বলল, 'কাঁধে পা দিয়ে উঠে পড়ো গর্তের ভেতর।'

রানার চওড়া কাঁধে ঘাড়ের দু'পাশে দু'পা দিয়ে বসল সুরাইয়া। ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা। ওর কাঁধের উপর সুরাইয়াও সিধে হয়ে দাঁড়াল, তার মাথাটা সরাসরি ঢুকে গেল চৌকো গর্তের ভিতর।

ট্র্যাপডোরের কিনারায় কনুই ঠেকিয়ে উপর দিকে লাফ দিল সুরাইয়া। উপরে ওঠার পর অন্ধকারে ঘুরে বসল ও, হাত দুটো নামিয়ে দিল নীচে। 'আমার হাত ধরো। ওয়ান-টু-থ্রি বলেই লাফ দেবে, আমিও টান দেব।'

নীচ থেকে আবার গার্ডদের আওয়াজ ভেসে এল। দশতলায় উঠছে তারা। নাকি এগারোতলায়?

কিন্তু এখন আর দেখবার সময় নেই। শুরু করল রানা। 'ওয়ান-টু-থ্রি!'

লাফ দিয়ে চোরাকুঠরিতে উঠে পড়ল রানা।

পেন্সিল টর্চ জ্বালল। ছোট একটা কামরায় রয়েছে ওরা, দরজা-জানালা নেই, তার বদলে অনেকগুলো ভেন্টিডাক্ট রয়েছে। এগুলো আসলে প্লাস্টিকের তৈরি মোটা পাইপ, বসানো হয়েছে এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম ফেইল করলে বাতাস পাওয়ার জন্য। প্রতিটি ভেন্টিডাক্ট এত মোটা, অনায়াসে ভিতরে ঢুকে হামাগুড়ি দেওয়া যাবে। সবচেয়ে মোটা ভেন্টিডাক্টটা পছন্দ করল সুরাইয়া।

ক্রল করে রওনা হলো ওরা। তার আগে ট্র্যাপডোরের ঢাকনিটা বন্ধ করতে ভোলেনি রানা। ওর ধারণা ভেন্টিডাক্টটা আড়াআড়িভাবে বিল্ডিংটার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌঁছেছে। সত্যি কিনা বুঝতে একটু সময় লাগবে।

একটানা তিন মিনিট হামাগুড়ি দেওয়ার পর হঠাৎ স্থির হয়ে গেল রানা। বুঝতে পেরে ওর পিছনে সুরাইয়াও।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' আওয়াজ করল রানা, কারণ গার্ডদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। ওদের নীচে কাছাকাছি কোথাও রয়েছে তাদের একটা গ্রুপ, সম্ভবত কোনও কামরার ভিতর, তাই অস্পষ্ট শোনাচ্ছে কথাগুলো।

ওদের সামনে নিশ্চয়ই আরেকটা খোলা ট্র্যাপডোর আছে।

একটু পর সুরাইয়াও পেল আওয়াজটা। কামরা থেকে করিডরে বেরিয়ে আসছে লোকগুলো। এগারতলার এই অংশটা সার্চ করা হয়ে গেছে তাদের। এখন মূল সিঁড়ির কাছে দ্বিতীয় গ্রুপের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে।

গার্ডদের পায়ের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত নড়ল না রানা। তারপর পেন্সিল টর্চ না জ্বেলে এগোল। মাত্র তিন হাত এগোতেই ভেন্টিডাক্ট থেকে আরেকটা ছোট্ট কুঠরিতে বেরিয়ে এল ওরা। ট্র্যাপডোরটা সত্যি খোলা দেখল। অত্যন্ত সাবধানে, যাতে এতটুকু শব্দ না হয়, ঢাকনিটা বন্ধ করে দিল রানা।

আর মাত্র দু'মিনিট ক্রল করল, তারপর ভেন্টিডাক্ট থেকে চৌকো একটা ঘরে ঢুকল ওরা।

পেন্সিল টর্চের আলোয় ডাক্টের পাশেই একটা দরজা দেখল রানা। হাতল ঘুরিয়ে পরীক্ষা করল, তালা মারা। দরজার কী হোল বলে দিচ্ছে সাধারণ কোনও চাবি দিয়ে তালাটা খোলা যাবে না।

যে ডাক্ট দিয়ে ঘরে ঢুকেছে সেটার সরাসরি সামনের দেয়ালে বিরাট একটা ফ্যান রয়েছে, দেখেই বুঝতে পারছে রানা অন করা থাকলে খুব জোরে বাতাস বয়। দু'দিকের দেয়ালেও ছোট দুটো ফ্যান আছে, সেগুলো ঘরের ভিতর তৈরি হওয়া বাতাস ভেন্টিডাক্টে সাপ্লাই দেয়, যাতে গোটা বিল্ডিঙে ছড়িয়ে পড়ে হাওয়া।

রানার ধারণা বিল্ডিংটার কিনারায় পৌঁছে গেছে ওরা। ইস্পাতের ফ্রেম থেকে বড় ফ্যানটা খুলে ফেলতে পারলে যে ফাঁকটা পুরোপুরি উন্মুক্ত হবে সেটাই হয়তো ওদের সম্ভাব্য পালাবার পথ।

ছোট একটা ছুরির ডগা দিয়ে প্যাঁচ ঘুরিয়ে স্ক্রু খুলছে রানা। চার কি পাঁচটা স্ক্রু খোলা হয়েছে, ছুরির ডগা মুট করে ভেঙে গেল।

'এটা দিয়ে চেষ্টা করো,' বলে রানার হাতে চুলের একটা কাঁটা ধরিয়ে দিল সুরাইয়া, যেন ছুরির ডগাটা ভাঙার অপেক্ষায় ছিল ও।

সবগুলো স্ক্রু খোলার পর দুজন ধরাধরি করে ফ্যানটা নামিয়ে একপাশের দেয়ালে খাড়া করে রাখল ওরা।

'এরপর?' ওর পিছন থেকে ফিস্ ফিস করল সুরাইয়া। 'লাফ দিয়ে নীচে পড়তে হবে?'

'আগে দেখতে দাও কোথায় পৌঁছালাম।' ফ্যান সরানো হয়েছে, কাজেই এবার বাইরে মাথা বের করে দিয়ে নীচে

তাকাতে অসুবিধে নেই।

জোরালো বাতাস ঝাপটা মারল মুখে। নিম্নচাপের কথা মনে পড়ে গেল ওর। একটা ঝড় মনে হয় সত্যি আসছে!

বিল্ডিঙের পিছনদিকে চলে এসেছে ওরা। নীচটা পরিষ্কার নয়, কেউ টহল দিচ্ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। স্পটলাইট আর রেইডার অ্যান্টেনা ফিট করা ভ্যানটাকেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

মাথাটা টেনে নিয়ে আলখেল্লার ভিতর থেকে দুই প্রস্থ নাইলন রশি বের করল রানা, প্রতিটির সঙ্গে একটা করে হুক ও একজোড়া গ্লাভ রয়েছে। টর্চের আলোয় কর্ড দুটো জোড়া লাগাচ্ছে, সুরাইয়া বলল, 'তার মানে তুমি জানতে এভাবে পালাতে হতে পারে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'জানব কীভাবে! তবে খাঁচার ভেতরে ঢুকে বাঘের গায়ে হাত দিতে যাচ্ছি, সম্ভাবনাটা মাথায় জাগবে না?'

মসৃণ দেয়াল, এগারোতলা থেকে সোজা নীচে নেমে গেছে। আলো এত কম যে বলা মুশকিল নীচে ওটা মাটি, বালি, নাকি সিমেন্ট। তবে দুই প্রস্থ রশি জোড়া লাগানোয় লম্বায় ওটা একশ' পঁচিশ ফুট হয়েছে, নীচে যা-ই থাকুক, তার নাগাল না পাওয়ার কোনও কারণ নেই।

হুকটা লোহার ফ্রেমে আটকাল রানা, টেনে-টুনে দেখল খুলে আসবার কোনও ভয় আছে কি না, তারপর রশিটা নীচে ফেলার প্রস্তুতি নিল।

ঠিক তখনই দালানটার কোণ ঘুরে রেইডার-ভ্যানটাকে কচ্ছপের মত অলসগতিতে এগোতে দেখল রানা। ফাঁকটার কিনারায় স্থির হয়ে গেল ও। 'শ্‌শ্‌!' চাপা গলায় সাবধান করল সুরাইয়াকে, যেন কোনও শব্দ না করে। অত্যন্ত ধীরগতিতে এগোচ্ছে ভ্যান। আরেকটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হতে দু'মিনিট সময় নিল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে সবটুকু রশি নীচে ফেলে দিল রানা। সাপের মত এঁকেবেঁকে নেমে গেল ওটা। 'লেডি'য ফার্স্ট,' বলল ও।

গ্লাভ পরে তৈরি হয়েই ছিল সুরাইয়া। ভয়-ডর নেই, দস্যি মেয়ে, স্রেফ রশি ধরে ঝুলে পড়ল, পা দিয়ে পতনের গতি নিয়ন্ত্রণ করছে। পিস্তলটা গুঁজে নিয়েছে ব্লাউজের ভিতর।

আড়াই মিনিট পর হাতে ধরা রশিতে একটা ঝাঁকি অনুভব করল রানা; সিগনাল দিচ্ছে সুরাইয়া, নিরাপদে নামতে পেরেছে।

সামান্য একটু নামতে না নামতে বাতাসের ধাক্কায় দম বন্ধ হয়ে এল রানার। শুধু তাই নয়, ঠেলে ওকে বিল্ডিঙের একটা কোণের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তবে কোনও অঘটন ঘটল না, দু'মিনিট পর নিরাপদেই পা পড়ল মাটিতে। কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সুরাইয়া। সন্দেহ নেই, ক্যাসিনো আন্দামানের পিছনদিকই এটা। তবে জঙ্গলটা শুরু হয়েছে আরও খানিক দূর থেকে।

জঙ্গল থেকে সৈকতে বেরিয়ে এসে শুধু লঞ্চ আর বোট নয়, পরিত্যক্ত জেটিতে বাঁধা ওগুলোর সঙ্গে শাহিন সিরাজকেও দেখতে পেল রানা। এক হাতে ঝুলছে একটা অটোমেটিক রাইফেল, চোখে সাঁটা একজোড়া নাইটগ্লাস। বাকি সব অপারেটর আশপাশেই গা ঢাকা দিয়ে আছে।

ওদেরকে দেখে একগাল হাসল সিরাজ। 'মাসুদ ভাই, আমার মন বলছিল আজই কিছু একটা হবে—'

ষোলো

'নমস্কার, কে বলছেন, প্লিজ়?' সুদূর নয়াদিল্লি থেকে ভেসে এল ঘুম জড়ানো কণ্ঠস্বর; ভাষাটা বাংলা, তাতে কোলকাতার বাচনভঙ্গি স্পষ্ট।

'হ্যালো, মিস্টার দাশগুপ্ত, আমি মাসুদ রানা—'

'কী? নামটা আরেকবার বলবেন, প্লিজ!'

'আপনি ভুল শোনেননি, মিস্টার দাশগুপ্ত—এমআরনাইন। এরকম অসময়ে আপনার ঘুম ভাঙানোর জন্যে সত্যি দুঃখিত,' বলল রানা। 'খুব জরুরি একটা ব্যাপারে—'

সিতওয়ে, হোটেল আরাকান ইন্টারন্যাশনাল থেকে রিং করছে রানা। রাত তিনটে।

একটা স্যুইট আগেই রিজার্ভ করে রেখেছিল শাহিন সিরাজ, সুরাইয়াকে নিয়ে এখানেই উঠেছে রানা। মেয়েটাকে বেডরুমে ঘুমাতে পাঠিয়ে দিয়ে সিটিং রুমে বসে দু'জায়গায় দুটো ফোন করছে ও।

প্রথম ফোনটা করেছে রানা এজেন্সির সেফ হাউসে। ঘুম ভাঙিয়ে বেলিন্ডাকে জিজ্ঞেস করেছে ওর কোনও অসুবিধে আছে কি না।

বেলিন্ডা জানাল, না, ওর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। বরং একটা সুখবর আছে—মাঝরাতে ওর স্বামী কার্লো মোবাইল ফোনে সেফ হাউসের ঠিকানা পেয়ে চলে এসেছে ওর কাছে।

'ভেরি গুড,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

দ্বিতীয় ফোনটা করছে নয়াদিল্লিতে, বন্ধুবর অনিল চ্যাটার্জির ইমিডিয়েট বস্, ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ বরেন্দ্র দাশগুপ্তকে।

'তার মানে বিসিআই?' বি. দাশগুপ্তের গলায় বিস্ময় মেশানো সতর্কতা। 'মাসুদ রানা? কী সৌভাগ্য আমার—'

ভদ্রলোককে থামিয়ে দিয়ে সরাসরি কাজের কথা পাড়ল রানা। বলল, 'মায়ানমারের সিতওয়েতে রয়েছি আমি। জানতে চাইছি, বঙ্গোপসাগরের এদিকটায় কিছু কি হারিয়েছে আপনাদের? আটটা?'

'কী হারিয়েছে?' বি. দাশগুপ্ত হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে উঠলেন।

'আরে, মশাই,' বলল রানা। 'দয়া করে ঝেড়ে কাশুন, তা না হলে আলাপ এগোবে কীভাবে!'

'হ্যাঁ, তাই তো,' অবশেষে বললেন বি. দাশগুপ্ত। 'নিউক্লিয়ার ওঅরহেডসহ আটটা দূরপাল্লার মিসাইল খোয়া গেছে। কেন বলুন তো?'

'আমি একটা নকশা পেয়েছি,' বলল রানা। 'সম্ভাবনা আছে সেটা ধরে সাগরে ডুব দিলে ওগুলোর কাছে পৌঁছানো যাবে।'

'হোয়াট! কী বললেন?' যেন বোমা ফাটালেন আইএসএস-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। তারপর রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলেন, 'নকশাটা কোথায়?'

'আমার কাছে,' বলল রানা। 'একজন ডাইভারকে নিয়ে আমি ডাইভ দিতে যাচ্ছি। কিন্তু সমস্যা হলো, ধারণা করছি ওখানে সশস্ত্র প্রতিপক্ষ থাকবে। আপনাদের নৌ-বাহিনী অকুস্থলের কাছাকাছি আছে বলে শুনেছি, তাই জানতে চাইছি ওরা কি আমাদেরকে প্রোটেকশন দিতে পারবে?'

এক মুহূর্ত পর জবাব দিলেন বি. দাশগুপ্ত। 'আপনার নম্বরে

দশ মিনিটের মধ্যে রিং করছি,' বলে যোগাযোগ কেটে দিলেন ভদ্রলোক, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে দেরি করছেন না।

এবং ঠিক দশ মিনিটের মাথায় তাঁর রিং পেল রানা। 'হ্যাঁ, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে,' জানালেন তিনি। 'ইন্ডিয়ান নেভির একদল কমান্ডো আপনাদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখবে। আপনি ডিটেইল্স্ লোকেশন জানান, প্লিজ।'

ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে মায়ানমার উপকূলের দিকে ভয়ঙ্কর একটা সাইক্লোন ধেয়ে আসছে। সকাল সাতটার কিছু পর ফিশিং ট্রলারটা নিয়ে উত্তাল সাগর পাড়ি দিচ্ছে রানা ও সিরাজ। গন্তব্য ক্যাকটাস দ্বীপ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে সদ্য নোঙর ফেলা ইন্ডিয়ান নেভির একটা ফ্রিগেট।

রওনা হওয়ার আগে সুরাইয়ার ঘুম না ভাঙিয়ে একটা চিরকুট লিখে রেখে এসেছে রানা, তাতে ধারণা দেওয়া হয়েছে কোথায় যাচ্ছে ওরা, কতক্ষণের মধ্যে ফিরতে পারবে ইত্যাদি।

মাস্ক, অক্সিজেন-বটলসহ ওয়েটসুট, স্পিয়ার গান ইত্যাদি ইকুইপমেন্ট আগেই সংগ্রহ করে রেখেছিল সিরাজ। দূর থেকে ফ্রিগেটটা দেখতে পেয়ে ওগুলো পরে তৈরি হয়ে থাকল ওরা।

আরও কাছাকাছি হতে দেখা গেল ফ্রিগেটটাকে ঘিরে ইন্ডিয়ান নেভির দুটো গানবোট টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

ফ্রিগেটের পাশে ভিড়ল ট্রলার। একদল ফ্রগম্যান অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। বিশজনের একটা দল, প্রত্যেকের সঙ্গে স্পিয়ার গান রয়েছে; আরও আছে গাইগার কাউন্টার সহ নানান রকম ইকুইপমেন্ট।

কোড বিনিময়ের পর ফ্রিগেট কমান্ডার ক্যাপটেন যশোরাম ত্রিপাঠি-র সঙ্গে পরিচিত হলো রানা। স্মার্ট ক্যাপটেন সময় নষ্ট না করে ফ্রগম্যানদের সঙ্গে রানা ও সিরাজের পরিচয় করিয়ে

দিলেন, প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসাবে জানালেন, আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছে মাসুদ রানার নেতৃত্বে এটা স্রেফ একটা সার্চ পার্টি। সাবমেরিন, কিংবা মিসাইল পাওয়া গেলে তখন শুরু হবে রেসকিউ মিশন।

সাগরে ডুব দিল ডাইভাররা।

মানসিকভাবে সবাই তৈরি, কঠিন প্রতিরোধের মুখে পড়তে হবে ওদেরকে। যুক্তি দিয়ে রানা ওদেরকে বুঝিয়েছে, যে-জিনিস বিক্রি করে কয়েক হাজার কোটি টাকা রোজগার করতে যাচ্ছে তুং শান, তা সে সহজে হাতছাড়া করতে চাইবে না। সাবমেরিনের চারপাশে নিশ্চয় বিরাট একটা বাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছে তাইওয়ানিজ জলদস্যু, ওদেরকে দেখামাত্র হামলা শুরু করবে।

কিন্তু কোথায় কী!

নকশা অনুসারে মাসুদ রানার নেতৃত্বে জায়গামতই পৌঁছাল ডাইভাররা। এখন পর্যন্ত প্রতিপক্ষ কারও ছায়া পর্যন্ত চোখে পড়েনি। সাগর এখানে মাত্র পঞ্চাশ ফুট গভীর, তবে সব জায়গায় নয়; কোথাও কোথাও গভীরতা সত্তর-পঁচাত্তর ফুট। জায়গাটায় প্রবাল-এর মেলা বসেছে যেন। কোথাও ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে গাছ তৈরি হয়েছে হাজারে হাজারে, কোথাও লাখ লাখ বিচিত্র আকৃতির বহুরঙা ঝোপ, এরকম মাইলের পর মাইল।

তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হলো, কিন্তু এ-সবের মাঝখানে কোথাও ইন্ডিয়ান নেভির সাবমেরিন অর্জুন নেই। এটা যে শুধু চোখের দেখা, তা নয়; গাইগার কাউন্টারে কোনও রেডিয়েশন ধরা পড়ছে না, সেনসরসহ অন্যান্য ডিটেকশন মেশিনও রিপোর্ট করবার মত কিছু পাচ্ছে না।

লজ্জায় মাথা হেঁট হওয়ার অবস্থা হলো রানার। প্রায় এক ঘণ্টা সার্চ করে কিছুই যখন পাওয়া গেল না, হাল ছেড়ে দিয়ে সারফেসে উঠে এল ওরা।

দুপুর বারোটায় ক্লান্ত শরীর নিয়ে হোটেলে ফিরে সুরাইয়ার একটা চিরকুট পেল রানা—

'হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে নির্দেশ পেয়েছি, রানা এজেন্সির শাখা অফিস থেকে একজন বডিগার্ড নিয়ে আজই আমাকে আমার ফ্যাশন হাউস হটস্পটে ফিরে যেতে হবে। বিদায় না নিয়ে এভাবে চলে যেতে হওয়ায় খারাপ লাগছে। তোমার প্রতি ঋণী ও কৃতজ্ঞ হয়ে থাকলাম আমি। যদি কখনও সুযোগ পাই চেষ্টা করব অন্তত ঋণটুকু যাতে শোধ করতে পারি।

ফিরেই বস্‌কে ফোন করো, ওঁর ধারণা ওখানে কিছু পাবে না তোমরা।'

শেষ লাইনটা পড়ে চিন্তায় পড়ে গেল রানা। তারপর ধারণা করল, বস্ নিশ্চয়ই জরুরি কোনও ইনফরমেশন দেবেন ওকে। মোবাইল ফোন বের করে মেজর জেনারেল রাহাত খানের নম্বরে ডায়াল করল ও।

'হ্যালো?' পরিচিত ভরাট কণ্ঠস্বর ওর সারা শরীরে একটা শিহরণ জাগিয়ে তুলল।

'আমি রানা, সার,' সংক্ষেপে বলল ও। 'ওখানে সত্যি কিছু পাওয়া গেল না।'

'পাওয়া যে যাবে না সেটা ঘণ্টাদেড়েক আগে জানতে পেরেছি আমরা,' ঢাকা থেকে বললেন বিসিআই চিফ।

রানার বিস্ময় বাধ মানছে না। 'কীভাবে, সার?'

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন রাহাত খান।

আরাকানে জড়ো হওয়া বাংলাদেশী জঙ্গিদের মধ্যে বিসিআই-এর ইনফরমার ঢুকে পড়েছে। তাদের একজন ডিটেইলড্ রিপোর্ট পাঠিয়েছে আজ। ওই রিপোর্টের এক জায়গায় আছে, সাবমেরিন অর্জুনকে চিহ্নিত করতে পারে, এমন নকশা মাত্র একটাই তৈরি করা হয়েছে, এবং সেটা আছে তুং

শানের কাছে। আর সব ভুয়া।

ব্যাখ্যা শেষ করে বিসিআই চিফ বললেন, 'সে যাক, ওই রিপোর্টে অবিশ্বাস্য কিছু নিউজ আছে। সেগুলো জানাবার জন্যেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছিলাম।'

'জী, সার।' উৎকর্ণ হলো রানা।

এরপর বস্ যা বললেন—তা হুবহু মিলে গেল মরহুম ইমরান খানের বিবরণের সঙ্গে। বাড়তি কিছু জানা যেতে পারে মনে করে চুপচাপ শুনে গেল রানা।

সাত সাতটা পারমাণবিক বোমা!—ভাবছে রানা। যদি জায়গামত ফেলতে পারে, ধরে নেওয়া যায়, পৃথিবীর মানচিত্র সম্পূর্ণ বদলে যাবে।

এতদিন পর সাগরের লোনা পানি থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে বোমাসহ মিসাইলগুলো, যদি ঠিকমত কাজ না করে? যদি টার্গেটে না পৌঁছায় মিসাইল, না ফাটে বোমা? এরকম সংশয় প্রকাশ করা হয় জঙ্গিদের তরফ থেকে।

অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তুং শানের কাছে ডেমনস্ট্রেশন চেয়েছে তারা। একটা মিসাইল ছুঁড়ে ও বোমা ফাটিয়ে দেখাতে হবে ওগুলো সত্যি কাজ করে কি না, তারপর পুরো পেমেন্ট।

তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছে তুং শান। সে বলেছে—ঠিক আছে, বলো তো একটা মিসাইল ছুঁড়ে চট্টগ্রামকে উড়িয়ে দিই!

শুনে আঁৎকে উঠেছে জঙ্গিরা। 'সেটা আত্মঘাতী কাজ হয়ে যাবে। গোটা চট্টগ্রামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে আমাদের সংগঠনের লোকজন, তাদেরকে আমরা খুন করতে পারি না।'

তুং শান তখন বলেছে—তা হলে বরং সেইন্ট মার্টিন দ্বীপটাই উড়িয়ে দিই। শুনতে পাচ্ছি আমেরিকা নাকি ওখানে ঘাঁটি বানাবে। এক ঢিলে দুই পাখি মারি—বেশি লোকও মারা পড়ল না, আবার আমেরিকাকেও আসতে বাধা দেয়া হলো।

তুং শানের এই প্রস্তাবটা পছন্দ হয়েছে জঙ্গিদের।

ভালই হবে, টেস্ট করার সঙ্গে সঙ্গে সতর্কীকরণের কাজটাও হয়ে যাবে। মিডিয়ার মাধ্যমে ওয়ার্নিং দিয়ে বলা হবে, বর্তমান সরকারকে হটিয়ে অবিলম্বে সত্যিকার ইসলামি আদর্শে অনুপ্রাণিত ধর্মভিত্তিক দলগুলোর হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে। সবাইকে সমস্ত পাপের জন্য তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসতে হবে, তা না হলে আল্লাহর গজব নেমে আসবে, খুন হবে কোটি কোটি মানুষ।

আরাকান বনভূমির ভিতর ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল ছোঁড়ার উপযোগী লঞ্চিং স্টেশন অ্যাসেম্বল করা হচ্ছে, জঙ্গিদের তরফ থেকে কাজটা তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সাবেক এয়ার ভাইস মার্শাল থাকিন মাউং আর নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট থান বানডুলার উপর। ওই লঞ্চিং স্টেশন থেকে দুনিয়ার সাত জায়গায় ফেলা হবে পারমাণবিক বোমা।

ক্যাসিনোর পিছনে কোথাও, কিংবা বোন-ইয়ার্ডে আরেকটা লঞ্চিং স্টেশন তৈরি করা হয়েছে বা হচ্ছে। সেখান থেকে মাত্র একটা মিসাইল ছোঁড়া হবে, সেন্ট মার্টিন দ্বীপটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য।

জঙ্গিরা অবশ্য বলছে, মায়ানমার সরকার টের পেয়ে গেলে আরাকান থেকে লঞ্চিং স্টেশন ফেলে পালিয়ে যেতে হতে পারে তাদেরকে। তখন একটা ব্যাকআপ হিসাবে কাজ করবে তুং শানের তৈরি ওই লঞ্চিং স্টেশন।

ধারণা করা হচ্ছে মৌলবাদী জঙ্গিদের সাত সংগঠনের সাতটা মাথা প্রথম মিসাইল লঞ্চিং দেখে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ক্যাকটাস দ্বীপে আসতে পারে। স্বভাবতই তুং শানের আতিথ্য গ্রহণ করবে তারা।

আরাকান থেকে পাওয়া রিপোর্ট সম্পর্কে মাসুদ রানাকে পরিষ্কার একটা ধারণা দিয়ে বিসিআই চিফ রাহাত খান সবশেষে জানতে চাইলেন, 'এবার বলো, কী সিদ্ধান্ত নিলে।'

একটা ঢোক গিলল রানা। 'ওখানে আবার আমাকে যেতে হবে, সার,' বলল ও, জানে ওর অসমাপ্ত কাজ ওকেই শেষ করতে হবে।

'কিন্তু সাবধানে, রানা। তুং শান এখন আহত জানোয়ার।'

'জী, ধন্যবাদ, সার,' বলল রানা।

তারপর হঠাৎ জানতে চাইলেন বস্, 'আচ্ছা, ও কি তোমার পরিচয় জানে?'

'না, সার। তুং শান জানে না আমি বিসিআই এজেন্ট। তবে আমি যে উপল ফারুকের ছদ্ম-পরিচয় নিয়ে আছি, এটা ও জেনে গেছে। রাখছি, সার।' রিসিভার নামিয়ে রাখতে গেল রানা।

'ওয়েট,' হঠাৎ ওকে সতর্ক করে দেওয়ার সুরে বললেন বিসিআই চিফ। 'একটা মেসেজ আসছে—'

এক এক করে তিন মিনিট পার হতে চলেছে, অপরপ্রান্ত থেকে বসের কোনও সাড়া-শব্দ পাচ্ছে না রানা। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে ও, ভাবছে—কী মেসেজ, কোত্থেকে এল, ওর এই অ্যাসাইনমেন্টের সঙ্গে আদৌ কোনও সম্পর্ক আছে কি না।

'দিস ইজ ভেরি স্যাড, রানা,' অবশেষে নীরবতা ভেঙে ভারি গলায় বললেন বিসিআই চিফ। 'প্রোম রেলস্টেশন থেকে, ঠিক গোল্ডেন এক্সপ্রেস ছাড়ার মুহূর্তে, সুরাইয়া জেবিনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

আঁৎকে উঠল রানা।

'কে বা কারা করল কাজটা, পুলিশ কিছু বলতে পারছে না।'

'মেসেজটা কে পাঠাল, সার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রফিক, তোমার এজেন্সির সিতওয়ে শাখার একজন অপারেটর,' জানালেন বস্। 'বডিগার্ড হিসেবে সুরাইয়ার সঙ্গে ছিল। কিডন্যাপাররা গুলি করেছে ওকে, তবে ভাইটাল কোনও অর্গানের ক্ষতি হয়নি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ফোন

করেছে অ্যামবুলেন্স থেকে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'পুলিশ কিছু বলতে না পারুক, আমরা জানি ওটা কার কাজ, তাই না?'

'জী, সার।' নিরুত্তাপকণ্ঠে বলল রানা।

'তোমার কাজ আরও কঠিন হয়ে গেল,' বললেন রাহাত খান। 'তুং শান জানে সাগরে ডুব দিয়ে সাবমেরিন না পেলে আবার তুমি তার হেডকোয়ার্টারে ঢোকার চেষ্টা করবে। আমার ধারণা সেজন্যেই সুরাইয়াকে আটক করেছে সে, প্রয়োজনে ওকে যাতে লিভার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।'

রানা চিন্তিত। 'এরকম সিরিয়াস পরিস্থিতিতে আমরা কি, সার, সব রকম অপশন যাচাই করে দেখেছি?'

'তুমি ঠিক কী ধরনের অপশনের কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

'জঙ্গিরা আরাকানে জড়ো হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মিসাইল ছোঁড়ার জন্যে ওখানে লঞ্চিং স্টেশন অ্যাসেম্বল করা হচ্ছে, অথচ এখনও আমরা মায়ানমার সরকারকে কিছু বলছি না কেন, সার?'

'বলছি না টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা আছে, তাই,' বললেন বিসিআই চিফ। তারপর ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করলেন।

আরাকানের ওই জঙ্গল শুধু দুর্ভেদ্য নয়, রোহিঙ্গা মুসলিম বিদ্রোহীদের শক্ত ঘাঁটিও। নাসাকা বাহিনী তো বটেই, এমনকী মায়ানমারের সেনাবাহিনী পর্যন্ত বহুবার চেষ্টা করেও ওদের এলাকায় ঢুকতে পারেনি।

বার্মায় রোহিঙ্গা মুসলমানরা বৈষম্যের শিকার, ওদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে, ফলে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে ওরা। গেরিলাযুদ্ধটা জনপ্রিয় করার জন্য ওদের লিডাররা ব্যবহার করছে ধর্মীয় জঙ্গিবাদকে। তারই সুযোগ নিয়ে ওখানে আশ্রয় নিয়েছে বাংলাদেশি জঙ্গিরা। মায়ানমার সরকারকে বলেও কিছু

লাভ নেই, তারা কিছু করতে পারবে না।

তুং শানের ব্যাপারটা আরও নাজুক। কুখ্যাত একজন জলদস্যু ক্যাকটাস দ্বীপে বসে অত্যাধুনিক ফ্যাসিলিটির সাহায্যে বছরের পর বছর বঙ্গোপসাগরে ডাকাতি করে যাচ্ছে, সামরিক জান্তা ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও এটা কীভাবে সম্ভব?

সম্ভব ক্ষমতাসীন কারও সমর্থন পেলে। খোঁজ নিতে গিয়ে সেই তথ্যই বেরিয়ে এসেছে। অন্তত স্থলবাহিনীর দুজন মেজর জেনারেল, নৌ-বাহিনীর দুজন রিয়ার অ্যাডমিরাল আর বিমানবাহিনীর দুজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মোটা টাকার বিনিময়ে সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য করে যাচ্ছে তুং শানকে।

এই ছয়জন কর্মকর্তার নাম জানিয়ে প্রকৃত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে জানানো হয়েছে মায়ানমার সরকারকে। সামরিক জান্তা বলেছে, তারা ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখবে। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি দেয়ারও আশ্বাস দিয়েছে তারা। কিন্তু ধারণা করা হচ্ছে তদন্ত শেষ হতে দু'মাস লেগে যেতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয় আর কী! তবে তারও ওষুধ আছে। আমাদের সাধ্য সীমিত, তার পরেও যতটা সম্ভব আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি।

সব শুনে রানা হতাশই হলো রানা। বলল, 'কাজেই—'

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বস্ বললেন, '...কাজেই, আমাদের আর কোনও বিকল্প নেই। আই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। গুড লাক, মাই বয়!'

শুধু কান নয়, সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করল রানা, অন্তরের অন্তস্তল থেকে ওর জন্য প্রার্থনা করলেন রাহাত খান।

'থ্যাঙ্ক ইউ, সার।' বিনয়ে অবনত হলো ওর অন্তরও।

সতেরো

মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমাল রানা। তার আগে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামিয়েছে, গোগ্রাসে লাঞ্চও সেরে নিয়েছে।

বিকেল চারটে বিশ মিনিটে কড়া দু'কাপ কফি খেয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল ও। দ্রুতগতি কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে, নীচে হালকা কুয়াশাও রয়েছে। দশ মিনিট পর দাবাইং বন্দরের কাছাকাছি একটা জেটির মুখে হাজির হলো। ওখানে ওর জন্য অপেক্ষা করছে শাহিন সিরাজ।

বড়সড় একটা কার্ডবোর্ড বক্স রয়েছে সিরাজের কাছে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রানার হতে ধরিয়ে দিল সেটা। 'ঠিক আপনি যা চেয়েছেন, মাসুদ ভাই। পুরুষই পেয়েছি।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'ভেরি গুড, সিরাজ। যতই শক্তিশালী বিনকিউলার ব্যবহার করুক ওরা, সন্ধ্যার আবছা আলোয় শুধু কাঠামোটাই দেখতে পাবে, ডিটেলস কিছুই চোখে পড়বে না। তোমাকে যে একটা স্প্রে আনতে বলেছিলাম, এনেছ?'

পকেট থেকে বের করে অ্যারোসল ক্যানের মত দেখতে একটা বোতল রানার হাতে ধরিয়ে দিল সিরাজ। 'খুব সারধানে ব্যবহার করতে হবে, মাসুদ ভাই। এরচেয়ে কম শক্তিশালী কিছু পাওয়া গেল না। মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেলে নার্ভাস সিস্টেমকে একেবারে ধ্বংস করে দেবে।'

'হুম। আমার বাহন কই?'

'আসুন।' রানাকে পাশে নিয়ে জেটির চওড়া পাটাতনের উপর দিয়ে এগোল সিরাজ। জেটির দু'ধারে দু'সারিতে মোটা রশি দিয়ে মাছ ধরার বিশ-পঁচিশটা ট্রলার বাঁধা রয়েছে, একের পর এক বিরাট সব ঢেউ এসে এমন ধাক্কা মারছে ওগুলোয়, দড়ি-দড়া ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম। রানা ভাবল, সাইক্লোনটার তোড়জোড় দেখে ভয় হচ্ছে সকাল হওয়ার আগেই না ডুবে যায় সব।

নির্জন জেটির শেষ মাথায় একটা ছোট মোটর লঞ্চ বাঁধা রয়েছে। 'বোটম্যানের নাম ওয়াপ্পা রোজারিও,' বলল সিরাজ।

'পরিচিত?' জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকাল সিরাজ। 'জী, মাসুদ ভাই, আগেও আমাদের দু'একটা কাজ করেছে। ওর পরিবারের সবাইকে আমরা চিনি, বিশ্বাস করা যায়। তবে এই কাজটা করতে চায়নি, ভয় পাচ্ছে বোটটা না হারাতে হয়। ডলারের লোভ দেখিয়ে রাজি করিয়েছি।'

'কত?'

'এক হাজার।'

'ঠিকই আছে,' বলল রানা। 'টাকা বেশি না হলে এরকম দুর্যোগের ভেতর কেন যাবে।' বিক্ষুব্ধ সাগরের দিকে তাকাল ও। 'দিনের আলো আর হয়তো ঘণ্টাখানেক থাকবে। আমি চাই ওরা আমাকে দেখতে পাক, তবে স্পষ্টভাবে নয়। সময়মত পৌঁছাতে পারলে এই আবহাওয়া কাজে লাগবে আমার।'

'মাসুদ ভাই,' বলল সিরাজ। 'ব্যাপারটা আরেকবার ভেবে দেখবেন—আপনার একা যাওয়া উচিত হচ্ছে কি না?'

'তোমাকে যদি সঙ্গে করে নিয়ে যাই, এখানকার কাজগুলো করবে কে, বলো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তা ছাড়া, একা গেলে ওদের চোখ ফাঁকি দেয়া সম্ভব—আর তার ওপরই নির্ভর করছে এই অ্যাসাইনমেন্টের সাফল্য।'

‘এখানকার কাজ তো একটাই,’ বলল সিরাজ। ‘পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আপনি না ফিরলে ক্যাকটাস দ্বীপে যাব আমরা। সেই সঙ্গে মায়ানমার কোস্ট গার্ড আর ইন্ডিয়ান নেভিকেও খবর দেব।’

‘হ্যাঁ।’ তার পিঠ চাপড়ে দিল রানা।

ছুঁচোর মত সরু মুখ ওয়াপ্পা রোজারিওর, চোখ দুটো খুব ছোট, দৃষ্টিতে ধূর্ত একটা ভাব। সিরাজের সঙ্গে রানাকে দেখে কোনও প্রশ্ন না করে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে অন্যদিকে তাকাল, হাত চালিয়ে দড়ি-দড়া খুলছে।

‘প্রতি মিনিটে আরও খারাপ হচ্ছে আবহাওয়া,’ বলল সে, যেন তার কথার খেই ধরেই বাতাসের সঙ্গে বর্শার মত ছুটে এসে রানার চোখে-মুখে বিঁধল বৃষ্টির প্রথম কয়েকটা বড় বড় ফোঁটা।

লঞ্চ ছেড়ে দিল রোজারিও। জেটিতে দাঁড়ানো সিরাজ বৃষ্টি আর কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে গেল।

জেটি থেকে দুশ' গজ এগোবার পর রোজারিওকে ব্যাখ্যা করে বলল রানা, কী করতে চায় ও।

‘আপনার মাথার ঠিক নেই, সার,’ ঘাবড়ে গিয়ে বলল রোজারিও। ‘এরকম সাইক্লোনের মধ্যে আপনি খোলা সাগর পাড়ি দিতে চাইছেন?’

‘ঠিক ধরেছ, একটা পাগলই লঞ্চটা ভাড়া নিয়েছে,’ বলল রানা। ‘কাজেই তার কথা না শুনে তোমার উপায় নেই। তোমার যদি এক হাজার ডলারে না পোষায়, বেশ তো, বারোশ' ডলার নেবে, কিন্তু কাজটা তুমি করছ—তাই না?’

না চাইতেই দুশ' ডলার বেড়ে যাওয়ায় খুশি হলো রোজারিও, এরপর রানার বলা কথাগুলো চুপ করে শুনল সে। সবশেষে রানা বলল, ‘কী বুঝলে শোনাও।’

‘আমরা ক্যাকটাস দ্বীপে নামার ভঙ্গি করেও নামব না। সামনে দিয়ে পুরোটা প্রস্থ গিয়ে বাঁক নিয়ে গলফ কোর্সের সঙ্গে সমান্তরাল রেখা ধরে চলব কিছুদূর,’ গড়গড় করে বলে যাচ্ছে

রোজারিও, 'তারপর বোন-ইয়ার্ডকে দুটো চক্কর দিয়ে যে-পথ ধরে এসেছি সেই পথ ধরে আমি একা ফিরে যাব। এই তো?'

চারদিক থেকে হুঙ্কার ছাড়ছে সাগর। লঞ্চটা ছোট হওয়ায় ঢেউগুলো যেন ওটাকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছে, ডুবিয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে তামাশা করছে। জীবন আসলে কতটা মূল্যহীন, ভাবতে গিয়ে বিষণ্ন হয়ে উঠল রানা।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' রোজারিওকে বলল রানা। 'তবে বোন-ইয়ার্ডকে ঘিরে একটা চক্কর দিলেই হবে। তারপর তোমার ছুটি। বাড়ি ফিরে গায়ে আচ্ছামত কম্বল জড়িয়ে টাকা গুণবে।'

'যদি ফিরতে পারি, সার, নতুন জীবন লাভ করার আনন্দে পুরো এক বোতল মদও খেয়ে ফেলব আমি।'

সিরাজের দেওয়া বড়সড় বাক্সটা খুলছে রানা। 'ফেরার পথে তুমি একজন সঙ্গী পাবে,' বলল ও। 'আমার জায়গায় যাত্রী হিসেবে ফিরবে ও, কাজেই অসম্মান কোরো না। তবে তীরের কাছাকাছি পৌঁছে পানিতে ফেলে দিয়ো ওকে, তারপর বেমালুম ভুলে যেয়ো ওর কথা।'

এরইমধ্যে ঝুলে পড়া ওয়াপ্পা রোজারিওর মুখ আরও খানিক হাঁ হয়ে গেল। 'ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়, সার। এর মানে কি আমাদের সঙ্গে আরেকজন ভদ্রলোক আছেন? ওই বাক্সের ভেতর?'

'হ্যাঁ, কথার কথা হিসেবে তা বলা যেতে পারে। দেখতে থাকো।'

বাক্সের ভিতর থেকে একটা ম্যানিকিন-এর বিচ্ছিন্ন অংশগুলো বের করল রানা। দ্রুত হাতে জোড়া লাগাচ্ছে—হাত ও পা ধড়ের সঙ্গে ক্লিক করে আটকে গেল, সবশেষে প্যাঁচ ঘুরিয়ে কাঁধে ফিট করা হলো মাথাটা। মূর্তিটাকে ককপিটের মেঝেতে শুইয়ে রাখল ও। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, নিজের কপালের পাশে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বৃত্ত তৈরির ভঙ্গিতে

ঘোরাচ্ছে রোজারিও।

রানা তাকাচ্ছে বুঝতে পেরে হাতটা নামিয়ে নিল সে, তারপর বুকে ক্রুসচিহ্ন এঁকে বিড়বিড় করল, 'যিশু, মেরি, এবং আর যারা যারা আছ—অন্তত এ-যাত্রা রক্ষা কোরো আমাকে!'

মাথা নত করে ককপিটে ঢুকল রানা, ম্যানিকিনটার পাশে উবু হয়ে বসল। সাগর অনবরত ফুঁসছে, কিন্তু তার আস্ফালনকে গ্রাহ্য না করে লাফাতে লাফাতে নিজের পথে এগোচ্ছে ওদের লঞ্চ।

ম্যাপ দেখে রানা জেনে নিয়েছে ক্যাকটাস দ্বীপ থেকে বোন-ইয়ার্ড আইল্যান্ড মাত্র সিকি মাইল দূরে, ক্যাসিনো আন্দামানের সরাসরি উল্টোদিকে, ঠিক যেন আধখানা চাঁদ।

আশপাশের দ্বীপগুলোয় প্রচুর খ্রিশ্চান আছে, তবে বোন-ইয়ার্ড আইল্যান্ডে এখন আর তাদের কাউকে কবর দেওয়া হয় না। কারণ আর কিছুই নয়, জায়গার অভাব। ওখানে কেউ বসবাস করে না, থাকার মধ্যে আছে শুধু পুরানো কয়েকশ' সমাধি আর হাড়ের স্তূপ।

রানা ভোলেনি, বস্ খবর পেয়েছেন বোন-ইয়ার্ডে সম্ভবত মিসাইল লঞ্চিং স্টেশন অ্যাসেম্বল করা হচ্ছে। সেজন্যই দ্বীপের একটা অংশকে অবজারভেশন পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করতে চায় রানা, ওখান থেকে প্রথমে কিছুক্ষণ ক্যাকটাস দ্বীপ ও ক্যাসিনো আন্দামানের উপর নজর রাখবে। যতই ঝড়-বৃষ্টি হোক, তুং শানের খুনিদের ফাঁকি দেওয়ার জন্য সিকি মাইল ঠিকই সাঁতরাতে পারবে ও।

ওর চিন্তায় বাধা দিল ওয়াপ্পা রোজারিও। চিৎকার করে বলল, 'আপনি পাগল হলেও. আমি তো নিজের দায়িত্ব পালন না করে পারি না, সার!'

'করো পালন, কে তোমাকে ধরে রেখেছে?' সাগরের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল রানার গলা।

'তা হলে শুনুন, সার। ওই দ্বীপটা ভুতুড়ে! ওখানে ভূত আছে! অতৃপ্ত আত্মারা ঘোরাফেরা করে!'

'তাতে কিছু আসে যায় না, রোজারিও,' হাসিমুখে বলল রানা। 'ওদেরকে আমি মানিয়ে নিতে পারব।'

মাথা নাড়ল রোজারিও। 'আমি ঠাট্টা করছি না, সার। গভীর রাতে প্রায়ই আলো দেখা যাচ্ছে বোন-ইয়ার্ডে। জেলেরা কত কিছু বলে ওই দ্বীপ সম্পর্কে,' তার গলা নিস্তেজ হয়ে এল, কারণ ঝড়ের প্রচণ্ডতা হঠাৎ বাড়তে শুরু করেছে।

লাফ দিয়ে লঞ্চে উঠে আসছে সাগর। ক্যাকটাস দ্বীপ কাছে চলে আসছে দ্রুত। কাকভেজা হয়ে ডেকে বসে আছে রানা—ক্যাসিনোর ওয়াচাররা ওকে যেন পরিষ্কার দেখতে পায়। ভিজলে কিছু আসে যায় না, একটু পরে তো সাঁতরাতেই হবে ওকে।

মাঝে মধ্যে নাইটগ্লাসটা অ্যাডজাস্ট করছে ও। ডেকে একটা ফ্রেম পড়ে আছে, ম্যানিকিনটাকে খাড়াভাবে বসানোর কাজে লাগবে ওটা। এক হাতে শক্ত করে ধরে আছে রানা ওটাকে।

খানিক পর গলা চড়িয়ে রোজারিওকে বলল, 'দ্বীপ দুটোর মাঝখানে থাকো। উঁচু দালানগুলো থেকে ওরা যেন আমাদেরকে দেখতে পায়। কী বলছি বুঝতে পারছ?'

অস্থির হুইলের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে রোজারিও, জবাব দিল শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে। ভিজে যাওয়ায় এখন হুবহু ছুঁচোর মত লাগছে ওকে।

ক্যাসিনো আন্দামান আর সাগরের মাঝখানে উঁচু কোনও দালান না থাকায় লঞ্চ থেকে এগারোতলা বিল্ডিংটার বহুরঙা নিওনসাইন পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছে রানা, বৃষ্টি আর হালকা কুয়াশা থাকা সত্ত্বেও। তবে বাকি সব আলো নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। রানা অনুভব করল ওখান থেকে লঞ্চটার উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

দৃষ্টিসীমা দ্রুত কমে আসছে, তবে চোখে নাইটগ্লাস থাকার

দালানটার প্রতিটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছে ও। সেরকম ওরাও লঞ্চটাকে ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে। দুজন আরোহী। ছোট্ট এই ভাগ্যপরীক্ষার এটাই চাবিকাঠি। দুজন লোক এসেছিল লঞ্চে করে, দুজনই ফিরে গেছে।

এই রিপোর্টই পাবে তুং শান: রানা এসেছিল, কিন্তু ক্যাকটাসে ভেড়ার সাহস না পেয়ে ফিরে গেছে।

রানার ধারণা, নিজের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে তুং শান। এই অবস্থায় যদি সন্দেহ হয় কেউ তার উপর নজর রাখছে, কাজ বন্ধ করে নিশ্চয়ই বসে থাকবে না সে।

ইতিমধ্যে তুং শানের ওয়াচাররা লঞ্চটাকে খুব ভালভাবে দেখে নিয়েছে। এই মুহূর্তে ক্যাসিনোর সরাসরি উল্টোদিকে রয়েছে ওরা। ছোট হরফের নিওনসাইনটাও এখন পড়তে পারছে রানা—হোটেল আন্দামান।

গলা চড়াল রানা, 'এবার বাঁক নাও, রোজারিও! বাঁক ঘুরে বোন-ইয়ার্ডের আড়ালে চলে যাও! যতটা পারো স্পিড কমাও। এই লঞ্চ আর ক্যাসিনো আন্দামানের মাঝখানে মিনিট দুয়েকের জন্যে চাই আমি দ্বীপটাকে। সম্ভব?'

হুইল সামলাতে ব্যস্ত রোজারিও, তারই মধ্যে মাথা ঝাঁকাল। কোনওমতে ঘুরতে চাইছে না লঞ্চ। ওটার বো-কে পেয়ে বসেছে তীব্র টানা বাতাস, ঠেলে দিচ্ছে পিছনদিকে।

হঠাৎ খেয়াল করল রানা, দম আটকে রেখেছে ও। এই অবস্থায় যদি একজোড়া বড় ঢেউয়ের মাঝখানে পড়ে ওরা, লঞ্চ উল্টে যাবে।

অবশেষে, যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও, বাঁক নিতে শুরু করল, বাতাসকে ঠেলে এগোল লঞ্চ। প্রথম ঢেউয়ের তলায় ডাইভ দিতে চেষ্টা করল; সবুজ একটা পাহাড় ওটা, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ডেকের উপর, কয়েক টন ঠাণ্ডা পানির নীচে চাপা পড়ল ওরা। কাঠের অবলম্বন ছেড়ে দিয়ে খপ্ করে ম্যানিকিনটাকে

জড়িয়ে ধরল রানা, তা না হলে স্রোতের সঙ্গে লঞ্চ থেকে নেমে যাচ্ছিল ওটা।

একটু পরেই বাতাসের হামলা থেকে কিছুটা রক্ষা পেল ওরা, মাঝখানে কবরস্থান বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় ওদেরকে আর তেমন নাগাল পাচ্ছে না।

'আমার একটা লাইন দরকার!' বলল রানা। 'রশি!'

ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে রোজারিও বলল, 'সকারে দেখুন! আপনার ঠিক পাশেই।'

বোন-ইয়ার্ড আইল্যান্ডের পিছনে চলে এসেছে ওরা। এদিকে ঢেউয়ের প্রচণ্ডতা খুব যে কম তা নয়, তবে ক্যাসিনো থেকে ওদেরকে দেখা যাচ্ছে না। বোন-ইয়ার্ড পাথর ও কাদায় তৈরি আধখানা চাঁদ, আকারে দুই একরও হবে কি না সন্দেহ।

ব্যস্ত হাতে রেইনকোটের পকেট খালি করে জ্যাকেটের পকেট ভর্তি করছে রানা, ওর চোখে বেশ কিছু পাথরের তৈরি কালচে-খয়েরি রঙের সমাধি আর খিলান আকৃতির প্রবেশপথ ধরা পড়ল। রেইনকোটটা ম্যানিকিনকে পরিয়ে দিল ও, কোমরের কাছে বেল্ট বাঁধল, ক্যাপটাও বসিয়ে দিল ওটার মাথায়।

তারপর ম্যানিকিনটাকে খোলা ডেকে বয়ে নিয়ে এসে কাঠের ফ্রেমটার সঙ্গে আটকে দিল, প্লাস্টিকের একটা হাত উঁচু করে সেটার খাড়া অংশে ঠেকাল, যেন ভারসাম্য রক্ষার জন্য ধরে আছে।

ইতিমধ্যে চারদিক প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। দূর থেকে দেখে ম্যানিকিনটাকে মানুষ বলে মনে না হওয়ার কোনও কারণ নেই। এসেছিল দুজন—ফিরেও যাবে দুজন।

বোন-ইয়ার্ড দ্বীপের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছে লঞ্চ, খুব বেশি হলে রানার হাতে আর ত্রিশ সেকেণ্ড সময় আছে। রোজারিওর উদ্দেশে হাত নেড়ে বলল ও, 'মনে রেখো, তুমি

আমাকে জীবনে দেখোনি কোনওদিন!'

লঞ্চের কিনারা থেকে লম্বা ডাইভ দিয়ে উত্তাল সাগরে পড়ল রানা।

ভাঙা একটা কবরের ভিতর শুয়ে আছে রানা। ওর চারপাশের থকথকে কাদা থেকে বেরিয়ে রয়েছে মানুষের মাথার খুলি ও নানান জায়গার হাড়। অর্ধ-বৃত্তাকার দ্বীপটাকে এরইমধ্যে একবার ক্রল করে ঘুরে দেখে এসেছে ও, তবে সেটাকে ঠিক সার্চ করা বলে না।

বোন-ইয়ার্ডের এটা পশ্চিম প্রান্ত, সরাসরি সামনে ক্যাকটাস দ্বীপ।

ছোট্ট এই দ্বীপটায় কোনও লোকজন, কিংবা লঞ্চিং স্টেশন এখনও ওর চোখে ধরা পড়েনি। কে জানে, ওটা হয়তো আন্ডারগ্রাউন্ডে, কোনও পুরানো সমাধির নীচে অ্যাসেম্বল করা হয়েছে। সময় নিয়ে আরেকবার দেখতে হবে ওকে।

রানা এখন বোন-ইয়ার্ডের সামনের দিকটায় রয়েছে, আধখানা চাঁদের কোলে—ক্যাকটাস দ্বীপের মুখোমুখি। এই মুহূর্তে নরক থেকে উঠে আসা কোনও জীব মনে হচ্ছে নিজেকে ওর, পাপীদের সমুচিত শাস্তি দেওয়ার জন্য ঈশ্বর ওকে মর্ত্যে পাঠিয়েছেন।

এক ঘণ্টার কিছু বেশি হলো কবরটায় রয়েছে রানা। প্রতি মুহূর্তে ঝড়ের দাপট বাড়ছে। বাতাস-তাড়িত কালো মেঘ চিরে মাঝে-মধ্যেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি এখন ঝরছে অঝোর ধারায়।

এরকম দুর্যোগের রাতে মরা মানুষদের ঠিকানায় কিছু ঘটুক বা না ঘটুক, গা ঠিকই ছমছম করবে, বিশেষ করে তুমি যদি ওদের একটা ঘর দখল করে বসে থাকো! ওর মগজ চিন্তাগুলোকে কোন্ খাতে প্রসেস করতে চাইছে বুঝতে পেরে মুচকি

হাসল রানা।

সাগরে ডাইভ দেওয়ার আগেই টাই আর জুতো খুলে ফেলে দিয়েছে ও.। জ্যাকেটটা সঙ্গে রাখতে হয়েছে, কারণ ওটার পকেটে মূল্যবান কিছু জিনিস আছে। পানি থেকে তীরে পৌঁছে দাঁড়াবার সাহস হয়নি ওর, জানে ক্যাসিনোর ওয়াচাররা বোকা নয়। এখানকার কাদা এমন কালো আর আঠালো, ক্রল শুরু করবার দু'মিনিটের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনও প্রাণীর আদল পেয়ে গেছে ও।

কবরের ভিতরও সেই একই কাদা, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে চোখে নাইটগ্লাস অ্যাডজাস্ট করল। অন্ধকার আর কুয়াশা ভিতর অস্পষ্ট লাগছে চৌকো দালানটাকে। খানিক আগে নিওনসাইনগুলোও নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। তুং শানকে এটুকু কৃতিত্ব দিতেই হয়, ভাবল রানা, খুঁটিনাটি কিছুই তার চোখ এড়ায় না।

আপাতত চোখ থেকে নামিয়ে রাখতে যাবে, এই সময় দেখল পুব, অর্থাৎ মেইনল্যান্ডের দিক থেকে আসা একটা ইয়ট বোন-ইয়ার্ডকে পাশ কাটাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি নাইটগ্লাসটা আবার চোখে তুলল রানা। ক্যাকটাস দ্বীপের উত্তরদিক ঘেঁষে এগোচ্ছে ইয়ট। ওটার রানিং লাইট ছাড়া আর সব আলো নেভানো। এরকম দুর্যোগের মধ্যে কে এল কে জানে, ভাবল ও।

বাঁক ঘুরে দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে গেল ইয়টটা। তারপরও একদৃষ্টে ওদিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ক্যাকটাস দ্বীপের সবগুলো জেটি এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না বটে, তবে জেটি থেকে কেউ যদি গাড়ি নিয়ে ক্যাসিনো আন্দামানের দিকে আসে, রানা তাকে দেখতে পাবে।

বিশ মিনিট পরেই ওর চোখে পড়ল উত্তরদিক থেকে সৈকতের উপর দিয়ে আলোর দুটো বিন্দু ক্যাসিনোর দিকে

এগিয়ে আসছে। বৃষ্টি আর কুয়াশার ভিতর বিড়ালের হলুদ একজোড়া চোখ মনে হলো ওগুলোকে।

ব্ল্যাকআউট লাইটসহ ওটা সেই রেইডার ভ্যান।

নাইটগ্লাস দিয়ে ওটাকে অনুসরণ করছে রানা। থামল ওটা। ক্যাসিনোর ফটকটা দেখা যাচ্ছে না, তবে সন্দেহ নেই সেটার সামনেই থেমেছে। ভ্যানের সামনে থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামল দুজন লোক। ত্রস্ত পায়ে ভ্যানের পিছনদিকে চলে গেল তারা, তারপর টান দিয়ে দরজা খুলল। একই সময়ে ক্যাসিনোর দরজা খুলে গেল—বোঝা গেল ভিতর থেকে আলোর উজ্জ্বল একটা টানেল বেরিয়ে আসায়। ফটকের সামনের দৃশ্যটা আলোকিত হয়ে উঠল।

মুখে টেপ লাগানো, হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, ভ্যানের পিছন থেকে একটা মেয়েকে নামাচ্ছে ওরা। আলোটা উজ্জ্বল বলেই পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, একজন গুণ্ডা সাহায্য করবার জন্য কবজির কাছটা ধরতেই ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিল মেয়েটা। এবার ওকে চিনে ফেলল রানা। সুরাইয়া জেবিন।

আঠারো

সকাল এগারোটার দিকে কিডন্যাপ করা হয় সুরাইয়াকে, ভাবল রানা, হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসতে অনেক বেশি সময় নিয়ে ফেলল তুং শানের লোকেরা। সম্ভবত পরিস্থিতি নিরাপদ মনে না করায় কোথাও আটকে রাখা হয়েছিল ওকে।

ছোট্ট কবরের ভিতর নড়াচড়ার জায়গা খুব কম, থকথকে কাদার ভিতর শরীরের ভর এক পা থেকে আরেক পায়ে চাপিয়ে ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও পেন্সিল টর্চটা জ্বেলে হাতঘড়ি দেখল রানা। কনুইয়ের কাছ থেকে চোখবিহীন একটা খুলিও তাকিয়ে আছে, যেন—বাজে কয়টা?—কৌতূহল হচ্ছে ওটারও। ওর মাথার মসৃণ হাড়ে হাত বুলিয়ে দিল রানা। 'তোমার আর ঘড়ি দেখার দরকার নেই, বন্ধু—তুমি অনন্তকালে পৌঁছে গেছ!'

সাড়ে ছ'টা বাজে।

ইচ্ছে করেই আরেকটু রাত করে রওনা হতে চাইছে রানা। জঙ্গি মাওলানা ইমরানের কথাটা ভোলেনি ও—প্রায় রোজ রাতেই তুং শান তার লোকজনকে নিয়ে বোন-আইল্যান্ডে আসে।

সিদ্ধান্ত নিল অপেক্ষার সময়টা নষ্ট না করে দ্বীপটা আরেকবার ভাল করে দেখবে।

ক্রল করে বোন-ইয়ার্ডের পশ্চিম প্রান্ত ধরেই এগোচ্ছে রানা, ফলে ক্যাকটাস দ্বীপটা ওর দৃষ্টিপথেই থাকছে, হারিয়ে যাচ্ছে না। আঠালো কাদায় প্রতি মুহূর্তে পিছলে যাচ্ছে শরীরটা। সামনে পড়ল বড় আকারের একটা সমাধি, মুখটা পুব দিকে, ক্যাকটাস দ্বীপ থেকে দেখা যাচ্ছে না। বহু বছর আগে লুকাস পরিবারের শেষ ঠিকানা হিসাবে তৈরি করা হয়—এখন হয়তো এ পরিবারের কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও।

করুণ চেহারা দেখেই বোঝা যায় সমাধিটা কখনওই মেরামত করা হয়নি, বহু বছর ব্যবহারও করা হয় না।

লোহার তৈরি প্রকাণ্ড দরজায় মরচে ধরেছে, কবজাগুলো অকেজো হয়ে গেছে অনেক আগেই। সামান্য একটু ফাঁক হয়ে আছে সেটা, কোনও রকমে ভিতরে ঢোকা যাবে। ও যদি ঢুকতে পারে, তা হলে আরও অনেকে ঢুকতে পারবে, এবং ঢুকেছেও। সেই আরও অনেকে হলো জলদস্যু তুং শান আর তার লোকজন।

বিশ-বাইশটা ধাপ বেয়ে সমাধির নীচে নেমে এল রানা। এখানে কাঠের নতুন একটা দরজা ওর পথ আগলে দাঁড়িয়েছে।

ইস্পাতের সরু শিকটা এবার কাজে লাগল। কবাট ঠেলে ভিতরে ঢুকল রানা।

কী কারণে বলা মুশকিল, সমাধির ছাদের একটা অংশ সম্প্রতি ভেঙে ফেলা হয়েছে। সেই ভাঙা অংশ দিয়ে সমাধির ভিতর ঢুকে পড়েছে অন্ধকার রাতের তুমুল ঝড়-বৃষ্টি।

পুরানো সমাধিটা যেন আধুনিক গুপ্তধন ভর্তি আলিবাবার সেই গুহা। টর্চটা আবার জ্বেলে চারদিকে দ্রুত একবার চোখ বুলাল ও। কফিনগুলো রাখা হয়েছে সমাধির গা কেটে বানানো শেলফে।

ভাঙা ছাদের সরাসরি নীচে পাথর সরিয়ে ছোট একটা গর্ত খোঁড়া হয়েছে।

মেঝের একপাশে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা জেনারেটার রয়েছে, ভেজা সিলিং থেকে ঝুলছে বেশ কয়েকটা বালব। সন্দেহ নেই, দূর থেকে এই আলো দেখেই জেলেরা অতৃপ্ত আত্মার কথা রটিয়েছে।

সমাধির মাঝখানে স্তূপ করে রাখা হয়েছে একগাদা ডাইভিং ইকুইপমেন্ট। এক কোণে রয়েছে বিরাট সব বাক্স আর ক্রেইট, গায়ে ফিতে আকৃতির ইস্পাতের পাত মোড়া, দেখে মনে হলো ভিতরে সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও পার্টস্ আছে। রানা ধারণা করল, এই বাক্সগুলোর মধ্যেই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় প্যাক করা আছে মিসাইল লঞ্চিং ইকুইপমেন্ট।

একধারে প্রচুর খড়ও দেখতে পাচ্ছে রানা। খড়ের উপর চাদর, দু'তিনটে বালিশ ইত্যাদি পড়ে রয়েছে। তার মানে সমাধির ভিতরে পাহারাদার থাকে, কোনও বিশেষ কারণে এই মুহূর্তে নেই তারা এখানে।

ভাঙা ছাদ আর ওটার নীচে খোঁড়া গর্তের দিকে আরেকবার

তাকাল রানা। সাগর থেকে তুলে আনবার পর সম্ভবত এখান থেকেই ছোঁড়া হবে মিসাইলটা।

মেঝেতে নামানো কয়েকটা নতুন কফিন দেখে ভাঁজ পড়ল রানার কপালে। একটার ঢাকনি তুলে উঁকি দিতে যা ভেবেছিল তাই দেখতে পেল। হাড়ের স্তূপ আর কদর্য হাসি লেগে থাকা খুলির পাশে শুয়ে রয়েছে কয়েকটা একে-ফোরটিসেভেন, একটা সাব-মেশিনগান আর প্রচুর অ্যামিউনিশন। প্রয়োজনে ছোট একটা আর্মির সঙ্গেও যুদ্ধ করবার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে তুং শান।

আরেকটা কফিনে, খোলা বাক্সের ভিতর, হ্যান্ড গ্রেনেড দেখতে পেল রানা। দুটো তুলে নেড়েচেড়ে দেখল, তারপর ভরে রাখল জ্যাকেটের পকেটে।

সমাধির দরজায় তালা দিয়ে ধাপ বেয়ে উঠে এল রানা।

আবার কাদার উপর ক্রল শুরু করল ও। সামনের জমিন খানিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে ছোট একটা ডকের দিকে। ডকের কাছাকাছি পৌঁছে একটা কবরের ভিতর নামিয়ে দিল অর্ধেকটা শরীর, জেটিটাকে দেখছে। পুরানো জেটি, তবে সম্প্রতি মেরামত করা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে কাদের কাজ।

ঘাড় ফেরালেই ক্যাকটাস দ্বীপ দেখতে পাচ্ছে রানা, এখনও বোন-ইয়ার্ডের পশ্চিম প্রান্তেই রয়েছে ও।

জেটির সামনে পানি স্থির রাখবার জন্য বালিভর্তি বস্তা আর করোগেটেড আয়রন ব্যবহার করে ছোট্ট একটা ব্রেকওয়াটার তৈরি করা হয়েছে—সাগরের ঢেউ ঠেকিয়ে দেওয়ার উপযোগী বাঁধ। ওটার পিছনে দ্বীপের জমিন খুঁড়ে একটা সমুদ্রগামী টাগ রাখবার মত যথেষ্ট বড় গর্ত করা হয়েছে—মানুষের তৈরি একটা খাঁড়ি। এমনকী এরকম দুর্যোগের মধ্যেও ওদের টাগ ওখানে সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে।

এখানে যখন মেরামত করা একটা জেটি রয়েছে, সন্দেহ নেই লঞ্চ বা টাগ নিয়ে এখানেই ভেড়ে তুং শান। অপেক্ষা করে

একটু দেখা উচিত না আজও তারা কেউ আসে কি না?

কবরের কিনারায় উপুড় হয়ে শুয়ে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, উত্তাল সাগরের হিংস্র চেহারা দেখছে।

কিন্তু ঝমঝম বৃষ্টি, উন্মাদ বাতাস আর পচা কাদার মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়! কবরের ভিতরটা পানিতে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। পায়ের চারপাশে কিলবিল করছে সাপ—কে জানে বিষাক্ত কি না। এক ঘণ্টা পার না হতেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলল ও।

কবর থেকে বেরিয়ে এসেছে, এই সময় কুয়াশার ভিতর ফুটে উঠতে দেখল একটা টাগের রানিং লাইট। ক্যাকটাসের পিছন থেকে, ওটার দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে আসছে ওটা, অর্থাৎ গভীর সাগরের দিক থেকে। রানা ভাবল, মিসাইল নিয়ে?

সাগরের তলা থেকে এ-যাত্রায় যদি মিসাইল তোলা হয়ে থাকে, রানা ধারণা করল টাগবোটে তা হলে অবশ্যই তুং শানও উপস্থিত। কারণ সে ছাড়া আর কেউ জানে না বঙ্গোপসাগরের তলায় ঠিক কোন্ জায়গায় পড়ে আছে ভারতীয় সাবমেরিন অর্জুন।

পিছলে জলমগ্ন কবরের ভিতর ফিরে এল রানা, বাইরে বেরিয়ে থাকল শুধু মাথাটা। ওর প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথারের মাজলে রাবার কর্ক ভরা আছে, ওটাকে ওয়াটারপ্রুফও করা হয়েছে স্পেশাল গ্রিজ দিয়ে। সঙ্গে আর যা কিছু আছে, পানি লাগলে সেগুলোর কোনও ক্ষতি হবে না।

ক্যাকটাস দ্বীপের দক্ষিণ দিকের একটা জেটিতে ভিড়ল টাগ, এটা সম্ভবত তুং শানের প্রাইভেট জেটি। রানার চোখে নাইটগ্লাস থাকা সত্ত্বেও বোঝা গেল না টাগ থেকে কজন নামল। কিংবা তারা কারা।

খানিক পর জেটিটার শেষ মাথায় একটা গাড়ির হেডলাইট জ্বলে উঠল। ওটার সামনে দিয়ে এক সারিতে হেঁটে গেল ওয়েটসুট পরা অন্তত বিশজন লোক। একটা ট্রাকে উঠছে তারা।

এরপর রানার ধারণাকে সত্যি প্রমাণিত করে অলস পায়ে হেডলাইটের আলোয় এসে দাঁড়াল তুং শান। ওয়েটসুট আর অক্সিজেন-বটল খুলে ফেলেছে সে, তবে মাস্কটা এখনও তার হাতে ঝুলছে। ঘাড় ফিরিয়ে কাকে যেন কী বলল, তারপর উঠে পড়ল গাড়িতে। ট্রাকটার পিছু নিয়ে ক্যাসিনো আন্দামানের দিকে যাচ্ছে গাড়ি।

ওদেরকে নামিয়ে দিয়ে জেটি থেকে আবার রওনা হলো টাগটা, সোজা বোন-ইয়ার্ডের দিকে এগিয়ে আসছে।

কবরটার আরও একটু ভিতরে নেমে গেল রানা।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে টাগ। প্রায় অন্ধকার জলযান, স্পষ্টভাবে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হাতে তৈরি বাঁধটাকে ঘুরে লুকানো খাঁড়ির ভিতর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ঢুকে পড়ল ওটা। ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেল রানা। জেটিতে শক্তিশালী কয়েকজন লোককে দেখল ও, টাগটাকে রশি দিয়ে বাঁধছে।

টাগ থেকে ভেসে আসছে চিনা আর বার্মিজ ভাষার সংলাপ। পানির ভিতর নিঃশব্দে নড়ে উঠল রানা, নাইটগ্লাস অ্যাডজাস্ট করছে।

কথাবার্তা যেটুকু ওর কানে আসছে তাতে বুঝতে অসুবিধে হলো না লোকগুলো তুং শানের ভাড়া করা বিজ্ঞানী ও টেকনিশিয়ান। সময় হলে এরাই লঞ্চিং ইকুইপমেন্ট জোড়া লাগিয়ে মিসাইল ছোঁড়ার ব্যবস্থা করবে।

টাগ থেকে চওড়া একটা গ্যাংওয়ে নামানো হলো। পিচ্ছিল কাদায় গ্যাংওয়ে যেখানে শেষ হলো, সেখান থেকে কাঠের তক্তা ফেলে একটা পথ তৈরি করা হচ্ছে, এগোচ্ছে সোজা বড় সমাধিটার দিকে।

একদিকে টাগ থেকে কাঠের তক্তা নামিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে পথ তৈরির কাজ করছে ছয়-সাতজন লোক, আরেকদিকে

প্রায় ত্রিশজন লেবার কাঁধে তুলে বয়ে আনছে ওঅরহেড ফিট করা লম্বা ও ভারী একটা মিসাইল।

ওটাকে দেখামাত্র রানার মনের ভিতর বিপদসংকেত বেজে উঠল। বুকের ভিতর ধীর, গুরুগম্ভীর একটা অশুভ কম্পন; যেন গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে। ভয়ে ওর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

তারপর প্রচণ্ড রাগ হলো। যারা পৃথিবীর সকল মানুষের মুসলমান না হওয়াটাকে, কিংবা ইসলামি বিধি-বিধান ঠিকমত পালন না করাটাকে মৃত্যুদণ্ডতুল্য অপরাধ বলে মনে করে তারা স্রেফ ধর্মান্ধ হায়েনা, এর-তার পচা লাশ খেয়ে বেড়াচ্ছে। সাধারণ মানুষের পবিত্র ধর্মবিশ্বাসকে নিজেদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে।

মিসাইলের পিছু নিয়ে সুট পরা দশ-বারোজন লোক তক্তার উপর দিয়ে হেঁটে আসছে।

সমাধির প্রবেশমুখ পর্যন্ত তক্তা ফেলা হয়েছে। রানাকে পাশ কাটিয়ে এগোল লেবাররা, মিসাইল নিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ল সমাধির ভিতর।

এবার ওটার পিছু নিয়ে আসা লোকগুলো পাশ কাটাচ্ছে রানাকে। পানির নীচে ডুবে আছে শরীর, শুধু নাক আর চোখ উপরে, লোকগুলোকে ভাল করে দেখছে ও। তাদের মধ্যে অন্তত দুজনকে অনায়াসেই চিনতে পারল—থাকিন মাউং আর থান বানডুলা।

আলখেল্লা পরা আরও দুজনকে চিনল ও, সালাউদ্দিন শাহ কুতুব আর মাওলানা তকদির হুসেন। এদের সঙ্গে দাড়ি ও টুপিওয়ালা আরও চারজনকে দেখে আন্দাজ করতে পারল, জঙ্গি নেতা—দেখতে এসেছে কতটা কী কাজ হয়।

তক্তার উপর সাবধানে পা ফেলে আস্তে-ধীরে এগোচ্ছে তারা। বাতাসের গর্জন সত্ত্বেও কে কী বলে শোনার চেষ্টা করছে রানা।

'দূর! দূর!' রাজ্যের বিরক্তি প্রকাশ করল একজন, ভাষাটা

বার্মিজ। 'এটা স্রেফ পাগলামি...কী? না, আজ রাতেই সব কাজ শেষ করতে হবে... কেন?'

আরেক লোককে শ্রাগ করতে দেখল রানা, সে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'কেন বলা... মুশকিল... কাল থেকে মিস্টার শান খুব নার্ভাস হয়ে আছেন...তবে সমস্যা নেই, আমাদের প্রস্তুতি তো প্রায় শেষই।' কথার সুরে চিনা টান স্পষ্ট।

'...টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্যে সেন্ট মার্টিনকে বেছে নেয়া হয়েছে, এটা কিন্তু এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না—' চলনসই ইংরেজিতে বলল একজন বার্মিজ। '...আমার ধারণা ছিল, শুধু হুমকি দেয়া হবে—'

'শুধু হুমকিতে কাজ হয় না!' ভারী গলায় বলল জঙ্গিদের লিডার, মাওলানা সালাউদ্দিন শাহ কুতুব।

তাকে সমর্থন করল আরও পাঁচ জঙ্গি। '...চোদ্দোশ' বছরের বেশি হয়ে গেল ভয় দেখানো হচ্ছে...কই...তাতে কোনও কাজ হয়েছে? ...মুখে বললে দোজখকে ভয় পায় না মানুষ... সেজন্যই তো তাদের জন্য দুনিয়ার বুকে আমাদেরকে দোজখ তৈরি করতে হচ্ছে।'

'কিছু মনে করবেন না, এই অধিকারটা কি সৃষ্টিকর্তার নয়? মানে, মানুষকে শাস্তি দেয়ার অধিকারটা?' ভয়ে ভয়ে না হলেও, সাবধানে জিজ্ঞেস করল একজন চিনা।

'আপনারা জিহাদ বোঝেন না, কাজেই কিছুই বোঝেন না,' শাহ কুতুব জবাব দিল।

'আল্লাহ পাক মানুষকে নিজের আদলে তৈরি করেছেন,' বলল মাওলানা হুসেন। 'শুধু শুধু? বান্দারা শুধু যে তাঁর চেহারা পেয়েছে তা তো নয়, কিছু দায়িত্বও দেয়া হয়েছে তাদের। জিহাদের মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে আল্লাহর আইন কায়েম করাই সেই দায়িত্ব। আমিন।'

কথা বলতে বলতে বড় সমাধিটার ভিতরে ঢুকে পড়ল

দলটা। এক মিনিট পর যান্ত্রিক গুঞ্জন শুনে আর লোহার দরজা দিয়ে হলদেটে আলো বেরিয়ে আসতে দেখে রানা বুঝল জেনারেটার চালু করা হয়েছে। যতই অবিশ্বাস্য বলে মনে হোক, ভাবল ও, সেন্ট মার্টিনকে উড়িয়ে দেওয়ার অপারেশন শুরু হলো।

এবার ওকেও তা হলে ওর কাজ শুরু করতে হয়।

সমাধির ভিতর মিসাইলটা পৌঁছে দিয়ে বেশিরভাগ লেবারই ফিরে গেছে টাগবোটে। তক্তাগুলোও তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কবর থেকে বেরিয়ে এসে টাগটার দিকে একবার তাকাল রানা।

অন্ধকার আর নিরাপদ খাঁড়ির ভিতর দোল খাচ্ছে ওটা। শুধু নিঃসঙ্গ ফরওয়ার্ড পোর্টহোল থেকে আলোর অস্পষ্ট একটু আলো বেরুচ্ছে। নিশ্চয়ই পাহারা বসানো হয়েছে, তবে আজ রাতে ওটা থেকে আর কেউ বেরুবে বলে মনে হয় না।

সাইক্লোন চলছে পুরোদমে। সাগরের গর্জনে কান পাতা দায়। অন্তত দু'দিন চলবে এই অবস্থা। অত্যন্ত সাবধানে ক্রল করে পাথুরে সমাধিটার দিকে এগোচ্ছে রানা।

দরজার কাছে পৌঁছে চারদিকটা আরেকবার দেখে নিল ও। তারপর এক মুহূর্ত চিন্তা করল—গ্রেনেড বিস্ফোরণের আওয়াজ এই ঝড়ের মধ্যে ক্যাকটাস দ্বীপে পৌঁছাবে না, তবে সমাধির ছাদটা ভাঙা হওয়ায় আলোর ঝলকানি ঠিকই ধরা পড়বে ওয়াচারদের চোখে।

লোহার দরজাটা পুরোপুরি খুলে ফেলা হয়েছে। ওটার মরচে ধরা গায়ে পা দিয়ে মাথায় উঠল রানা, ওখান থেকে পাঁচিলের মাথা হয়ে উঠে পড়ল ছাদে। এরপর ক্রল করে এগোল।

ভাঙা ছাদের কিনারায় পৌঁছে উঁকি দিয়ে নীচে তাকাল রানা। প্রথমেই দেখতে পেল ত্রিশ ফুট লম্বা মিসাইলের নাকে বসানো নিউক্লিয়ার ওঅরহেডটাকে, এত কাছে যে হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে।

আরও নীচে তাকাল ও। মেঝের গর্তে খাড়াভাবে বসানো হয়েছে মিসাইলটা। ওটার গোড়ায়, গর্তের চারপাশে, কমপিউটার সহ নানা যন্ত্রপাতি ও অবলম্বন সংযুক্ত করবার কাজ চলছে। ব্যস্ত বিজ্ঞানী ও টেকনিশিয়ানদের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাওলানা সালাউদ্দিন শাহ কুতুব ও মাওলানা তকদির হুসেন।

মাথাটা টেনে নিয়ে পকেট থেকে অ্যারোসল ক্যানটা বের করল রানা, গুণে গুণে চার প্যাঁচ ঘোরাল ক্যাপটা। ক্যানের তলায় একটা বোতাম আছে, সেটায় চাপ দিলে মাত্র চারভাগের একভাগ গ্যাস রিলিজ হবে, তারপর নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে ক্যানের মুখ।

ঝুঁকি নিয়ে আরেকবার উঁকি দিয়ে নীচে তাকাতে হলো।

উপরদিকে তাকিয়ে নেই কেউ। সালাউদ্দিন শাহ কুতুবের হাতে একটা কাগজ রয়েছে, সেটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ভারিক্কি চেহারার প্রৌঢ় দুজন লোক। কাগজটায় সম্ভবত সেন্ট মার্টিনের লোকেশন দেখানো আছে।

হ্যাঁ, রানা যা ভেবেছে ঠিক তাই! মাওলানা শাহ কুতুবের মুখ থেকে শুনে একজন ব্যালিস্টিক মিসাইল এক্সপার্ট কমপিউটারে ডেটা এন্ট্রি করছে। কমপিউটারটা মিসাইলের গায়েই বসানো।

বোতামে চাপ দিল রানা, পরমুহূর্তে ক্যানটা খড়ের গাদা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল ও, ক্যানটাকে কেউ পড়তে দেখেনি। তা দেখলে খড়ের দিকে তাকাত কেউ।

ঝট করে মাথাটা টেনে নিল রানা, গ্যাস যাতে ওর নাকে না ঢোকে।

এক মিনিট পর আবার উঁকি দিল। বিশ-বাইশজন লোক যে যেখানে ছিল সেখানেই ঢলে পড়েছে। মারা যদি কেউ না-ও গিয়ে থাকে, পাঁচ-সাত ঘণ্টার আগে কারও জ্ঞান ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। এবার ক্যানটা সংগ্রহ করতে হবে।

*

অ্যারোসল ক্যানটা দ্বিতীয়বার সংগ্রহ করল রানা টাগবোটের মেইন কেবিন থেকে। বিশ-পঁচিশজন লোক তিন-চারটে টেবিলে বসে তাস খেলছিল, ফুসফুসে নার্ভ গ্যাস ঢুকতেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে।

এবার তুং শানের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হয়, ভাবল রানা। সাগরের তলা থেকে এখনও তোলা হয়নি সাতটা মিসাইল, ওগুলোর হদিস একমাত্র সেই দিতে পারবে।

সুরাইয়ার কথাও মনে আছে রানার। আর কিছুর জন্য না হলেও, বিসিআই স্লিপার এজেন্টকে উদ্ধার করবার জন্য ক্যাসিনো আন্দামানে আরেকবার ঢুকতেই হত ওকে।

সাগর ফুঁসছে। ডাইভ দেয়ার আগে গায়ের জ্যাকেট আর পায়ের মোজা খুলে ফেলে দিল রানা। গ্রেনেড দুটোও ফেলে দিল। বেল্টের সঙ্গে সংযুক্ত হোলস্টারে রয়েছে পিস্তল, ছুরিটা বাম বগলের কাছে বাইসেপের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো, অ্যারোসল ক্যানটা ট্রাউজারের পকেটে।

প্রবল স্রোত আর ধেয়ে আসা ঢেউ নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল ওকে, সিকি মাইল সাঁতরাতে নাভিশ্বাস উঠে গেল। তীরে উঠে ক্লান্ত কুকুরের মত হাঁপাল কিছুক্ষণ, তারপর ক্রল করে এগোল ক্যাসিনো আন্দামানের দিকে।

বিদ্যুৎ-চমকের আলোয় পথ চিনে নিচ্ছে রানা। ভাবছে, চলে তো এলাম, কিন্তু দালানটার ভিতরে ঢুকব কীভাবে?

উনিশ

ক্যাকটাস দ্বীপের তীরে উঠে সাবধানে, ধীরগতিতে ক্রল করছে রানা। ঝড়-বৃষ্টির শব্দ ছাড়া কানে আর কিছু ঢুকছে না। কোথাও কোনও আলো জ্বলছে না। বিল্ডিংটার উত্তর পাশে রেইডার ভ্যানটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল, ভিতরে কেউ নেই।

ক্যাসিনো আন্দামানের পিছনদিকে চলে এল রানা। এদিকটাও পুরোপুরি অন্ধকার। কিছুই যখন দেখা যাচ্ছে না, এবার দাঁড়ানো যেতে পারে। ধীরে ধীরে সিধে হচ্ছে ও।

ওর মাথার একপাশে কেউ হাত বুলিয়ে দিল।

স্পর্শটা পাওয়ামাত্র কাঠ হয়ে গেল রানা। পরমুহূর্তে আবার একই অনুভূতি হলো। এই সময় বিদ্যুৎ চমকে ওঠায় চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল সুরাইয়াকে নিয়ে বিল্ডিংটার এগারোতলা থেকে রশি বেয়ে ঠিক এখানেই নেমে এসেছিল ও।

উপর দিকে তাকাল রানা, তারপর হাত বাড়াল। রশিটা এখনও ঝুলছে! বাতাসে দুলছে ওটা, ঝাঁকি খাচ্ছে ঘন ঘন। শিরশির করে উঠল ওর সারা শরীর। কোনও সন্দেহ নেই, এটা ফাঁদ। উপরে উঠলেই ক্যাক্ করে ধরবে। উপরের ফ্যানসহ ভেন্টিডাক্ট কামরায় ওর জন্য অপেক্ষা করছে দৈত্য কুয়ামিন চুয়ান আর তার লোকজন।

কিন্তু আরেকটু চিন্তা করা দরকার না?

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দুর্যোগময় রাতটার প্রতি বিরক্ত বোধ করছে রানা। সত্যি কি এতটা আশা করবে তুং শান? প্রতিপক্ষকে এরকম বোকা মনে করাটা নিজেকে তার ছোট করা নয়? তার তো এতদিনে জানার কথা সুরাইয়ার পিছু নিয়ে এসে প্রথমে ক্যাসিনো আন্দামান দেখে গেছে ও, সেই সঙ্গে তার সেরা তিনজন বডিগার্ডকে মেরে রেখেও গেছে; তারপর দিনের বেলা জুয়াড়ি হিসাবে ভিতরে ঢুকেছে। ঢোকার পরেও কিছু কম করেনি।

এরকম একজন বিদেশি স্পাইকে সে কি অত বোকা ভাববে?

রশিটা ধরে একটু টান দিয়ে দেখল রানা। এগারোতলার ভেন্টিডাক্টের ফ্রেমে পরানো হুকটা শক্তভাবেই আটকে আছে।

রশিটা যখন ঝুলছে, সহজ যুক্তি বলে, জায়গামত ফ্যানটাও লাগানো হয়নি।

রানা অপেক্ষা করছে কখন আবার বিদ্যুৎ চমকাবে। একটু পর চারদিক আলোকিত হয়ে উঠতেই প্লাস্টিকের দু'জোড়া গ্লাভ পড়ে থাকতে দেখল ও। যেভাবে ফেলে গেছে সেভাবেই পড়ে আছে।

কিন্তু যুক্তিতে মেলে না। ফাঁদটায় আঙুল বুলাচ্ছে রানা। এই রশি ওর জন্যই ফেলে রাখা হয়েছে। তুং শান জানে—ও আসবে, রশিটা দেখে ফাঁদ বলে মনে করবে, কিন্তু তারপরেও প্ররোচিত হবে। কারণ তারাও জানে যে শব্দ না করে বিল্ডিংটার ভিতরে ঢোকার আর কোনও উপায় নেই ওর।

আর যদি এটা তাদের সত্যি একটা ভুল হয়? এরকম তো হতেই পারে। রশিটা স্রেফ সরাতে ভুলে গেছে।

সবাই ভুলে গেল? উঁহুঁ, মন মানছে না রানার; কেউ যেন বোকা বানিয়ে টোপটা গেলাতে চাইছে ওকে।

তবে তোমার কোনও উপায়ও নেই, নিজেকেই বলল রানা।

চান্স নেওয়ার ঝোঁক আছে তোমার, নিয়ে দেখো।

দমকা বাতাস এসে ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল রশিটা, খপ করে আবার সেটা ধরে ফেলল. চোখ-মুখ থমথম করছে। বেশি সাবধানতার কারণে এরকম একটা সুযোগ হারালে নিজেকে বোকা মনে হবে। এটা যদি ফাঁদ হয় তো হলো! সেটা থেকে যেমন করে হোক নিজেকে মুক্ত করে নেবে—ব্যস!

ওর নিজেরও তো দু'একটা কৌশল জানা আছে, নাকি?

গ্লাভ পরা হাত দিয়ে রশি ধরে দ্রুতই উঠে যাচ্ছে রানা। বাতাস ওকে কখনও ডানদিকে, কখনও বামদিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। পিছনে ফেলে এল তিনতলা। পাশ কাটাচ্ছে চারতলাকে। কোনও দিকে খেয়াল নেই, প্রকৃতির সঙ্গে যুঝতে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। একটু অন্যমনস্ক হলেই দেয়ালে বাড়ি খেয়ে গুঁড়িয়ে যাবে খুলিটা।

তারপর কখন যে এগারোতলা ছাড়িয়ে ভেন্টিডাক্টের নীচে পৌঁছে গেছে, বলতে পারবে না রানা।

কানে একটানা বাতাসের গর্জন। ফ্যানবিহীন ফাঁকটা ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। এই মুহূর্তে রশিটা একহাতে ধরে ঝুলছে রানা, অপর হাত ট্রাউজারের পকেটে ভরে অ্যারোসল ক্যানটা বের করে আনল। ক্যানের ক্যাপটা দুই প্যাঁচ ঘোরাল ও, তারপর তলার বোতামটায় চাপ দিয়েই ভেন্টিডাক্টের ভিতর ছুঁড়ে দিল। ক্যানে যতটুকু গ্যাস আছে তার অর্ধেক রিলিজ হবে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে।

এটা যদি ফাঁদ হয়, কেউ যদি ওর জন্য কামরাটার ভিতর লুকিয়ে থাকে, বড়ই অপ্রীতিকর একটা সারপ্রাইজ হবে এটা তার জন্য।

উন্মত্ত প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে তিন মিনিট অপেক্ষা করল রানা, মারাত্মক গ্যাসটাকে নিঃশেষে বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার সময় দিল। প্রচুর বাতাস ঢুকছে ভেন্টিডাক্টে, তাতেই কাজ হবে।

বাকি পাঁচ ফুটও উঠল, গোবরাটের কিনারা দিয়ে ভিতরে তাকাল, দম আটকে রেখেছে।

কিচ্ছু না। চৌকো কামরাটা অন্ধকার। নিঃশ্বাস ছেড়ে শ্বাস নিল ও। আবার তাজা হয়ে গেছে বাতাস। ছোট্ট ফাঁকের ভিতর মাথা ও কাঁধ ঢুকিয়ে দিল। কোনও শব্দ না করে ঢুকে পড়ল ভিতরে, একহাতে শক্ত করে ধরা পিস্তল।

বিজয়ের উল্লাস অনুভব করছে রানা। দেখা যাচ্ছে এত বড় একজন ক্রিমিনাল হয়েও এরকম একটা ভুল করেছে তুং শান...

এমনি সময় ঘরের ভিতর আলো জ্বলে উঠল। আকস্মিক উজ্জ্বলতায় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে রানার। তা হলে ফাঁদই। বেশ ভাল ফাঁদ। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝল ও, এই মুহূর্তে কিছু করতে যাওয়া বৃথা।

আলোটা চোখে সয়ে আসতে দেখল রানা, তুং শান ও তার দুই অনুচর বেঢপদর্শন গ্যাস মাস্ক-এর পিছন থেকে রানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চুয়ান আর তাণ্ডব সিঙের কাছে সাব-মেশিনগান রয়েছে, তুং শানের হাতে পিস্তল।

একহাতে জড়িয়ে নিজের সামনে ঢাল হিসাবে সুরাইয়াকে ধরে রেখেছে তুং শান। ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, মুখ টেপ দিয়ে বন্ধ করা। গ্যাস মাস্কের ভিতর চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে মেয়েটির। কারও আদেশের অপেক্ষায় না থেকে হাত থেকে পিস্তল ছেড়ে দিল রানা, খটাংখট আওয়াজ তুলল ওটা মেঝেতে পড়ে।

বাতাস এখনও দূষিত কি না জানবার জন্য এক ঝটকায় সুরাইয়ার গ্যাস মাস্ক খুলে ফেলে দিল তুং শান।

সুরাইয়া দিব্যি সুস্থ রয়েছে দেখে নিজের মাস্কও টেনে খুলে ফেলল সে, সঙ্গীদেরও খুলতে ইঙ্গিত করল। 'আর কোনও ভয় নেই,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল সে। 'আমার প্রিয়তমা বাগদত্তা যখন মারা যায়নি...' ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিল সুরাইয়াকে।

সুরাইয়া পড়েই যেত, তাণ্ডব সিং ওর চুল ধরে ফেলায় পড়ল না। শিখ গুণ্ডা ওর চুলের মুঠি ধরে ঠেলে দিল দেয়ালের দিকে। নাক-মুখ ঠুকে যাওয়ায় প্রচণ্ড ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটা।

'হাত তোলো মাথার ওপর,' বলল তাইওয়ানিজ বোম্বেটে। 'এক চুল নড়তে দেখলে ব্রাশফায়ার শুরু হবে, নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে আসবে—তোমারও, আমার প্রিয়তমা বাগদত্তারও!'

হাত দুটো উঁচু করল রানা। ভাবল, তুং শান এখনও জানে না কে ও?

এবার ভাল করে সুরাইয়ার দিকে তাকাল রানা। ওর ড্রেসের সামনের দিক এমনভাবে ছেঁড়া হয়েছে, একই সঙ্গে স্তনের অংশবিশেষ এবং নাভির গর্ত অনাবৃত হয়ে পড়েছে। একটা চোখের নীচে কালচে দাগ। উপরের ঠোঁট ফোলা। নাকের ফুটোয় সামান্য রক্ত।

রানার আরও কাছে সরে এল তুং শান। তার সরু চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছে ও। আশ্চর্য হলদেটে মধুরঙা চোখ, সিংহের চোখের মত।

সুরাইয়া ফোঁপাচ্ছে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে হিংস্র হাসি হাসল তুং শান। 'এ-সব তো কিছুই না, প্রিয়তমা! সারাক্ষণ মাথা ঘামাচ্ছি, কী শাস্তি দেয়া যায় তোমাকে। আমার ভালবাসাকে যে-মেয়ে এভাবে অপমান করেছে, তাকে তো শুধু মেরে ফেললে আমার আক্রোশ মিটবে না।'

রানাকে সার্চ করছে চুয়ান, ঝট করে ঘুরে ওর দিকে তাকাল সে। 'রশিটার লোভ সামলাতে পারনি, না?' জোর করে হাসল, দাঁতগুলো ভাঙা আর উঁচু-নিচু, হলুদ ময়লা লেগে আছে। 'আমি হলেও টোপটা না গিলে পারতাম না।'

কিছু বলছে না রানা। সুরাইয়ার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছে ও। তুং শান দেখা যাচ্ছে সত্যি সত্যিই মেয়েটার প্রেমে পড়েছিল!

সেই প্রেম এখন প্রতিশোধের আক্রোশে রূপান্তরিত হয়েছে।

সার্চ শেষ করল চুয়ান, রানার পিঠে সাব-মেশিনগানের মাজল ঠেকিয়ে বলল, 'এগোও। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। কোনও রকম চালাকি নয়, মনে থাকে যেন।'

রানার মনে পড়ল, আগের বার এই দরজায় তালা মারা ছিল।

দরজার বাইরে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নামলে করিডর। তারপর এলিভেটর।

এলিভেটরে সুরাইয়া উঠছে কি না দেখবার জন্য ঘাড় ফেরাচ্ছে রানা, ওর শিরদাঁড়ার উপর মাজলের গুঁতো মারল চুয়ান। কুঁজো হয়ে গেল ও, উজ্জ্বল সরষে ফুল দেখছে চোখের সামনে।

আটতলার একটা বড় কামরায় ঢোকানো হলো ওকে। শুধু একটা বড় টেবিল আর দুটো চেয়ার ছাড়া আর কোনও ফার্নিচার নেই ভিতরে।

পিঠে সাব-মেশিন গানের গুঁতো মেরে রানাকে সেই টেবিলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে চুয়ান। সাদা ব্যান্ডেজে মাথা মোড়া একজন লোক শুয়ে রয়েছে ওটার উপর। তার মুখটার মাত্র অংশবিশেষ দেখা যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও অনায়াসে তাকে চিনতে পারল রানা।

এর নাম দেং পি। বাংচি, জিনান, লী যানের সঙ্গে গোল্ডেন এক্সপ্রেস ট্রেনে এই লোকটাও ছিল—আড়াল থেকে ওর আর সুরাইয়ার গতিবিধির উপর নজর রেখেছে।

ওর জন্য ফাঁদ পেতে সৈকতে বালির তলায় লুকিয়ে ছিল এই লোকই; কপালে বোটের কিনারা লাগায় ভিতর দিকে সেঁধিয়ে গিয়েছিল খুলিটা। আশ্চর্য, তারপরও দেখা যাচ্ছে মরেনি!

দেং পির কাছে নিশ্চয়ই বিশেষ কোনও কারণে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে। চোখ-মুখ নির্লিপ্ত করে রেখে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

তাণ্ডব সিংকে নিয়ে কামরায় ঢুকল তুং শান। তাণ্ডব সিং কায়দা করে ধরে আছে হাতের সাব-মেশিনগানটা।

সুরাইয়াকে কোথাও রেখে আসা হয়েছে। তুং শান আর তাণ্ডব সিঙের পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকল আরও দুজন লোক, হাতে সাব-মেশিনগান, পজিশন নিল দরজার দু'পাশে।

রানার সামনে দাঁড়াল চুয়ান, অন্তত চার ফুট দূরে। ওরা পাঁচজন, সবাই সশস্ত্র, অথচ কেউ রানার নাগালের মধ্যে আসতে রাজি নয়। সাবধানতা কাকে বলে! নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে রানা, ওর পেশল হাত দুটো শরীরের পাশে ঝুলছে; খুঁটিয়ে লক্ষ করছে কে কত দূরে থাকে আর কী আচরণ করে।

ওর পিস্তলের হাতলটা দেখতে পাচ্ছে রানা, জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছে চুয়ান। ছুরিটা খাপ সহ আটকে রেখেছে কোমরের বেল্টে।

পিস্তল দিয়ে ওর পিঠে খোঁচা মারল তুং শান। এত দূরে দাঁড়িয়েছে, হাতটা পুরোপুরি লম্বা করতে হলো তাকে। 'টেবিলটার মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াও, ফারুক,' নির্দেশ দিল সে। 'তোমাকে যাতে দেং পি ভাল করে দেখতে পায়। নিজের হাতের কাজটাও দেখো। বুঝতেই পারছ, মারা যাচ্ছে দেং। ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি আমরা।'

'খুবই দুঃখিত,' বলল রানা, চেষ্টা করল সুরটা যাতে ব্যথায় কাতর শোনায়। 'আমার ক্ষমা-প্রার্থনা মঞ্জুর করো, প্লিজ।'

পিস্তলটা আবার খোঁচা মারল। ব্যথা পেল রানা। 'যাও ওদিকে,' খেঁকিয়ে উঠল তুং শান। 'আরও কাছে, দেং যাতে ভাল করে দেখতে পায় তোমাকে। ও মাথা ঘোরাতে পারছে না।'

লম্বা সবুজ টেবিলটার দিকে আরেকটু এগোল রানা।

ব্যান্ডেজে মোড়া মুখটা দেখছে। ওর পিছন থেকে তুং শান বলল, 'দেং—দেং? একটু চেষ্টা করো, ব্রাদার। চোখ খুলে এই লোকটার দিকে একবার তাকাও। তুমি কি এই লোককেই ট্রেনে দেখেছিলে? সুরাইয়া জেবিনের আশপাশে? তারপর থানথামা শেয়াটনে কানে-কম-শোনা এক বার্মিজ লোকের ছদ্মবেশে?'

মুমূর্ষু লোকটার চোখ দুটো যেন হলুদ মোম। নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে রানাকে দেখছে। ওর গায়ে-মাথায় রাজ্যের কাদা লেগে আছে, কীভাবে চিনবে সে! তা ছাড়া, ওই সময় ওর চেহারাও ছিল অন্যরকম।

তখন রানা নিজের পরিচয় দিয়েছে আরবের একজন আমীর—কয়েকটা তেলখনির মালিক, প্লেবয় টাইপ, নাম শেখ মোহাম্মদ আমিরুল ফরহাদ ইবনে আহাদ। তারপর দেখা গেছে ওকে কানে-কম-শোনা এক আধবুড়ো বার্মিজের ভূমিকায়... চিনতে পারবে মুমূর্ষু লোকটা?

'কী হলো, দেং?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে জানতে চাইল তুং শান।

মাথাটা সামান্য একটু ঝাঁকাল দেং পি, কোনও মতে বলল, 'ট্রেনে... ম্যাডামের কামরায় ছিল, ...বলেছে ব্যাং চি।' পরমুহূর্তে তার চোখের সব আলো নিভে গেল, একপাশে কাত হয়ে পড়ল মাথাটা।

'ওই বেশ্যাটাকে আমি জ্যান্ত পোড়াব!' রানার পিছনে হিসহিস করে উঠল তুং শান। 'বলে কি না, চেনে না তোমাকে, জীবনেও দেখেনি কোনওদিন...'

কোত্থেকে একটা স্ট্রেচার নিয়ে এল গার্ডরা, দেং পির লাশ তোলা হচ্ছে তাতে।

ধীরে ধীরে ঘুরে তার মুখোমুখি হলো রানা, জানে ওর দিকে তাক করা রয়েছে চার-চারটে অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র। 'মেয়েটা সত্যি কথা বলেছে তোমাকে, তুং শান। ট্রেনের বুফে কারে কাকতালীয়ভাবে আমাদের পরিচয় হয়। আমি কে তা সে জানবে

কী করে? তোমরা জানো?'

কর্কশ শব্দে হেসে উঠল তুং শান। 'কেন জানব না! তোমরা দুজন, তুমি আর ইমন দর্জি, ইন্ডিয়ান স্পাই। সেটার মুখ খোলানো যায়নি, কিন্তু তোমার মুখ ঠিকই খোলানো হবে।'

দেং পির লাশ নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল গার্ডরা।

রানা ভাবল, ধারণাটা সম্ভবত মাওলানা ইমরান খানের কাছ থেকে পেয়েছে তুং শান। ওই জঙ্গি লোকটার সন্দেহ হয়েছিল, ও বোধহয় ভারতীয় চর। 'কিন্তু সুরাইয়ার মত মেয়ের এ-সব খবর জানার কথা নয়,' বলল ও।

'কে কী জানে না জানে সব বের করা হবে,' বলল তুং শান। 'আমার সঙ্গে বেঈমানী করেছে সে। আমার ভালবাসার অমর্যাদা করেছে। পরে বুঝতে পারি সে-ই নকশাটা চুরি করে নিয়ে গেছে, আর সেটা তার কাছ থেকে পেয়েই ইন্ডিয়ান নেভি সাগরে ডুব দিয়েছে সাবমেরিনের খোঁজে। কিন্তু কী লাভ হলো? সাবমেরিন তারা পেল? নকশাটা যে বিশেষ কায়দায় কোড করা, তা কি সে জানত? জানত, প্রতিটি সংখ্যার সঙ্গে পাঁচশ' গজ যোগ করতে হবে, তারপর খেয়াল করে দেখতে হবে মাছের ঝাঁক বিশেষ একদিকে কেন যায় না?'

'মাছের ঝাঁক বিশেষ একদিকে কেন যাবে না?' রানা চাইছে কোডটা পরিষ্কার করুক তুং শান। তবে নিজে থেকে সব বলে ফেলছে দেখে ওর মনে একটা সন্দেহও জাগছে—সবই হয়তো মিথ্যে তথ্য।

'ওটাই তো রহস্য! ওখানে ডুবো পাহাড় আছে, পাহাড়ের ফাটল থেকে বিষাক্ত গ্যাস—' যেন বোধোদয় হতে হঠাৎ চুপ করে গেল সে।

'সে যাই হোক, নকশাটা চুরি করে এনেছে সুরাইয়া, এটা তোমার ভুল ধারণা,' বলল রানা। 'আমি যখন জিম্মি করি তখন নকশাটা ওর হাতেই ছিল। ইন্ডিয়ান আর্মিকে আমি দিই ওটা,

সুরাইয়া নয়। যাই হোক, ওকে আমি জিম্মি করে নিয়ে যাই ঠিকই, কিন্তু সিতওয়েতে পৌঁছে ছেড়ে দিই, কারণ বাধ্য না হলে মেয়েদের ওপর আমি জোর খাটাতে রাজি না। তারপর এখানে আবার দেখলাম ওকে।'

'স্লিপার এজেন্টকে বাঁচাবার চেষ্টা করছ, কেমন?' খকখক করে হাসল তুং শান। পা দিয়ে একটা চেয়ার ঠেলে দিল রানার দিকে। 'বসো ওটায়। চুয়ান, বাঁধো ওকে।'

গার্ডরা ফিরে এসে আবার যে যার পজিশনে দাঁড়াল।

চেয়ারের সঙ্গে অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধার পর দুই হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে একের পর এক আঘাত করল তুং শান রানার গালে। তারপর দমাদম ঘুসি চালাল। হাঁপিয়ে যাচ্ছে, তবু থামছে না।

ফুলে ঢোল হয়ে গেছে রানার মুখ। যেন লাল রসে ভেজা একটা ফাটা তরমুজ—কোথাও সবুজাভ, কোথাও কালচে, আবার কোথাও লালচে।

তাণ্ডব সিং আর চুয়ান, দুজন মিলে ক্ষান্ত করল তুং শানকে, তা না হলে লোকটার হাতে মারা যেতে পারত রানা। অবশ্য মারা যাওয়ার আগে কোটরের ভিতর ওর চোখ দুটো গলে যেত, কারণ শেষদিকে ওগুলোকেই টার্গেট করতে যাচ্ছিল তুং শান। হঠাৎ তার মনে একটা ঈর্ষার ভাব জাগছিল—আমার চোখ এত ছোট, অথচ ওর চোখ কী সুন্দর! না চাইতেই পেয়েছে ও সুরাইয়াকে, আর আমি অন্তর থেকে চেয়েও পেলাম না।

চুয়ান আর তাণ্ডব রানার কথা ভেবে থামায়নি তুং শানকে, থামিয়েছে বসের পরিশ্রম কমানোর জন্য। 'এই নোংরা কাজটা আপনি আমাদের ওপর ছেড়ে দিন, বস্,' বলল তাণ্ডব সিং।

'আর দরকার নেই,' বলল তুং শান। 'ভাল ধোলাই দেয়া হয়েছে, আশা করা যায় সুরাইয়া সম্পর্কে এবার সত্যি কথা বলবে ও। উপল ফারুক, চোখ মেলো। মিথ্যেকথা বললে ওদের হাতে ছেড়ে দেব তোমাকে। সুরাইয়াই তোমাকে পথ দেখিয়ে

ক্যাসিনো আন্দামানে নিয়ে এসেছিল, তাই না?'

অনেক কষ্টে রক্তলাল চোখ দুটো মেলল রানা। 'আমি ওর পিছু নিয়ে এসে দেখে যাই,' কাতর স্বরে বলল। 'কিন্তু আমি কে তা জানত না ও। জানত না যে আমি ওর পিছু নিয়েছি।'

'তুমি কী করে জানলে কোথায় যাচ্ছে ও?' কটমট করে তাকাল তুং শান।

উত্তরটা রানা তৈরি করেই রেখেছে। 'কুয়ালালামপুরে প্রেম-নিবেদনের সময় তুমি কিছু রাখ-ঢাক করেছিলে? হুমকি দেয়ার সময় তোমার বডিগার্ডরা কি চুপচাপ ছিল?' মাথা নাড়ল ও। 'ওখান থেকেই ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস সূত্র পেয়ে যায়। বাকিটুকু কল্পনা করে নাও।'

'সুরাইয়ার আসল পরিচয়, সে-ও একজন স্পাই, ঠিক কিনা?' জিজ্ঞেস করল তুং শান।

মাথা নাড়ল রানা। 'যদি হয়ও, আমি অন্তত জানি না।'

অনুচরদের দিকে তাকাল জলদস্যুদের সর্দার। 'এর সঙ্গে তো পারা যাচ্ছে না! তোমরা বলো তো শালাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারি।'

দৈত্য চুয়ান বলল, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, সার।' এগিয়ে এসে তুং শানের কানে ফিসফিস করল সে।

বোম্বেটে শানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'মানে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চাইছ?'

ঠোঁট টিপে হাসছে চুয়ান, নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল।

'নট ব্যাড, নট ব্যাড অ্যাট অল!' রানার দিকে ফিরল তুং শান। 'সুরাইয়াকে তুমি টরচার করবে আর আমরা সেটা উপভোগ করব, উপল ফারুক। সামথিং নিউ, তাই না?'

একজন গার্ডকে নিয়ে কামরা ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল চুয়ান, প্রবল উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে সে।

'সার, ওর আসল নামটা কিন্তু জানা হলো না,' হঠাৎ মনে

করিয়ে দেওয়ার সুরে বলল তাণ্ডব সিং, সাব-মেশিনগানটা হাত বদল করল সে।

'কী হবে জেনে? ওর সম্পর্কে আমার কোনও আগ্রহ নেই,' বলল তুং শান। 'আমি শুধু সুরাইয়া সম্পর্কে সমস্ত তথ্য জানতে চাই—সে কি সত্যিই এই লোকটার সঙ্গে শুয়েছে? সত্যিই কি ভারতীয় স্লিপার এজেন্ট? নকশাটা সত্যিই কি ও চুরি করেছিল? এবং এত আদর-আপ্যায়নের পরও আমাকে...আমি...আমি কি তার মধ্যে এতটুকু ভালবাসা জাগাতে পারিনি?'

মুখের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে মনে মনে প্রমাদ গুণছে রানা। এখন যে বিপদটা আসছে সেটা থেকে বাঁচার উপায় কী! তারা ওকে সুরাইয়ার কী ক্ষতি করতে বলবে কে জানে।

পিঠে ধাক্কা দিয়ে, অসম্মানের সঙ্গে কামরার ভিতরে ঢোকানো হলো সুরাইয়াকে। এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে মেয়েটা, ছেঁড়া ড্রেস টেনে-টুনে জোড়াও লাগায়নি, ফলে এখনও ওর স্তন আর নাভি দেখা যাচ্ছে। মাথার এলোমেলো চুল দেখে কে বলবে বদ্ধ পাগল নয়।

একটু একটু কাঁপছে সুরাইয়া। রানার দিকে তাকাচ্ছে না।

'কাপড় খুলে ফেলো,' নির্দেশ দিল তুং শান। 'সব কাপড়।'

দম দেওয়া পুতুল যেন সুরাইয়া, এক এক করে পরনের সব কাপড় খুলে ফেলল। প্রথমে পা ছুঁড়ে জুতো খসাল। তারপর বেল্ট আর মোজা খুলল। ওর ছেঁড়া ফ্রক পায়ের কাছে স্তূপ হয়ে থাকল। হুক মুক্ত করে খসে পড়তে দিল ব্রা।

'বাঁধো ওকে,' হুকুম করল তুং শান।

তৈরি হয়েই ছিল চুয়ান আর তার সঙ্গীরা। সুরাইয়াকে ধরে টেবিলের উপর চিৎ করে শোয়াল তারা, তারপর রশি দিয়ে ওর হাত আর পা টেবিলের পায়ার সঙ্গে রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল।

এক মুহূর্ত পর সুরাইয়ার আর্তচিৎকার শুনে রানার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। চুরুট ধরিয়ে তার তলপেটের কয়েক জায়গায়

আগুনের ছ্যাঁকা দিচ্ছে তুং শান।

হঠাৎ যেভাবে শুরু হলো, তেমনি অকস্মাৎ থেমেও গেল সুরাইয়ার আর্তনাদ।

'তোমাকে কী করতে হবে সেটাই শুধু দেখাচ্ছি,' রানাকে বলল তুং শান। 'আমি তো ফোস্‌কা উঠছে দেখলেই চুরুট সরিয়ে নিচ্ছি, কিন্তু আমার অনুমতি না পেলে তুমি সরাতে পারবে না। ঠিক আছে, চুয়ান, রশি খুলে দাও ওর।'

বাঁধন খুলে মুক্ত করা হলো রানাকে। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করবার জন্য হাত-পা নাড়ছে ও, এক-দু'পা করে পিছিয়ে গেল সবাই। একা শুধু চুয়ান রয়েছে ওর কাছাকাছি। সে তার সাব-মেশিনগান একজন গার্ডের কাছে রেখে এসেছে।

'ধরো এটা,' রানার দিকে একটা প্লায়ার্স বাড়িয়ে ধরল চিনা দৈত্য। 'তোমার প্রথম কাজ এটা দিয়ে ওর পায়ের নখগুলো তুলে ফেলা।'

'স্টার্ট,' নাটকীয় সুরে নির্দেশ দিল তুং শান। 'নাও ওটা!'

চুয়ানের হাত থেকে প্লায়ার্সটা নিচ্ছে না রানা। 'যদি বলি, এ-কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়?' কামরার ভিতর কে কোথায় রয়েছে দেখে রাখছে রানা।

এখন আর কেউ তারা নিজের আগের পজিশনে নেই। চুয়ানের পকেটে নির্যাতনের আরও কিছু যন্ত্রপাতি আছে, রানাকে দিয়ে সুরাইয়ার উপর সেগুলো ব্যবহার করাবে, তাই ওর কাছাকাছি থাকছে সে—কখনও বামে, কখনও ডানে, হাতে কোনও অস্ত্র নেই।

'কথা না শোনার শাস্তি নাইফ-থ্রোইং প্র্যাকটিস,' তুং শান নয়, জবাব দিল দৈত্যটা। ছোট আকৃতির কয়েকটা ছুরি বের করে রানাকে দেখাল সে। 'এগুলো তোমার পিঠ লক্ষ্য করে ছোঁড়া হবে।'

তাণ্ডব রয়েছে রানার দু'হাতের মধ্যে। তার সাব-মেশিনগান

কারও দিকে তাক করা নয়, তবে আড়ষ্ট হয়ে আছে প্রতিটি পেশি। বোঝাই যায়, তুং শানের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত লোক সে-ই। তাকেই সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে হচ্ছে ওর।

কাছাকাছি রয়েছে তুং শানও, তারপরেও নাগালের অনেকটা বাইরে সে, খোলা একটা দরজার পাশে। তার পিস্তল সারাক্ষণ রানার মাথার দিকে তাক করা, মাঝে মধ্যেই হাত-বদল করছে সেটা।

মূল দরজার দু'পাশ থেকে সরে এসেছে দুই গার্ড। এখন তারা কামরার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে। তাদের হাতের সাব-মেশিনগান রানার দিকে তাক করা, তবে ভঙ্গিটা অলস ও শিথিল। তাদের একজনের কাঁধের সঙ্গে ঝুলছে চুয়ানের সাব-মেশিনগানটা।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে শান্তভাবে হেঁটে টেবিলের একধারে চলে এল রানা, যেদিকটায় বাঁধা হয়েছে সুরাইয়ার দুই পা। একটা পা-র দিকে ঝুঁকল ও। কিছুক্ষণ নত হয়ে থাকার পরে সিধে হলো, কিন্তু কারও দিকে তাকাল না, শান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চলে এল টেবিলের উল্টোদিকে।

কামরার ভিতর পিন-পতন নীরবতা, সবাই ওর প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ করছে।

এদিকে এসেও ঝুঁকল রানা, সুরাইয়ার মুখটা ভাল করে দেখছে। অবশেষে সিধে হলো আবার। তুং শানের দিকে ফিরে বলল, 'ওর জ্ঞান নেই।'

'আসলে ভান করছে নেই,' বলল তুং শান। 'তা ছাড়া, জ্ঞান না থাকলেই বা কী, তোমার কাজ তুমি শুরু করো—এক এক করে ওর পায়ের সবগুলো নখ তুলে ফেলো। দেখবে কী সুন্দর জ্ঞান ফিরে এসেছে!'

হাতের প্লায়ার্সটা টেবিলের কিনারায় রেখে দিল রানা। 'আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পার তোমরা, অচেতন কারও

ওপর টরচার করার মত অমানবিক কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

কথা না বলে তাণ্ডব সিংকে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিল তুং শান।

সাব-মেশিনগানটা কাঁধে ঝুলিয়ে বাথরুমে ঢুকল তাণ্ডব, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল হাতে এক মগ পানি নিয়ে। টেবিলের কাছে এসে সুরাইয়ার চোখে-মুখে পানি ছিটাতে শুরু করল সে, তবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

একটু নড়ে উঠল সুরাইয়া। বোকা মেয়ে, ভাবল রানা।

সুরাইয়ার জ্ঞান ফিরে আসছে দেখে মুখ তুলে তাকাল তাণ্ডব সিং, দৃষ্টিতে বিজয়ীর উল্লাস, পানির মগ টেবিলের এক ধারে নামিয়ে রেখে কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিচ্ছে সাব-মেশিনগান।

দুই কান পর্যন্ত লম্বা হাসি দিল চুয়ান, তারপর টেবিলের কিনারা থেকে প্লায়ার্সটা তুলে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল আবার। 'নাও শুরু করো!' বলল সে।

তৈরি হলো রানা, তাকিয়ে আছে চুয়ানের দিকে, তবে টার্গেট করল তাণ্ডব সিংকে।

বিশ

ঠিক এই সময় দড়াম করে খুলে গেল কামরার দরজা, ছিটকে ভিতরে ঢুকে এক লোক চিনা ভাষায় চিৎকার করে বলল, 'কমিউনিকেশন রুম থেকে আসছি, সার! টাগবোট রেডিও কোনও সাড়া দিচ্ছে না, সার! সমাধি থেকেও কোনও রেসপন্স নেই! আমাদের গার্ড, বিজ্ঞানী, টেকনিশিয়ান—সব একেবারে

বোবা হয়ে আছে!'

লোকটা থামতে না থামতে বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। তাণ্ডব সিঙে উরুসন্ধিতে লাথি মারল, সেই সঙ্গে ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল সাব-মেশিনগানটা। ডানদিক থেকে বাম দিকে ঘোরাল ওটার মাজল, ব্রাশ করে ফেলে দিচ্ছে শত্রুদের। প্রথমে মারা পড়ল গার্ড দুজন।

দরজার দিকে ঘুরে গেল তুং শান, দেখেও তাকে গুলি করল না—মিসাইলের লোকেশন একমাত্র সে-ই জানে।

লাথি খেয়ে কয়েক সেকেন্ড তাণ্ডব নৃত্য করেই মেঝেতে পড়ে গেছে তাণ্ডব সিং, ডাইভ দিয়ে তার পাশে পড়ল চুয়ান, দুজন একযোগে পিস্তল তুলল রানার দিকে। ওর হাতের সাব-মেশিনগান ওদের পেট আর বুকে সেলাইয়ের ফোঁড় তৈরি করল। ইতিমধ্যে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেছে তুং শান।

করিডরে বেরিয়ে এসে রানা দেখল ত্রিশ ফুট দূরে একটা এলিভেটরের দরজা খুলে যাচ্ছে, লাফ দিয়ে সেটার ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছে তুং শান।

'হল্ট, ইউ বাস্টার্ড!' গর্জে উঠল রানা।

গ্রাহ্য করল না তুং শান, তাকালও না এদিকে, লাফ দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছে এলিভেটরের ভিতর।

ভারতীয় সাবমেরিন আর মিসাইলগুলোর কথা খেলে গেল রানার মাথায়। নকশার কোড ভাঙার যে নিয়ম একটু আগে ওকে জানিয়েছে তুং শান, সেটা কি নির্ভুল? মনে হয় না। তুং শানের সাহায্য ছাড়া ওগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হবে না।

পা বাড়িয়েছে তুং শান, এখুনি এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, হাত ফসকে বেরিয়ে যাবে লোকটা চিরতরে। একমুহূর্ত ইতস্তত করেই ট্রিগার টেনে ধরল ও।

নাচছে তুং শান। পিছিয়ে এল এক পা। ছোট হয়ে যাচ্ছে সে। প্রথমে হাঁটুর কাছ থেকে একটা পা হারাল। অপর পায়ে

তাকে লাফাতে দেখল রানা। তারপর হাঁটুর আরেকটু নীচ থেকে দ্বিতীয় পা-ও গুঁড়িয়ে গেল, বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ল এলিভেটরের ভিতরে। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

বাকি শরীর পড়েছে করিডরে।

মাথা নিচু করে নিজের বীভৎস ক্ষত দুটো দেখছে তুং শান। হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল সে, রানাকে এগিয়ে আসতে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল নিষ্ঠুর জলদস্যু। 'বাঁচাও, উপল, আমাকে বাঁচাও! আমি বাঁচতে চাই। না-ই থাক পা, তবু আমি...তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে হাসপাতালে পাঠাও, ভাই...'

'সত্যিই কি বাঁচতে চাও? সারাটা জীবন জেলে পচতে হবে জেনেও?'

'চাই, তবু আমি বাঁচতে চাই!' ও জানে ওকে আটকে রাখার মত জেলখানা তৈরি হয়নি আজও।

'ঠিক আছে, তোমাকে আমি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করব,' বলল রানা। 'সাবমেরিনটা কোথায় বলো।'

'বলেছি তো...'

মাথা নাড়ল রানা। 'না চাইতেই, গড়গড় করে কোড ভাঙার নিয়মটা জানিয়েছ তুমি আমাকে।' হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল ওর চোখ-মুখ। 'ওটা মিথ্যে ছিল, তাই না?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল তুং শান। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, ভাই, স্বীকার করছি, মিথ্যেকথাই বলেছিলাম। সেজন্যে মাফ চাই।'

'বেশ। কোড ভাঙার আসল নক্‌শাটা দাও এবার।'

দুই ক্ষতস্থান থেকে বেরিয়ে আসা রক্তের মধ্যে বসে হাঁপাচ্ছে তুং শান। ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে সে। 'মুখে বলছি, লিখে নাও, ভাই।'

'লিখতে হবে না, তুমি বলো।'

হঠাৎ কোত্থেকে শক্তি পেল কে জানে, গড়গড় করে কোড ভাঙার ভিন্ন নিয়ম বলে গেল তুং শান, যেন মুখস্থ করে রেখেছিল। রানা দেখল মেঝেতে গড়াচ্ছে তুং শানের রক্ত। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে লোকটা, নিস্তেজ হয়ে আসছে দ্রুত। বলল, 'এবার, ভাই, হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করে আমাকে তুমি হাসপাতালে...'

হাসল রানা। মাথা নাড়ল। বলল, 'হাসপাতালে আমি তোমাকে পাঠাতে চাই। কিন্তু তুমি যেতে চাইছ না, তুং শান।'

'মানে?' চেহারাটা হতবিহ্বল করে তুলল তুং শান। 'তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না আমি!'

'এবারও তুমি মিথ্যে তথ্য দিলে,' বলল রানা। হাতের সাব-মেশিনগানটা তার দিকে তুলল ও। 'এখনই ঝামেলা চুকিয়ে দিয়ে তোমার অনুচরদের সাহায্য নিয়ে উদ্ধার করব ওগুলো, নাকি ধীরে ধীরে মরতে চাও?'

আবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠল তুং শান। 'আমি বাঁচতে চাই! আমাকে বাঁচাও!' বলতে বলতে জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে কিছুক্ষণ হাতড়াল, তারপর একটা কাগজ বের করে বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। 'এই নাও! এটা আসল! এবার বাঁচাও...'

কাগজটা নিয়ে চোখ বুলাল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'প্রথমবার মিথ্যে তথ্য দিয়েছিলে কেন? না চাইতেই?'

'কারণ,' জবাব দিল তুং শান, 'স্পাইদের তো মহাবিপদ থেকেও কোনও মতে বেঁচে যাবার একটা অভ্যাস আছে।'

'আর মরতে বসেও একটু আগে মিথ্যেকথা বললে কেন?'

'ওটা স্বভাবদোষ, ভাই, ক্ষমা করে দাও!'

'কিন্তু,' বলল রানা, 'বুঝব কীভাবে এই কাগজটাও ভুয়া নয়?'

ফ্যালফ্যাল করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল তুং শান, কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

'ঠিক আছে, তোমাকে আমি সার্চ করব,' বলল রানা।

সার্চ করে তুং শানের কাছে আর কোনও কাগজ পাওয়া গেল না। কিন্তু তার পরেও ওকে বিশ্বাস করতে রাজি নয় রানা। বলল, 'বেশ, তুমি যখন বলছ, আমি ওই ঘরে নাড়িভুঁড়ি বের হওয়া তাণ্ডব সিংকে দিয়ে আরেকটা নকশা আঁকাব। যদি দুটো মেলে, তা হলে তোমাদের দুজনেরই চিকিৎসার ব্যবস্থা করব আমি। কিন্তু যদি না মেলে...'

রানা কামরার দিকে দুই-পা এগোতেই পিছু ডাকল তুং শান।

'তা হলে ওটা ছিঁড়ে ফেলো, ভাই। আসলটা দিচ্ছি।' কোটের হাতা তুলে বাহু থেকে অবিকল ওর চামড়ার রঙের চওড়া একটা অ্যাডেসিভ টেপ চড়চড় করে টেনে তুলল ও, তার নীচে সযত্নে ভাঁজ করা রয়েছে একটা নকশা। 'একটু তাড়াতাড়ি করো, উপল, আমি কিন্তু মরে যাচ্ছি!'

ঘরে ফিরে এসে প্রথমেই সুরাইয়ার বাঁধন খুলে দিল রানা। তারপর তাণ্ডব সিঙের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সংক্ষেপে পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে সাবমেরিনের অবস্থান এঁকে দিতে বলল ওকে।

মাথা নাড়ল মৃত্যুপথযাত্রী তাণ্ডব। দেবে না।

'বাঁচবে কি মরবে জানি না, তবে নকশা এঁকে দিলে চিকিৎসা পাবে। তুমিও, তুংশানও।' ভাঁজ করা নকশাটা দেখাল রানা। 'এটা তুংশান দিয়েছে।'

'অসম্ভব!' আবারও মাথা নাড়ল তাণ্ডব। 'মিথ্যেকথা বলছ তুমি! তুং শান এতক্ষণে পৌঁছে গেছে আমাদের হেলিপ্যাডে।'

রেগে গেল রানা। মারাত্মক আহত লোকটার একটা হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল করিডরের দিকে। মেঝের উপর দিয়ে ওর সঙ্গে চলেছে ওর পেট থেকে বেরিয়ে আসা নাড়িভুঁড়ি। ইতিমধ্যে ছেঁড়া কাপড় পরে নিয়েছে সুরাইয়া.

ছুয়ানের পকেট থেকে রানার ওয়ালথারটা টান দিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

তুং শানের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে তাণ্ডবের চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল। রানা বুঝল লোকটা সত্যি সত্যিই ভালবাসত চিনা ডাকাতটাকে। বিশ ফুট টেনে এনে ছেড়ে দিল রানা ওকে।

'নকশা এঁকে দিতে রাজি হচ্ছে না তোমার স্যাঙাৎ,' বলল রানা। 'একই সঙ্গে মরো তা হলে দুজন।'

'এঁকে দাও তাণ্ডব,' বলল তুং শান। 'আগে বাঁচতে হবে আমাদের।'

'আসলটা?'

মাথা ঝাঁকাল জলদস্যু। নেতিয়ে পড়ছে ক্রমে।

'দাও, কাগজ দাও,' বলল তাণ্ডব। পরমুহূর্তে বুঝল, সাগরের পানিতে চুপচুপে ভেজা রানার কাছে কাগজ পাওয়া যাবে না। 'আমার পকেটে আছে।'

ভেতরের পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে দিল রানা। বহু কষ্টে কাত হয়ে আঁকতে শুরু করল লোকটা। কিছুদূর আঁকা হতেই রানা টের পেল ঠিক নকশাই দিয়েছে তুং শান শেষ পর্যন্ত।

অকস্মাৎ বিল্ডিংটার নীচতলা থেকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এল। সম্ভবত, ভেঙে পড়ল পুরু স্টিলের গেট। গুলি ও পাল্টা গুলির আওয়াজ হচ্ছে। তারপরেই হুড়মুড় করে কোথাও আরও একটা দরজা ভেঙে পড়ল, সেই সঙ্গে সিঁড়ির দিক থেকে শোনা গেল একটা ঘোষণা, কেউ লাউডহেইলার ব্যবহার করছে:

'মায়ানমার কোস্ট গার্ড! মায়ানমার কোস্ট গার্ড! দিস ইজ অ্যান ইমার্জেন্সি! আমরা ক্যাসিনো আর হোটেল আন্দামান আক্রমণ করেছি। তুং শান, তুমি যেখানেই থাকো, অস্ত্র ফেলে দিয়ে সারেন্ডার করো! তোমার সব সঙ্গীকে আমরা গ্রেফতার করেছি, আরও যারা আছে তাদের নিয়ে এই মুহূর্তে আত্মসমর্পণ

করো। তোমার কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটি আমরা দখল করে নিয়েছি। ...তুং শানের লোক যে যেখানে আছ অস্ত্র ফেলে দিয়ে সারেন্ডার করো! মায়ানমার কোস্ট গার্ড—'

'আর যারা বোন-ইয়ার্ডে গেছে মিসাইল ছুঁড়তে?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সুরাইয়া।

'ওরা সব অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ওখানে। ওদের মধ্যে কয়েকজন বাংলাদেশি জঙ্গি মাওলানাও আছে, বিচারের জন্যে গ্রেফতার করে দেশে নিয়ে যেতে হবে।'

'সিরাজ?'

'সে-ই তো ইন্ডিয়ান নেভি আর কোস্ট গার্ডকে খবর দিয়ে নিয়ে এসেছে।'

'মায়ানমার কোস্ট গার্ড! মায়ানমার কোস্ট গার্ড! দিস ইজ অ্যান ইমার্জেন্সি—' আবার শুরু হলো ঘোষণাটা। লাউড-হেইলারের আওয়াজ শুনে রানার মনে হলো লোকজন সহ লোকটা সম্ভবত সিঁড়ি বেয়ে আটতলায় উঠে আসছে।

'চলো, ওদের জন্যে ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করি আমরা,' সুরাইয়া এখনও কাঁপছে দেখে বলল রানা। 'হাঁটতে পারবে তো?'

'মনে হয় পারব।' মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সুরাইয়া। 'ধন্যবাদ—'

রানা বিস্মিত। 'ধন্যবাদ কেন?'

'কেন আবার,' বলে নিজের একটা হাত চোখের সামনে তুলল সুরাইয়া, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নখগুলো দেখছে। 'এগুলো আমার খুব প্রিয়।'

ঘরে ঢুকে প্রথমেই চুয়ানের কাছ থেকে নিজের ছুরিটা উদ্ধার করল রানা, তারপর চেয়ারে বসিয়ে দিল সুরাইয়াকে। এই সময় করিডর থেকে কয়েক জোড়া বুট জুতোর ভারী আওয়াজ ভেসে এল। বাঁক ঘুরছে লোকগুলো।

প্রথমে সিভিল ড্রেস পরা শাহিন সিরাজকে দেখতে পেল ওরা, বুকে বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরে আছে, হাতে একটা কারবাইন।

রানা আর সুরাইয়াকে দেখতে পেয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ইয়াল্লা, মাসুদ ভাই, আপনারা এখানে!' লাশগুলো টপকে কামরার ভিতর ঢুকল সে।

সিরাজের পিছু নিয়ে ভিতরে চলে এলেন বডিগার্ড সহ ইন্ডিয়ান নেভির একজন অফিসার।

ভদ্রলোকের সঙ্গে রানা ও সুরাইয়ার পরিচয় করিয়ে দিল সিরাজ। 'ইনি সুরাইয়া জেবিন, ফেমাস ফ্যাশন ডিজাইনার অভ মালয়েশিয়া, ইনি মাসুদ রানা, ফ্রম বাংলাদেশ; আর ইনি রিয়ার অ্যাডমিরাল মুচকুন্দ দুবে, ইন্ডিয়ান নেভি।'

ওদের দুজনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'কংগ্রাচুলেশন্স, মিস্টার রানা। শুধু যে ইন্ডিয়ান নেভি কিংবা ইন্ডিয়ান সশস্ত্রবাহিনী, তা নয়, আমরা গোটা জাতি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, সার।' হ্যান্ডশেক করছিলেন, আবেগের আতিশয্যে বুকে টেনে নিলেন রানাকে। 'আপনি অসাধ্য সাধন করেছেন—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রানা বলল, 'কিন্তু এখনও তো সাবমেরিনটা উদ্ধার করা হয়নি, মিস্টার দুবে!'

'আমরা আশা করছি, সেটাও আপনার নির্দেশনায় উদ্ধার করা সম্ভব হবে,' সহাস্যে বললেন রিয়ার অ্যাডমিরাল দুবে। 'ভিলেনটা তো সে-কথাই বলল।'

'ভিলেন?' রানা অবাক। 'মানে? কার কথা বলছেন?'

'ওই যে ওখানে পড়ে আছে, কী যেন নাম... তুং শান! বলল, নকশা ও কোড লেখা কাগজটা আপনি তার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছেন, বিনিময়ে নাকি তাকে হাসপাতালে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সত্যি নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'প্লিজ, মিস্টার দুবে, যত তাড়াতাড়ি

সম্ভব একটা কপ্টারে তুলে শয়তানটা ও তার দোসরকে মায়ানমার আর্মি হসপিটালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।'

'মানুষ হিসেবে সত্যি খুব উদার আপনি,' প্রশংসার সুরে বললেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'এরকম ভয়ঙ্কর শত্রুকে ক্ষমা করে দেয়া, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা...আই কান্ট বিলিভ ইট! এ তো গল্পকেও হার মানায়!'

'আপনি বোধহয় একটু ভুল বুঝেছেন,' বলল রানা। 'কেউ তাকে ক্ষমা করেনি, মিস্টার দুবে। আমি নিজ হাতেই ওদের ওই অবস্থা করেছি। কিন্তু কথা যখন দিয়েছি, চিকিৎসা হবে। তবে সুস্থ হবার পর অসংখ্য অপরাধের জন্য নিশ্চয়ই ফাঁসিতে ঝুলতে হবে ওদের দুজনকেই।'

'ও, আচ্ছা, তা-ই বলুন।' ঘুরে একজন এইডকে নির্দেশ দিতে শুরু করলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'করিডরের আহত দুজনকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে এই মুহূর্তে চিকিৎসা শুরু করতে বলো। অ্যামবুলেন্স ফ্রিগেটে পৌঁছে দিক ওদেরকে। ওখান থেকে মায়ানমারের আর্মি হসপিটালে...'

'আমাদের একটা জাহাজ বোন-ইয়ার্ডে ভিড়েছে, মাসুদ ভাই,' ভারতীয় ন্যাভাল অফিসার থামতেই শুরু করল বাংলাদেশী এসপিওনাজ এজেন্ট। 'অজ্ঞান অবস্থায় অ্যারেস্ট করা হয়েছে সালাউদ্দিন শাহ কুতুব আর তার পাঁচ সঙ্গীকে।

'গুড,' বলল রানা। 'ওদেরকে কারিগরি সাহায্য করছিল সাবেক বার্মিজ এয়ার ফোর্স অফিসার...কী যেন নাম...থাকিন মাউং আর একজন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট থান বানডুলা—'

'ওদেরকে অ্যারেস্ট করেছে মায়ানমার সেনাবাহিনীর অফিসাররা,' বলল সিরাজ। 'আরও ইন্টারেস্টিং খবর হলো: ঢাকা, দিল্লি, লন্ডন আর ওয়াশিংটন থেকে কড়া প্রতিবাদ জানানোর পর মায়ানমার সেনাবাহিনীও এতদিনে গা ঝাড়া দিয়ে মাঠে নেমেছে। টাকা খেয়ে যে ছয়জন হোমরাচোমরা কর্মকর্তা

তুং শানকে সাহায্য করছিল, কিছুক্ষণ আগে তাদেরকেও অ্যারেস্ট করা হয়েছে।'

'মিস্টার রানা, মিস সুরাইয়া,' বললেন রিয়ার অ্যাডমিরাল দুবে। 'আপনাদেরকে আমি সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি—যে জিনিসগুলোর জন্যে নিজেদের অমূল্য জীবন আপনারা বাজি ধরেছিলেন, আসুন, সেই মিসাইল উদ্ধারে আপনারাও অংশ নিন। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, প্লিজ!'

'আমরা ক্লান্ত,' বলল রানা। 'অনেক ধকল গেছে আমাদের ওপর দিয়ে। এখন আবার সাগরে নামতে পারব না।'

'সাগরে নামতে হবে না। আসুন তো আমার সঙ্গে। কী ঘটছে আমরা দেখব শুধু—ওই যে বাংলায় একটা কথা আছে না: ধরি মাছ না ছুঁই পানি! হাহ্-হাহ্-হাহ্-হাহ্-হা!'

'তার আগে আপনাদের ফ্রগম্যানদের এখানে ডেকে পাঠান। আমার ধারণা, এত খুঁজেও কেন কেউ সাবমেরিনটাকে খুঁজে পেল না, সে-রহস্য আমি বুঝে ফেলেছি। আমি নিজে ব্রিফ করতে চাই ওদেরকে।'

ভারতীয় ফ্রিগেট কমান্ডার ক্যাপটেন যশোরাম ত্রিপাঠিকে দেখতে পাচ্ছে রানা, ফ্রিগেডের ব্রিজ থেকে রেডিওতে ফ্রগম্যানদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

সাগর এখানে সবচেয়ে কম পঞ্চাশ ফুট গভীর, সবচেয়ে বেশি পঁচাত্তর ফুট। রানা প্রথমে যেখানে ডুব দিয়েছিল তার থেকে এক মাইল দূরে বিশাল এলাকা জুড়ে প্রবাল-এর মেলা বসেছে। কোথাও কোথাও ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে গাছ তৈরি হয়েছে হাজারে হাজারে, কোথাও লাখ লাখ বিচিত্র আকৃতির বহুরঙা ঝোপ, এরকম মাইলের পর মাইল।

ফ্রগম্যানরা সাগরের তলায় নির্দিষ্ট কয়েকটা পয়েন্টে পৌঁছে থামল, তারপর কম্পাস দেখে গুণে গুণে তিনশ' গজ ডানে কি

বাঁয়ে সরে গেল। এভাবে বার কয়েক স্থান বদলের পর এক জায়গায় স্থির হলো তারা। তুং শানের কাগজ থেকে পাওয়া দিক-নির্দেশনা তাদের মনে গাঁথা আছে। রানার নির্দেশনাও।

অপেক্ষা চলছে। খানিক পর অদ্ভুত ব্যাপারটা চোখে পড়ল। প্রবাল জঙ্গলের ভিতর ঝাঁক ঝাঁক মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ করে কোনও কোনও ঝাঁক গায়েব হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে। শুধু যে ফ্রগম্যানদের চোখের সামনে থেকে, তা নয়, ক্যামেরার লেন্স থেকেও। ঠিক এই কথাটাই বলে দিয়েছিল ওদেরকে মাসুদ রানা।

একটু তল্লাশি চালাতেই জানা গেল রহস্যটা। ঢালু প্রবাল জঙ্গলের ভিতর চওড়া একটা গুহা আছে। ফ্রগম্যানরা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল গুহাটার ছাদে, মনে করেছিল ওটাই বুঝি সাগরতল। গুহামুখ ঢাকা পড়ে আছে প্রবালের তৈরি অসংখ্য ঝুরিতে।

ভিতরে ঢুকে মাত্র পঞ্চাশ গজ এগোতেই সাবমেরিনটাকে দেখতে পেল ওরা। ক্যামেরার লেন্স একসময় সারমেরিনের ভিতরেও পৌঁছাল। এবার ব্যালিস্টিক মিসাইলের আটটা টিউবও দেখতে পেল ওরা। একটা খালি, সাতটা ভরা।

ক্যাসিনো আন্দামানের কমিউনিকেশন রুমে উপস্থিত দর্শকরা খুশিতে পরস্পরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছে। একাধিক মনিটরে দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছে ওরা।

'থ্যাঙ্ক ইউ, মাই ডিয়ার ইয়াংম্যান!' বলে রানার হাতটা ধরে আরেকবার ঝাঁকিয়ে দিলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল মুচকুন্দ দুবে, আবার একবার জড়িয়ে ধরলেন বুকে।

***